রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মিত্রালয়
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম খণ্ড ॥ সন্ধ্যাসংগীত হইতে নৈবেদ্য

দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড ॥ আষাঢ় ১৩৫৫

প্রকাশক শ্রীগৌরীশংকর ভট্টাচার্য,
মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
করকমলে

ভূমিকা

১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতনে থাকিবার সময়ে এই গ্রন্থের সূত্রপাত— কিন্তু বর্তমান আকারে ইহা অনেক কাল পরে লিখিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সম্বন্ধে মূল ধারণাটি তখন নীহারিকারূপে মনের মধ্যে ভাসিতেছিল— তাহারই কোনো কোনো অংশ দুই-তিনটি প্রবন্ধরূপে, তখনকার সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়। তারপরে অনেকদিন কাজ বন্ধ থাকে; ১৯৩০ সালে সত্যকার গ্রন্থরচনা আরম্ভ হইয়া ১৯৩৪ সালে সমাপ্ত হয়।

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের মূলসূত্রটি এই ভূমিকায় বলিতে চেষ্টা করিব। যাঁহারা বইখানি পড়িবেন ইহাতে তাঁহাদের সাহায্য হইবে আশা করা যায়; আর যাঁহারা পড়িবেন না, তাঁহারাও এই অংশটুকু পড়িলে গ্রন্থে কি আছে জানিতে পারিবেন। আজকাল নাকি ব্যস্ততার যুগ, লোকের বই পড়িবার সময়াভাব, যদিও বই প্রকাশের আদৌ নয়; পাঠে অনিচ্ছুক এই ব্যস্ততার যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক উদ্ভাবন ভূমিকা— রামায়ণ-মহাভারতের ভূমিকার প্রয়োজন হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার প্রধান ধর্ম, ইহার মানবমুখিতা; কালিদাসের পরে এত বিরাট মানবমুখী কবিপ্রতিভা আমাদের দেশে জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ। ব্যাস-বাল্মীকির কথা আসে না, তাঁহারা কালিদাসের পূর্ববর্তী; বিশেষ, তাঁহারা লোকোত্তর কবি, এক-একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন; কালিদাস প্রভৃতি লৌকিক কবিরা সেই জগতে বিচরণ করিয়াছেন। এই লৌকিক কবিদের মধ্যে প্রতিভার সাধর্ম্যে ও বিরাটত্বে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ অতৃতীয়; সে ধর্মটি মানবমুখিতা।

ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের দেশের সাহিত্যের প্রভেদ এই যে, পাশ্চাত্য সাহিত্য প্রধানতঃ মানবমুখী, ভারতীয় সাহিত্য প্রধানতঃ ভগবদ্মুখী; সেইজন্য ইউরোপীয় সাহিত্য বিচিত্র ও জটিল, আমাদের সাহিত্য গভীর ও তন্ময়; আমাদের দেশে কবিরা সাধক, তাঁহাদের অপর নাম ঋষি।

এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে ইউরোপীয় মনের সঙ্গে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্যজনক ঘনিষ্ঠতা আছে, আবার ভারতীয় সাহিত্যের প্রধান ধারার সঙ্গে তেমনি আশ্চর্যজনক অনৈক্য। রবীন্দ্রনাথ না-হয় ইউরোপীয় মনের সঙ্গে

পরিচিত— কিন্তু কালিদাস! আর-কোনোরূপে ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না— ইহার একমাত্র ব্যাখ্যা প্রতিভার রহস্যের দুর্জ্ঞেয়তায়। সেইজন্য ইউরোপ এত সহজে রবীন্দ্রনাথের কাব্য বুঝিতে পারিয়াছে, আর ভারতীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে ইউরোপ বোধ হয় কালিদাসকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে।

তবু ইউরোপ সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রপ্রতিভার মহত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ গীতাঞ্জলির দ্বারা পরিচিত; গীতাঞ্জলি মূলতঃ ভগবদ্‌ভক্তির কাব্য, আর ভগবদ্‌ভক্তি রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি উপশাখা মাত্র, প্রধান অঙ্গ নয়। তাঁহার মানবমুখী বিচিত্র কাব্যের কতটুকু অনূদিত হইয়াছে? কিংবা অনুবাদে মৌলিক মহত্ত্ব কতটুকু সংরক্ষিত হইয়াছে? কাজেই রবীন্দ্রকাব্যের অধিকাংশই শুধু যে ইউরোপের অজ্ঞাত তাহা নয়, তাঁহার প্রতিভার ধর্মই সেখানে অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য, মানবমুখিতা রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রধান ধর্ম হইলেও তাহাতে কোথায় যেন একটা ত্রুটি বা দুর্বলতা আছে যাহাতে তিনি সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ ক্ষুদ্র খণ্ড দোষত্রুটিবহুল মানবের অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই। ইচ্ছা আছে, চেষ্টা আছে, কিন্তু শক্তি নাই; বারে বারে তিনি মানুষের দ্বারে করাঘাত করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে দ্বার খোলে নাই। তিনি দ্বারের বাহিরে বসিয়া অনুমানের দ্বারা, কল্পনার দ্বারা, আভাসে যেটুকু পাইয়াছেন তাহার দ্বারা, ভিতরের জীবনযাত্রার চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, মানবের সংসারের গান গাহিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কবিপ্রতিভা সারাজীবন এই দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিয়াছে, এখনো করিতেছে; কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি বুঝিতে পারেন যে—

হে রাজন্ তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার
তোমার সিংহদুয়ারে।

মানবের সিংহদ্বারে বসিয়া বাঁশি বাজাইবার অধিকারমাত্র তাঁহার আছে, তাহার অধিক নাই। ইহাই রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার ট্রাজেডি।

আমার তৃতীয় বক্তব্য এই, রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিণাম কোথায়? সিংহদ্বারে বসিয়া বাঁশি বাজানোকেই তিনি পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন কি বা অন্য কোনো উপায়ে সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন? রবীন্দ্রনাথের কাছে

প্রকৃতি মানুষের বিকল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; ওয়ার্ডসওআর্থ প্রকৃতির মধ্য দিয়া জগৎসত্তাকে জানিয়াছিলেন ; রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানবসত্তাকে জানিয়াছেন ; প্রকৃতি-প্রীতির মধ্যে তিনি মানব-প্রীতির স্বাদ পাইয়াছেন। বাল্য ও কৈশোরের স্বাভাবিক প্রকৃতি-প্রীতি পরিণত বয়সে গভীর অর্থদ্যোতক হইয়া কবির জীবনে দেখা দিয়াছে ; জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ওঠা-পড়া ও মূর্ছনার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রপ্রতিভা বহুদিন পরে সমে ফিরিয়া আসিয়াছে।

প্রধানতঃ এই তিনটিই রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের মূলসূত্র।

গ্রন্থের সমালোচনারীতি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি ; কাব্যের মধ্যে তাঁহার মনের শ্রেষ্ঠ অংশের প্রকাশ ; আবার তিনি ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রবন্ধকার ইত্যাদি ; কাজেই তাঁহার মনের অপর অংশ সাহিত্যের ঐ সব শাখায় বিকশিত ; কাজেই তাঁহার সম্পূর্ণ মনকে বুঝিতে হইলে কাব্যের সঙ্গে অন্যান্য রচনা মিলাইয়া পড়া দরকার ; রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও অন্যান্য রচনা পরস্পরবিরোধী নয়, পরস্পর-পরিপূরক। একই সময়ে লিখিত কাব্যে, প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে মনের লীলার ঐক্য থাকাই সম্ভব ; বিভিন্ন রচনায় তাহার প্রকাশ বিচিত্র হইতে পারে— কিন্তু মূলে একই মনের প্রকাশ ; সুতরাং একটু তলাইয়া পড়িলে মিল পাওয়া যায় বলিয়া আমার বিশ্বাস। একটি উদাহরণ লওয়া যাক ; প্রায় একই কালে তিনি নৈবেদ্য রচনা, স্বাদেশিক প্রবন্ধগুলি প্রণয়ন ও শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন ; আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে ঐক্য কোথায় ? কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই তিনের মধ্যে একই মনের বিভিন্ন অংশে প্রকাশ— ইহারা মূলত এক। এ বিষয়ে নৈবেদ্য প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। কবিমনকে বুঝিবার জন্যই কবির সম্পূর্ণ মনকে জানা প্রয়োজন— এবং এই সম্পূর্ণ মনকে জানিতে হইলে একই কালে লিখিত কাব্যের সঙ্গে পরিপূরকভাবে প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও জীবনী মিলাইয়া আলোচনা করা আবশ্যক। নানা কারণে সৃষ্টিমূলক রচনা, যেমন নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প এই প্রয়োজনে ব্যবহার করি নাই ; কিন্তু করিলেও ক্ষতি ছিল না, কেবল প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও জীবনী ব্যবহার করিয়া আমি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি, সেই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিতে হইত।

গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে আমি নীরব। তার কারণ, আমি রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল-ধারার পরিচয় দিতে বসিয়াছি, উপশাখার পরিচয় দিতে বসি নাই ; তেমন

উপশাখা রবীন্দ্রপ্রতিভায় প্রচুর, তাহার পরিচয় দিতে হইলে কোনোকালেই আমার গ্রন্থ শেষ হইত না।

রবীন্দ্রনাথের গানের আলোচনা করি নাই; গীতাঞ্জলি গান; শুধু গীতাঞ্জলির গানগুলি আলোচনার সার্থকতা নাই, সমস্ত গানের আলোচনা করিতে হয়; সুরবেত্তা না হইলে গানের সমালোচনা করা নিরর্থক; আমার সে শক্তির অভাব।

বিশেষ, বিদেশে এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির কবি বলিয়া পরিচিত। গীতাঞ্জলি তাঁহার প্রতিভার মূলধারা না হওয়াতে এই পরিচয়ের দ্বারা লোকে রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝিয়াছে; রবীন্দ্রপ্রতিভার মূলধারার আলোচনায় গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা থাকিলে লোকের এই ভুলকে প্রশ্রয় দেওয়া হইত। বাহুল্য হইলেও একটি তথ্য পাঠকদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই— ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও বাংলা গীতাঞ্জলি আদৌ এক গ্রন্থ নয়; ইংরেজি গীতাঞ্জলির বহু রচনা নৈবেদ্য, খেয়া, শিশু হইতে গৃহীত; এ সব কাব্য রবীন্দ্রপ্রতিভার মূলধারার অন্তর্গত; ইংরেজি গীতাঞ্জলিকে একপ্রকার চয়নিকাগ্রন্থ বলিলেই হয়।

গ্রন্থপ্রকাশের কাজে যাঁহাদের কাছে নানারূপে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করিয়া শ্রম শেষ করি।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে আমি রবীন্দ্রকাব্যকে যে কয়েকটি পর্বে ভাগ করিয়াছি প্রথমে সে-সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করিয়া, পরে ঐ বিভিন্ন পর্বের অন্তর্গত কাব্যগুলি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা করিয়াছি।— প্রথম সংস্করণে সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, মানসী ও স্মরণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা করি নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে এই অপূর্ণতা সংশোধিত হইল— এই সংস্করণে নূতন পাঁচটি প্রবন্ধ যুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে চারিটি প্রবন্ধ প্রথম খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইল।

প্রথম খণ্ডের সূচী

যন্ত্রস্থ দ্বিতীয় খণ্ডের সূচী

সন্ধ্যাসংগীত পর্ব

রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসংগীত হইতে তাঁহার প্রকৃত কাব্যজীবন আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। ইহার কারণ এ নহে যে, সন্ধ্যাসংগীতের কাব্য পরিণত শক্তির রচনা। এই পরিণতি কবির কাব্যে অনেক পরে আসিয়াছে, মানসী সোনার তরীতে। অপরিণত শক্তির রচনা বলিয়াই সন্ধ্যাসংগীত ও পরবর্তী কয়েকখানি কাব্যের মূল্য, কিন্তু সে মূল্য কাব্য-হিসাবে নয়, কবিজীবনের ইতিহাসরূপে।

কবিজীবনের ইতিহাস আলোচনা এমন স্থান হইতে করিতে হয়, যেখানে তাহাকে অপরিণত অবস্থায় পাওয়া যায়। কাব্য যখন পরিণত হইয়া উঠিল, তখন সে আর-এক জিনিস। তখন তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া শিল্পের ইন্দ্রজাল ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহার মূল উপাদান দেখিবার সুযোগ সব সময় হয় না। কিন্তু সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ব্ববর্তী কাব্য তো আরও কাঁচা, তবে কেন সেখান হইতে আরম্ভ না করি? রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের উৎস সন্ধ্যাসংগীত; তৎপূর্বের কাব্য নয়। আর রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের অনুসরণ আমাদের কাজ; কাজেই আমাদের নিকট সন্ধ্যাসংগীতের যে মূল্য তৎপূর্ববর্তী কাব্যের তাহা নহে। বিশেষ করিয়া সন্ধ্যাসংগীতকে কেন রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের মূল বলিলাম এ বিষয়ে আমাদের অনুমান ছাড়াও গুরুতর প্রমাণ আছে, স্বয়ং কবির সাক্ষ্য।

সন্ধ্যাসংগীত-প্রভাতসংগীতের সহিত তুলনা করিয়া তৎপূর্বের কাব্য পাঠ করিলে প্রথমেই চোখে পড়ে, সংগীতাখ্য কাব্যদ্বয়ের কবি লিরিকের ধারাটি পাইয়াছেন। এখানে বক্তব্য যাহাই হউক, কবির কণ্ঠে সেই অতিতুচ্ছ বিষয় সংগীত হইয়া উঠিতেছে। ইহার পূর্বে এমন করিয়া অনায়াসে কবিকণ্ঠে সংগীত ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। এই যে সংগীতটি পাইলেন, ইহাতেই কবি নিজের বাহনটিকে লাভ করিলেন। এই বাহনের অভাবে পূর্ববর্তী কাব্যে কবির গতি স্বচ্ছন্দ-অবলীলা লাভ করিতে পারে নাই। সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতে সুরের পক্ষলাভ ঘটিল। কিন্তু পরবর্তী ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমলে সংগীত অপেক্ষা চিত্রের উপরেই কবির অধিক ঝোঁক। মানসীতে চিত্র ও গীত উভয় পক্ষ কবি অনুসরণ করিয়াছেন। এই পর্যন্ত তাঁহার পরীক্ষার যুগ;

নানা ভাবে নানা বাহনে নিজের স্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টা। সোনার তরীতে কবি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার স্বাভাবিক বাহন সংগীত, চিত্র আনুষঙ্গিক। আর-একবার তিনি নিছক চিত্ররথে যাত্রা করিয়াছেন, সাফল্যও লাভ করিয়াছেন কিন্তু, সেই শেষবার। ইহা কল্পনা কাব্যে। তাহা হইলে দেখা গেল, সন্ধ্যা-সংগীত হইতে মানসী পর্যন্ত কবির বাহন-পরীক্ষার যুগ। একবার যেমনি তিনি বাহন সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেন, অমনি সুরের পক্ষীরাজে তাঁহার ভাবের সপ্তলোক-যাত্রা আরম্ভ হইল, সোনার তরী হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত।

সন্ধ্যাসংগীতকে কাঁচা বলিলাম; ইহার ছন্দোবন্ধ ভাব-ভাষা অপরিণত; তাহার একমাত্র কারণ, এই পরিণতির অভাব তাঁহার অন্তরেই ছিল।

"আমার কাব্যলেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। কাব্যহিসাবে সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ভাব মূর্তি ধরিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।"— জীবনস্মৃতি, সন্ধ্যাসংগীত

কবি এখানে দুইটি ভাগ করিয়াছেন— লেখাটা এবং খুশিটা। পাঠক যে আনন্দ পাইবে, সেটা সর্বতোভাবে লেখা হইতেই। তাহার সহিত কবির খুশির স্বতন্ত্র একটা টীকা জুড়িয়া দিবার আবশ্যক নাই। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ কাব্যে দুইই এক; অকাব্যে দুইটি স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। প্রকাশের অসম্পূর্ণতায় কবি বুঝিতে পারেন যে, প্রকাশ্য ব্যাপারের একটা অংশ, এবং অনেক সময়ই প্রধান অংশ, অব্যক্ত আকুতিরূপে কবির মনের মধ্যে রহিয়া গেল, চিত্তের খুশিটা কল্পনায় ভাবরূপে দানা বাঁধিয়া কাব্যসম্মত রূপ পাইল না। অর্থাৎ কাব্য হিসাবে যাহা বিশ্বজনীন হওয়া উচিত, সেটা খুশিরূপে তাঁহার ব্যক্তিগত হইয়া রহিল। এইজন্য অনেক সময়ে দেখা যায়, কবিশ্রেষ্ঠ যাঁহারা, পরবর্তী জীবনে যাহারা অনেক মহাকাব্যের জনক, তাঁহাদের বিশেষ স্নেহ বা মোহ থাকে তাঁহাদের কৈশোরের অপেক্ষাকৃত অকাব্য-গুলির প্রতি। ইহা যে কেবল তাঁহাদের প্রতিভার প্রথম বিকাশ বলিয়া, তাহা নহে, অসম্পূর্ণ প্রকাশ বলিয়া। শ্রেষ্ঠ কাব্যে তাঁহারা নিঃশেষে প্রকাশিত, তাহাতে মোহাকর্ষণের মত কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু প্রথম জীবনে এই অকাব্যগুলিতে প্রকাশ্য বিষয়ের খানিকটা তাঁহাদের হাতে থাকিয়া যায়;

যে পরিমাণে থাকে, সেই পরিমাণে তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত। এই ব্যক্তিগত অংশটা, যাহা ক্ষতির খাতায়, তাহাই কবিদের মোহের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এ কথা অপ্রযোজ্য নহে। সন্ধ্যাসংগীত হইতে মানসী পর্যন্ত অংশটার বিষয়ে তিনি যত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন, এমন আর কোনো কাব্য সম্বন্ধে নহে। যে আকৃতি কাব্যে রূপ পায় নাই তাহাকে প্রবন্ধে চিঠিপত্রে আলাপ-আলোচনায় রূপ দিবার আর বিরাম নাই। স্বপ্রকাশ কাব্যগুলিসম্বন্ধে তিনি অপেক্ষাকৃত নীরব।

সন্ধ্যাসংগীতের পর প্রভাতসংগীত। ইহার 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি, কি ভাবে কেমন করিয়া লিখিত হইল, সে বিষয়ে কবি বহু বার বহু স্থানে বহু কথা বলিয়াছেন। বাহুল্যবোধে আমরা আর তাহার উল্লেখ করিলাম না। সে সময়ে কবির কোনো আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হইয়াছিল কিনা, আমরা তাহা জানিতে চাহি না। আমাদের যেটুকু আবশ্যক, তাহা কাব্যেই আছে। নিজের কবিজীবন সম্বন্ধে এই সময়ে যে তিনি সচেতন হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কবিচৈতন্যের এই অভিজ্ঞতা আমাদের পক্ষে ছন্দের স্বচ্ছন্দ গতি ও অবিরাম চলতারূপে বিদ্যমান।

এই পর্বসম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে আলোচনা করিতে গিয়া কবি ইহাকে হৃদয়-অরণ্য হইতে নিষ্ক্রমণের কাল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু হৃদয়-অরণ্য হইতে কবি সম্পূর্ণরূপে কোনোদিন নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তবে হৃদয় হইতে বাহিরে আসিবার একটা চেষ্টা তাঁহার কাব্যে বরাবর আছে। এই আলোচনাপ্রসঙ্গে কবি এই সময়টার উপরে যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, প্রভাতসংগীতের কাল সেই ভারবহনক্ষম কিনা সন্দেহ আছে। জীবনের উলটা দিক্ হইতে বহু বৎসরের স্মৃতির মধ্য দিয়া তিনি এই সময়টাকে দেখিয়াছেন, এবং স্বভাবতই যে ব্যাখ্যা ইহার প্রাপ্য নহে, তাহা ইহার ভাগ্যে পড়িয়াছে। কবি লিখিয়াছেন, প্রভাতসংগীতের সময়টাতে শৈশবের প্রকৃতির সহিত তাঁহার পুনর্মিলন ঘটিল। আমাদের ধারণা, গীতাঞ্জলিতে ও অবশেষে বলাকার পরে তাহা ঘটিয়াছে। কবি যে সময়ে জীবনস্মৃতি লিখিতেছিলেন তখন গীতাঞ্জলি-রচনা শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রকৃতির সহিত পুনর্মিলন তাঁহার ঘটিয়াছে; এবং এই সময়ের ঘটনা অপর একটা সময়ে, যাহাকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, তাহার উপরে চাপাইয়া দিয়াছেন।

আমাদের কথা যে মিথ্যা নহে তাহার প্রমাণ জীবনস্মৃতিতে আছে। কড়ি ও কোমল-প্রসঙ্গে কবি লিখিতেছেনঃ—

"আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।"—'বর্ষা ও শরৎ'

আবার—

"কড়ি ও কোমল মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান।"—'বর্ষা ও শরৎ'

সেই একই প্রসঙ্গে পুনরায়—

"যৌবনের আরম্ভে মানুষের জীবনলোক আমাকে তেমনি করিয়াই টানিয়াছে। তাহারও মাঝখানে আমার প্রবেশ ছিল না, আমি প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিলাম।"—'শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী'

বড় সত্য কথা। রবীন্দ্রনাথ মানুষের কবি, মানুষের বিচিত্র জীবন তাঁহাকে নানা ভাবে আকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু তিনি সেই রহস্যনিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, বাহিরে দাঁড়াইয়া যেটুকু স্বাদ গন্ধ ইঙ্গিত আভাস পাইয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার কবি-জীবনের ট্রাজেডি।

ইহার পরে ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমল। এ দুটিকে আমরা চিত্ররীতির কাব্য বলিয়াছি। সাংগীতিক আকুলতা ইহাতে তত নাই, যত চিত্রকরোচিত নির্লিপ্ততা।

"চৌরঙ্গির নিকটবর্তী সার্কুলর রোডের একটি বাগানবাড়িতে আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বস্তি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতলার জানালার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম।...নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোক ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক-একটি বিশেষ দৃশ্য এক-একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনা-পরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত। সে আর কিছু নয়, এক-একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা। চোখ দিয়া মনের জিনিসকে, ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা। তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম

তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ।" —জীবনস্মৃতি, 'ছবি ও গান'

ব্যাখ্যার আবশ্যক নাই, কবি স্পষ্টই বলিয়াছেন, ছবি আঁকিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিলে ছবি ও গানের প্রকাশ্য বিষয়কে কথায় না প্রকাশ করিয়া চিত্রে রূপান্ত করিয়া তুলিতেন। সে শক্তির অভাবে তিনি কাব্যে চিত্রপন্থার অনুসরণ করিয়াছেন। ইহা কড়ি ও কোমল সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এই কাব্য দুইখানিতে কবির ব্যক্তিত্ব যতদূর সম্ভব সংকুচিত। প্রকাশ্য বিষয়কে যথাসম্ভব স্বাধীন ভাবে ফুটিয়া উঠিতে কবি সাহায্য করিয়াছেন।

কবির আর-একখানা চিঠি হইতে একটা অংশ তুলিয়া দিলে দেখা যাইবে, কাব্য হিসাবে অসম্পূর্ণ এই গ্রন্থখানার প্রতি কবির ব্যক্তিগত মোহ কি নিবিড়।

"আমার 'ছবি ও গান' আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম, তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছ এবং মনের মধ্যে হয়তো অনুভবও করছ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সমস্ত বাহ্য লক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে, তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখতে তো মনে করতে, এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষ্যাপামি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে পড়েছিল। আমি জানতুম না আমি কোথায় যাচ্ছি, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। একটা বাতাসের হিল্লোলে এক রাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল, তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিল না। কেবলি একটা সৌন্দর্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না। তোমাদেরও বোধ হয় এ রকম অবস্থা হয়।

'উড়িতেছে কেশ, উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরান কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি মুখে লয়ে হাসি
ভ্রমিতেছি আনমনে—
চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবন-মুকুল প্রাণে বিকশিত,

সৌরভ তাহার বাহিরে আসিয়া
রটিতেছে বনে বনে।'

সত্যি কথা বল্‌তে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। 'ছবি ও গান' পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, এমন আমার কোনো পুরোনো লেখায় হয় না।" —চিঠিপত্র ৫, পৃ ১৩২-৩৩

কবির এই মোহের এই নেশার মূলে কাব্যের অসম্পূর্ণ প্রকাশ। অন্তরে যে অব্যক্ত আকৃতি ছিল, তাহার রঙিন কুয়াশা আজও কবির চোখে ইন্দ্রধনু বুনিয়া দেয়। কিন্তু পাঠকের পক্ষে এখানে বেশি আশা নাই; কারণ কবির ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরে পাঠকের অধিকার নাই— সে সম্পত্তি কি পার্থিব, কি আন্তরিক।

মানসী এই পর্যায়ের শেষ কাব্য। ইহাতেও সেই পুরাতন দ্বন্দ্ব, চিত্র ও সাংগীতিক পন্থায়। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে কাব্যখানি পাঠ করিলে বুঝা যায়, এই দুইটি পন্থাই আপন আপন উৎকর্ষের দিকে চলিয়াছে। উভয়ের মিলনে দিকে নয়, কারণ এমন মিলন জগতের সাহিত্যে কদাচিৎ দেখা যায়; রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দু-চারবার মাত্র তাহা ঘটিয়াছে। চিত্রপন্থা রীতিমত দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, যেমন 'মেঘদূত' ও 'অহল্যার প্রতি' কবিতায়। কিন্তু মানসীর অধিকাংশ কবিতাই সুনিপুণ ভাবে সাংগীতিক পন্থাকে অনুসরণ করিয়া আভাস দিতেছে যে, ভবিষ্যতে ইহাই কবির প্রধান বাহন হইয়া উঠিবে।

প্রকাশের এই বহিরঙ্গের দ্বন্দ্বের সহিত তাল রাখিয়া কবির অন্তরে একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছে। কাব্যে চিত্ররীতি 'কংক্রীট', ইহা বস্তুকে দেহ দ্বারা তথ্য দ্বারা প্রকাশ করে। সাংগীতিক পন্থা 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট'—ইহা বৈদেহী; দেহ হইতে আত্মাকে নির্যাস করিয়া লইয়া ইহা প্রকাশ করিতে চায়। কবির কাব্যে এই চিত্র বা দেহী পন্থা, ও সাংগীতিক বা বৈদেহী পন্থা দুইটিই প্রকাশভঙ্গি খুঁজিয়াছে।

রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের কবিতা অনেক আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতা অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহার অর্থ এ নহে যে, রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে ভালোবাসেন নাই; কিন্তু তাঁহার মনের গঠনই এইরূপ যে, ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দেখিতে দেখিতে ভাবরূপে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে, এবং স্বভাবতই এই ভাবরূপ, বৈদেহী বা সাংগীতিক পন্থায় আত্মপ্রকাশ করে।

এই যে দ্বন্দ্ব, কাব্যব্যাপারে যাহা চিত্র- ও সংগীত- রীতিতে প্রকাশমান, আসলে

যাহা আইডিয়াল ও রীয়ালের দ্বন্দ্ব ব্যতীত কিছু নয়, সে সম্বন্ধে কবিও অচেতন নহেন।

"অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Ideal-এর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য। কল্পনার Centrifugal force Ideal-এর দিকে Realকে নিয়ে যায়, এবং অনুরাগের Cantripetal force Real-এর দিকে Idealকে আকর্ষণ করে— কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।" —চিঠিপত্র ৫, পৃ ১৩৪

এই যে দুইটি বিপরীতমুখী শক্তি, কবি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখ-দুঃখ বিরহমিলন-পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।" —চিঠিপত্র ৫, পৃ ১৩৩

এই দুটিই কবির অন্তরে আছে। কখনো অনুরাগের পন্থা রীয়ালের দিকে কবিকে লইয়া গিয়া চিত্ররীতিকে আশ্রয় করাইতেছে ; আবার কখনো বা সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা আইডিয়ালের দিকে আকর্ষণ করিয়া কবির হাতে তুলিকার পরিবর্তে বাঁশি তুলিয়া দিতেছে।

এই মানসিক দ্বন্দ্ব কবিকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে।

"ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে মানসীর ভালোবাসার অংশটুকুই কাব্য-কথা— বড় রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র— ওর আসল সত্যি কথাটুকু হচ্ছে এই যে, মানুষ কি চায় তা কিচ্ছু জানে না—...তাই জন্যেই 'সাধ যায় সত্য যদি হত কল্পনা'— আমি দুটো যদি এক করতে পারতুম। ...একেই বল ভালবাসা? আমার ভালোবাসবার লোক কই? আমি ভালোবাসি অনেককে— কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে— সে আর্টিস্‌টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?"—চিঠিপত্র ৫, পৃ ১৫২-৫৩

"দুটো যদি এক করতে পারতুম।" এই আইডিয়াল ও রীয়ালকে। অন্তরে এই আইডিয়াল ও রীয়ালএর সমন্বয় ঘটিলে বাহিরেও চিত্র- ও সংগীত-পন্থার সামঞ্জস্য পাওয়া যাইত। কবির ভাগ্যে কি এই মিলন ঘটিয়াছে,— অন্ততঃ মানসীতে তো হয় নাই।

কবি নিজে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই, তাঁহার মনে কোন্ ভাবটা

প্রবল—ভালোবাসা না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা, কল্পনার centrifugal force না অনুরাগের centripetal force। মানসীতে ইহার মিলন ঘটে নাই, দুইটি পাশাপাশি আছে এই মাত্র। সোনার তরী হইতে কল্পনার শক্তিই যেন প্রবলতর হইয়া বিচিত্র পথে বিশ্বের জীবনের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে—সে বিশ্ব ব্যক্তিবিহীন। অনুরাগের শক্তি সমান বলবান হইলে সেখানে ব্যক্তির দেখা হয়তো মিলিত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘ কাব্যজীবনে বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুসন্ধান করিয়াছেন, নির্বিশেষ মানুষকে পাইয়াছেন। প্রেমিককে খুঁজিয়াছেন, নির্গুণ প্রেমকে পাইয়াছেন; সগুণকে চাহিয়াছেন, তাঁহার ভাগ্যে নির্গুণ মিলিয়াছে। এই অতৃপ্তি, এই আকাঙ্ক্ষা, এই আন্দোলন ও অশান্তি তাঁহার কাব্যের মূলে; ইহাই তাঁহার কাব্যের মৌলিক অনুপ্রেরণা। এই কথাটি মনে রাখিয়া তাঁহার পরিণত কাব্য আলোচনা করা যাক।

সোনার তরী পর্ব

সোনার তরী হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য এমন একটি পরিণতি লাভ করিয়াছে, যাহা ইতিপূর্বের কোনো কাব্যসম্বন্ধে বলা চলে না—মানসী সম্বন্ধেও নহে, যদিও মানসীর কয়েকটি কবিতা সোনার তরীর প্রৌঢ়তা লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই পর্বে সব চেয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে পদ্মা নদী। শুধু এই পর্বে কেন, তাঁহার বিভিন্ন কাব্যের অন্তরে সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রটির মত পদ্মার প্রভাব প্রবাহিত। ক্ষণিকার পরে আর তাহার বাস্তব রূপ চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু পদ্মারই আদর্শ একটি অখণ্ড অবিচ্ছেদ্য গতিরূপে সর্বত্র প্রসারিত। মর্ত্যলোকের এই পদ্মাই আদর্শায়িত হইয়া বলাকার আকাশগঙ্গায় পরিণত হইয়াছে।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কাব্য বুঝিতে পদ্মাকে বোঝা আবশ্যক। শুধু পদ্মাকে নয়, ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তশায়ী এই দেশের যে-বৈশিষ্ট্য বাংলার প্রাণপ্রতীক এই নদী প্রকাশ করিতেছে তাহাও না বুঝিলে চলিবে না। কারণ রবীন্দ্রপ্রতিভা ভারতীয় ও বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বন্দ্বে উপজাত।

পদ্মা বিশেষ করিয়া বাংলার নদী। গঙ্গার সহিত ইহার নাড়ির যোগ আছে, কিন্তু পথের যোগ নাই। সমস্ত ভারতবর্ষের ধারাকে হঠাৎ অস্বীকার করিয়া খামখেয়ালি কবিকল্পনার মত ইহা স্বৈর গতিতে অজানিত পথে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বাংলার প্রাণপ্রতীক এই বিরাট নাগিনী। ইহারই প্রবাহে বাংলার আব-হাওয়াতে এমন কিছু একটা আছে, যাহাতে সে অনায়াসে অতীতের সংস্কারকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে। প্রাচীনতার গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া যাইবার একটা নেশা বাংলার জীবনকে নানা দিক দিয়া স্পর্শ করিয়াছে। ভারতবর্ষের মুখ অতীতের দিকে, বাংলাব মুখ ভবিষ্যতে।

এ হেন পদ্মার তীরে ঘটনাক্রমে রবীন্দ্রনাথকে কিছুকাল বাস করিতে হইয়া-ছিল। পদ্মারি এই গতিতে কবি আপনার অন্তর্নিহিত কবিধর্মকেই যেন দেখিতে পাইলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্বভাব চলতা বা গতি ; এই চলতা বা গতিই যেন পদ্মার স্রোতে প্রবাহিত। অন্তরের আদর্শের সহিত বাহিরের দৃশ্য সায় দিয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ আপনার কবিধর্মে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সোনার তরীতে তাঁহার কবিতার পরিণতি ; সেই সময়টাতেই তাঁহার পদ্মাবাস ; পদ্মাতীরে বসিয়া কবি যে শুধু আপনার স্বধর্মকে বুঝিলেন তাহা নয়, পদ্মার কলধ্বনিতে বাংলার যে-ইতিহাস উচ্চারিত হইতেছে, তাহাও যেন শুনিলেন।

ইহার পূর্বে কবি দেশবাসীর স্পর্শচ্যুত হইয়া আপন পরিবারের ও আপন অন্তরের গণ্ডিমধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন। এখানে আসিয়া কবির জীবন দেশের জীবনকে স্পর্শ করিল। হৃদয়-অরণ্য হইতে কবির যথার্থ নিষ্ক্রমণ এই সময়টাতে ; অবশ্য আমাদের কথাও আংশিকভাবে সত্য মাত্র।

এখন দেখা যাক, কবি কি ভাবে এই পদ্মাকে গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে 'ছিন্নপত্র' আমাদের প্রধান সহায়। পদ্মার নানা ভাবের বহু চিত্রে ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি পূর্ণ। তন্মধ্যে খানকয়েক চিঠি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক, কবি-স্বভাবের কি পরিচয় পাওয়া যায়।

"ভোর থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা সাতটা আটটা পর্যন্ত ক্রমাগতই ভেসে চলেছি। কেবলমাত্র গতির কেমন একটা আকর্ষণ আছে—দুধারের তটভূমি অবিশ্রান্ত চোখের উপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে—সমস্ত দিন তাই চেয়ে আছি—কিছুতেই তার থেকে চোখ ফেরাতে পারছি নে—পড়তে মন যায় না,

লিখতে মন যায় না, কোনো কিছু কাজ নেই, কেবল চুপ করে চেয়ে বসে আছি। কেবল যে দৃশ্যের বৈচিত্র্যের জন্যে তা নয়;—হয়তো দুধারে—কিছুই নেই, কেবল তরুহীন তটের রেখা মাত্র চলে গেছে—কিন্তু ক্রমাগতই চলছে, এই হচ্ছে তার প্রধান আকর্ষণ।”— ছিন্নপত্র, ১২ মাঘ ১২৯১

পুনরায়—

“আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতি ভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তা হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ পশুর মধ্যে যে চলাচল তাতে খানিকটা চলা, খানিকটা না চলা, কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চলছে; সেই জন্যে আমাদের মনের সঙ্গে আমাদের চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমাদের শরীর আংশিকভাবে পদচালনা করে, অঙ্গচালনা করে; আমাদের মনটার আগাগোড়াই চলেছে। সেই জন্যে এই ভাদ্রমাসের পদ্মাটাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মত বোধ হয়— সে মনের ইচ্ছার মত ভাঙছে, চুরছে এবং চলেছে— মনের ইচ্ছার মত সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসংগীতে নানাপ্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের ইচ্ছার মত, আর বিচিত্রশস্যশালিনী স্থির ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মত।” —ছিন্নপত্র, ২৪ আগস্ট ১৮৯৪

নদীপ্রবাহকে কবি এখানে সামান্যভাবে মানবমনের গতির সহিত তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু যে-কথাটা অধিকতর সত্য, সেটা এই যে, এই গতিপ্রবাহের সহিত কবির মানসলীলার স্বাভাবিক সাদৃশ্য আছে। পদ্মা ও কবিচিত্তের দুটি তার একই সুরে বাঁধা ছিল, একটির রণনে মুহূর্তের মধ্যে অন্যটি অনুরণিত হইয়া উঠিল।

কবির প্রতিভার স্বাভাবিক গতিধর্ম পদ্মার প্রভাবে প্রথম স্ফূর্ত হইল। ইহা একেবারে তাঁহার অস্তিত্বের মূলে আশ্রয় লাভ করিয়াছে বলিয়া তিনি সর্বদা সে-সম্বন্ধে সচেতন নহেন, কিন্তু যখনই নিজের জীবনটার দিকে চাহিয়াছেন এই গতিকেই নানারূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ‘ছিন্নপত্রের বহুকাল পরে লিখিত একখানা চিঠিতে আছে—

“তোমাদের বইয়ে বোধ হয় পড়ে থাকবে, পাখিরা মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলে যায়। আমি হচ্ছি সেই জাতের পাখি। মাঝে

মাঝে দূর পার থেকে ডাক আসে, আমার পাখা ধড়্ফড় করে ওঠে। আমি এই বৈশাখ মাসের শেষ দিকে জাহাজে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেব বলে আয়োজন করচি।" —ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫০

কবির যে বারে বারে বিদেশ যাত্রা, তাহার প্রকাশ্যে হেতু যাহাই হোক, মুখ্য কারণ তাঁহার প্রতিভার স্বাভাবিক চলতা। বাহিরের গতি কবির স্বাভাবিক গতিপ্রিয়তাকে আঘাত করে; উভয়ের দ্বন্দ্বে কবির কাব্যপ্রতিভা নূতন ভাবে স্ফূর্তি লাভ করে। তাঁহার জীবনে চারিবার এ রকম ঘটিয়াছে। চারিবার দীর্ঘ বিদেশ প্রবাস বা যাত্রার পরে কাব্য-উৎসের নূতন ধারা খুলিয়া গিয়াছে—১৮৭৮-১৮৮০ পর্যন্ত বিলাতে বাস, ১৮৮২ সালে সন্ধ্যাসংগীত প্রকাশিত; ১৮৯০ সালে কয়েক মাস বিলাতে অবস্থান, চিত্রাঙ্গদা বিদায়-অভিশাপ ও সোনার তরী প্রভৃতি ১৮৯১-৯৩ সালে লিখিত; ১৯১২-১৩ সালে সতেরো মাস ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ভ্রমণ, ১৯১৪ সালে বলাকার কবিতা রচনা আরম্ভ; এবং ১৯২৪-২৫ সালে দক্ষিণ আমেরিকার পথে 'পূরবী'র যাত্রী অংশের অধিকাংশ কবিতা লিখিত। কবি নদী-সম্বন্ধে যখনই সচেতন হইয়া ওঠেন, নদীর নিকট আপনার ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না—

"আমি জীবনের কত কাল যে এই নদীর বাণী থেকেই বাণী পেয়েছি, মনে হয় সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুলব না।"— ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫৭

যে-গতিকে কবি একদিন জলস্রোতে দেখিয়াছেন, জীবনের অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সহিত তাহা গভীরতর হইয়া জনস্রোতে পরিণত হইয়াছে। জল ও জন উপলক্ষ্য মাত্র, স্রোতটাই কবির নিকটে আসল। কবি একখানি চিঠিতে পথিকের নানা আনাগোনা বর্ণনা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন—

"ঐ সব চলার স্রোতের মধ্যে মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে আমি চুপ করে বসে আছি।" —ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩২

শান্তিনিকেতন আশ্রমের বালকদের জীবন-সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিটা এই রকমের—

"তুমি মনে কোরো না এখানে কোনো স্রোত নেই; এখানে অনেকগুলি জীবনের ধারা মিলে একটি সৃষ্টির স্রোত চলেছে; তার ঢেউ প্রতি মুহূর্তে উঠছে, তার বাণীর অন্ত নেই। এই স্রোতের দোলায় আমার জীবন আন্দোলিত হচ্ছে, আপনার পথ সে কাটিছে, দুই তটকে গড়ে তুলছে। সে কোন্ এক অলক্ষ্য

মহাসমুদ্রের দিকে চলেছে, দূর থেকে আমরা তার বার্তার আভাস পাই মাত্র।”
—ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৫

এতক্ষণ যাহা দেখিলাম তাহা নদীস্রোত সম্বন্ধে, কবি যেন তাহাকে নদী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্গুণ সত্তা-হিসাবে দেখিতেছেন। পদ্মাটা যেন তত্ত্ব-হিসাবে কবির নিকটে সত্য। কিন্তু পদ্মা যে কবির নিকটে কত প্রিয়, কোনো তত্ত্ব-হিসাবে নয়, প্রায় ব্যক্তির মত, তাহা দেখা যাক। পদ্মার ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে আর কে দেখিয়াছে জানি না।

“আগে পদ্মা কাছে ছিল— এখন নদী বহুদূরে সরে গেছে— আমার তেতালা ঘরের জানালা দিয়ে তার একটুখানি আভাস যেন আন্দাজ করে বুঝতে পারি, অথচ একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল। শিলাইদহে যখনই আসতুম তখন দিনরাত্তির ঐ নদীর সঙ্গে আমার আলাপ চলত; রাত্রে আমার স্বপ্নের সঙ্গে ঐ নদীর কলধ্বনি মিশে যেত আর নদীর কলস্বরে আমার জাগরণের প্রথম অভ্যর্থনা শুনতে পেতেম। তারপরে কত বৎসর বোলপুরের মাঠে মাঠে কাটল, কত কাল সমুদ্রের এপারে ওপারে পাড়ি দিলুম—এখন এসে দেখি সে নদী যেন আমাকে চেনে না। ছাদের উপর দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে মাঠ, কত গ্রামের আড়াল, সবশেষে উত্তর দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতর পাড়ের মতো একটি বনরেখা দেখা যায়। সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ যে একটি ঝাপসা বাষ্পলেখাটির মতো দেখতে পাচ্ছি, জানি ঐ আমার সেই পদ্মা। আজ সে আমার কাছে অনুমানের বিষয় হয়েছে। এই তো মানুষের জীবন। ক্রমাগতই কাছের জিনিস দূরে চলে যায়, জানা জিনিস ঝাপসা হয়ে আসে, আর যে-স্রোত বন্যার মতো প্রাণমনকে প্লাবিত করেছে, সেই স্রোত একদিন অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মতো জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে।”—ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৬

ইহা কি পদ্মার বর্ণনা? ইহা কবির অতীত জীবনের স্মৃতি; পদ্মা ও কবির জীবন একত্র জড়িত হইয়া গিয়াছে—একটাকে ছাড়িয়া আর-একটা লওয়া মুশকিল।

কবির কাব্যে যে কয়টি মূল উপাদান—পৃথিবীর প্রতি আসক্তি, বাংলা দেশের জীবনের ও সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহ, বাংলার প্রকৃতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট বিরাট বৈরাগ্যের সুর—সবগুলিরই দীক্ষা এই পদ্মার নিকট হইতে। ছিন্নপত্র

হইতে অংশ উদ্ধার করিয়া প্রত্যেকটি বিষয় স্পষ্ট করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহার আবশ্যক নাই, কৌতূহলী পাঠক ছিন্নপত্রখানা পড়িয়া লইবেন।

পদ্মাস্রোতের এই গতি কবির জীবনকে যে শুধু গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা নহে, অন্যের জীবন-সম্বন্ধেও কবির ধারণা গড়িয়া তুলিয়াছে। বোটে করিয়া অবিরাম ভাসিয়া চলিতে চলিতে যে-দেখা তাহাতে মনোযোগ আছে, কিন্তু কোথাও সে মনোযোগের সন্নিবেশ নাই—এ যেন ছবি দেখা। এ ভাবে দেখা আর্টিস্টের দেখা, কর্মীর দেখা নহে। জীবনকে নিজের জীবন হইতে বিবিক্ত করিয়া দেখা কবির অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য নদীতীরের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে মুহূর্তে আদর্শ করিয়া তুলিতে কবির বাধে না। ছিন্নপত্রের একখানি চিঠিতে দেখি, নদীতীরের দৃশ্য সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখিতে দেখিতে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে তেপান্তরের দেশের একটি নদীতীর হইয়া উঠিল এবং কবি সেই দেশের রাজপুত্রের মত নিদ্রিত রাজকন্যার অন্বেষণে যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

বস্তুত সমগ্র মানবজীবনের প্রতিই কবির এই দৃষ্টি। কোনোকিছুকে তিনি দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। এই জীবনতন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে তাঁহার আসন নাই, দূর হইতে দেখিতেছেন, এক দৃষ্টিতে যাহা বুঝিলেন, তাহাতেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে—অধিক প্রয়াসে নিষ্ফলতা। জীবনকে সম্যক্‌ভাবে বুঝিবার ইচ্ছা, কিন্তু এমন তাঁহার অবস্থান যে সেরূপ কোনো আশা নাই। কবি ও জীবন পাশাপাশি ঘর করিল কিন্তু এক ঘরে বাস করা হইয়া উঠিল না।

সোনার তরী পর্বে যেমন পদ্মার গুরুত্ব, চিত্রা কাব্যে সেই গুরুত্ব জীবন-দেবতার। জীবনদেবতা কি, সে বিষয়ে আমরা চিত্রা-প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি; এখানে জীবনদেবতা-সম্বন্ধে সাধারণ বক্তব্য যাহা আছে তাহাই বলিব।

জগতে ও জীবনে এমন কোনো কথা নাই যাহা কাব্যের উপাদান হইতে পারে না, কিন্তু জগৎ ও জীবনের সব কথা কাব্য নয়। জীবনদেবতা কবির ব্যক্তিগত জীবনের নিয়ন্ত্রীদেবতা, সেই হিসাবে কাব্যের উপাদান। কিন্তু সর্বত্র এই ভাবটি কাব্য হইয়া উঠিয়াছে কিনা, তাহা কাব্য-প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। এ আলোচনা উপাদানের আলোচনা। চিত্রায় জীবনদেবতা ভাবের স্ফূর্তি, সোনার তরীতেও তাহার আভাস আছে। সোনার তরী ও চিত্রায় এই জীবনদেবতা ভাবের চারিটি স্তর দেখা যায়।

সোনার তরীতে জীবনদেবতা পূর্ণভাবে স্বমূর্তিতে প্রকাশ পান নাই। প্রধানত

তিনি কবিতা ও কল্পনার মূর্তি আশ্রয় করিয়াছেন। "মানসসুন্দরী"তে ইহা—

"এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশদিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে ?"

আবার "নিরুদ্দেশ যাত্রা"য়—

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী,
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।...
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগনকোণে।
কি আছে হোথায়, চলেছি কিসের
অন্বেষণে।"

আর "সোনার তরী"র সেই প্রসিদ্ধ—

"গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু-ধারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।"

এই তিন জন কি স্বতন্ত্র ? ইঁহাদের মধ্যে জীবনদেবতার পূর্বাভাস ; ইঁহারা

কবির নিকট সম্পূর্ণভাবে পরিচিত নহেন ; কিন্তু কবি এটুকু বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার জীবনতরণীর হালটা ইঁহাদের মুঠার মধ্যে। তাঁহারা এখনও সম্পূর্ণভাবে কবির জীবনটাকে আয়ত্ত করেন নাই, তবে কবির কাব্য অনেকটা তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় স্তরের প্রধান আলোচ্য বিষয় "অন্তর্যামী" কবিতা। এখানে জীবনদেবতা কবির জীবনে আরো গভীর ছায়াপাত করিয়াছেন। কবির কাব্যপ্রেরণার উৎসের ধারে তাঁহার বাস। ইহার পূর্বে ছিল এই উৎসের জলে তাঁহার ছায়াপাত। কিন্তু এবার এই উৎসের মূলেই তিনি। এতদিন ছিল তাঁহার বিষয়ে কবিতা কিন্তু এবারে তিনিই কবিতার বিষয়।

তৃতীয় স্তরে "জীবনদেবতা" কবিতাটি। এখানে দেখি কবির জীবনের ঘটনা ও মানসিক আবেগের তিনি নিয়ন্ত্রী। এতক্ষণে জীবনদেবতা নামটি যেন সার্থক হইয়াছে।

চতুর্থ স্তরে এক বারের জন্য জীবনদেবতা বিশ্বদেবতায় পরিণত হইয়াছেন।

"অচল আলোকে রয়েছ দাঁড়ায়ে,
কিরণবসন অঙ্গে জড়ায়ে
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে
ছড়ায়ে বিবিধ ভঙ্গে।
গন্ধ তোমাব ঘিরে চাবিধাব,
উড়িছে আকুল কুন্তলভাব,
নিখিল গগন কাঁপিছে তোমাব
পবশ-রস-তরঙ্গে।"—চিত্রা, "অন্তর্যামী"

একবারের জন্য এইজন্য বলিলাম যে জীবনদেবতা বিশ্বদেবতা নহেন, কিংবা জীবনদেবতাই যে ক্রমে বিশ্বদেবতায় পরিণত হইয়াছেন, এমনও নহে। অন্যত্র জীবনদেবতা যেমন অপর ভাবের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন, এখানেও সেই রকম একটা মিশ্রণ।

চিত্রার "অন্তর্যামী" ও "জীবনদেবতা" কবিতা দুটির মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। "অন্তর্যামী"তে জীবনদেবতার সহিত কবির পুরা পরিচয় ঘটিয়া উঠে নাই। ইহা যেন জীবনদেবতার পূর্বরাগ, ইহার প্রধান রস, অর্ধপরিচয় ও রহস্যের।

"জীবন-দেবতা"য় এই মিলন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—অন্তরঙ্গতাই ইহার প্রধান রস।

চৈতালিতে দুই-একটি ব্যতীত প্রথম শ্রেণীর কবিতা নাই। কবির বহুসৃষ্টি-ক্লান্ত প্রতিভা কিছুক্ষণের জন্য এখানে যেন বিশ্রাম করিতেছে। কিন্তু পদ্মার প্রতি কবির আসক্তি এখানে পদ্মাকে অতিক্রম করিয়া পদ্মাতীরকেও অধিকার করিয়াছে।

ক্ষণিকা পদ্মাতীরের কাব্য, এখানে কবি পদ্মা ও নিজের অন্তর্লোককে অতিক্রম করিয়া পদ্মাতীর ও বাহিরের সংসারের জীবনে কতকটা প্রবেশ করিয়াছেন। অভিজ্ঞতার এই নূতন পারিপার্শ্বিকতা ক্ষণিকা কাব্যের উপাদান।

আরও একটি কথা। আমরা যতই কবির কাব্যের শিখরের দিকে উঠিতেছি ততই পৃথিবীর সংস্রব স্বল্পতর ও বায়ু লঘুতর হইয়া আসিতেছে। জীবনে যাহা কিছু আনন্দ ও সান্ত্বনাজনক কবি চিত্রায় তাহাদিগকে ভূতলের স্বর্গখণ্ড বলিয়াছেন। কিন্তু ক্ষণিকায় আসিয়া তাহা

"শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায় কথা না শুধায়
ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদেরি গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।" —"উদ্বোধন"

ক্ষণিকার জীবনের সেই চরম আনন্দকণাগুলি ক্ষণিক মুহূর্ত। অর্থাৎ পূর্বে যাহা ছিল বস্তু, এখানে তাহা কাল। এইরূপে বস্তুবিশ্বকে কালবিশ্বরূপে প্রকাশের চেষ্টা কবির ক্রমপরিণতিশীল আর্টের একটা লক্ষণ। বলাকায় ইহার চরম। সেখানে পদ্মা দ্যুলোকের আকাশগঙ্গা।

এই পর্বে আর তিনখানি কাব্য আছে—কল্পনা, কথা, নৈবেদ্য। পূর্বের কাব্যগুলি হইতে ইহারা একটু স্বতন্ত্র। আগের গুলির উপজীব্য বর্তমান; সে বর্তমান কবির ব্যক্তিগত জীবনের অথবা দেশের। উপরি-উক্ত তিনখানিতে

উপজীব্য ভারতবর্ষের অতীত জীবন; বস্তুত এই তিনখানিতে প্রাচীন ভারতে কবির মানসভ্রমণের ইতিহাস।

কবির সদাজাগ্রত চিরচঞ্চল কৌতূহল দেশের বর্তমান গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কবিকে প্রাচীন ভারতের মধ্যে লইয়া গিয়াছে। কল্পনাসর্বস্ব সেই প্রাচীন জীবনকে, কবি তিনখানি কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের সৌন্দর্যময় অংশ কল্পনায়, ঐতিহাসিক মহত্ত্ব কথায় এবং অধ্যাত্মজীবনের বার্তা নৈবেদ্যে।

এই মানসভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুরাতন আশ্রয়টিতে আর কবি সান্ত্বনা পাইলেন না; তাঁহার জীবনস্রোত এই মানসভ্রমণের ফলে সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত হইল।

খেয়া পর্ব

রবীন্দ্রনাথ কবি, কবিতা তাঁহার আত্মপ্রকাশের প্রধান প্রণালী, তাহার সঙ্গে গদ্যও আছে। ইহা একটা আনুষঙ্গিক উপায় মাত্র। এতক্ষণ আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে এই দুটিই আছে, তবে পদ্যই নিঃসংশয়িতভাবে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এইবারে সে রীতির যেন পরিবর্তন দেখা যাইতেছে।

নৈবেদ্য-প্রকাশের পরে অর্থাৎ ১৯০২ হইতে বলাকার কবিতা-রচনার সময় ১৯১৪ পর্যন্ত, এই দ্বাদশ বৎসর রবীন্দ্রপ্রতিভার বনবাস। সে যে একেবারে অজ্ঞাতবাস করিয়াছে তাহা নহে, প্রধানত গদ্যের ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিয়াই বিচরণ করিয়াছে। কেন এমনটি হইল, তাহা আলোচনার পূর্বে এই সময়টাতে রচিত কবির প্রধান গদ্য ও পদ্য গ্রন্থগুলির একটি তালিকা দেওয়া যাক :

গদ্য। চোখের বালি, আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, সাহিত্য, শিক্ষা, সমূহ, স্বদেশ, রাজাপ্রজা, ধর্ম, নৌকাডুবি, গোরা, শারদোৎসব, প্রায়শ্চিত্ত, রাজা, জীবনস্মৃতি, অচলায়তন, ডাকঘর, শান্তিনিকেতন পুস্তিকাবলী।

পদ্য। খেয়া, শিশু, স্মরণ, উৎসর্গ, গীতাঞ্জলি পুস্তিকাবলী গীতিমাল্য-রচনার আরম্ভ।

এই গদ্যগ্রন্থাবলী ব্যতীত কবি ঘনিষ্ঠভাবে বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সহিত জড়িত থাকায় নানা স্থানে বক্তৃতা ও সভাপতিত্বে ব্যাপৃত এবং ছোট-বড় নানা পত্রিকার সম্পাদনায় নিযুক্ত।

অবশ্য এই আন্দোলনের মধ্যেই তিনি খেয়া লিখিতেছিলেন, কিন্তু গীতাঞ্জলি এই আন্দোলন ত্যাগ করিবার পর লিখিত। এই সময়ে কবি ১৯০৯-এ রাজনৈতিক আন্দোলন ত্যাগ করিয়া শান্তিনিকেতনের নির্জনতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

এখন সমস্যা, পদ্য যাঁহার আত্মপ্রকাশের প্রধান উপায়, তাঁহাকে প্রধানত গদ্যের আশ্রয় লইতে হইল কেন? ইতিপূর্বে একটা সময়কে কবির প্রাচীন ভারতে মানসভ্রমণের কাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। এই মানসভ্রমণ হইতে কবি বর্তমান জগতে ফিরিয়া আসিলেন। সময়-হিসাবে ইহার দূরত্ব সামান্যই। কিন্তু এই অল্প সময়েই অত্যাশ্চর্য কাণ্ড ঘটিল। কবি মানসচক্ষে যাহা দেখিলেন বহির্জগতে তাহার কোনো অনুদৃশ্য পাইলেন না। একদিকে ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের সেই সর্বাঙ্গীণ মহত্ত্ব, অন্যদিকে বর্তমান ভারতবর্ষের এই দুরতিক্রম্য ক্ষুদ্রতা। এই দুস্তর দ্বিধা কবিচিত্তের সেই সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া দিল—কবির আত্মপ্রকাশের জন্য যাহা একান্ত আবশ্যক। সেই সময়টিতে নবোৎসাহে বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইল। কবি ভাবিলেন এই সূত্র ধরিয়া যদি আবার ভারতের সর্বাঙ্গীণ মহত্ত্বের সূত্রপাত হয়। প্রাণে-মনে তিনি আন্দোলনে যোগ দিলেন। আন্দোলনে তাঁহার এই যোগদান সেই মানসভ্রমণেরই একটা ফল। কবি-হিসাবে যাহা কাব্যে প্রকাশ করা স্বাভাবিক ছিল, কর্মী-হিসাবে তাহাকে তিনি কার্যে রূপ দিতে চেষ্টা করিলেন। কল্পনার সহিত কার্যের মিল কবে হইয়া থাকে? বিশেষ, আন্দোলনটাতে যোগ দিয়া, বর্তমান আকারে ইহা চালাইবার ব্যর্থতা তাঁহার মনে বারংবার উদিত হইতে লাগিল। তিনি আন্দোলন ত্যাগ করিলেন, শান্তিনিকেতনের নির্জনতায় ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু যে কবিধর্মকে তিনি হারাইয়াছিলেন, তখনো তাহা ফিরিয়া পাইলেন না। এই সময়ে গীতাঞ্জলির ও কিছু পরে গীতিমাল্যের অপূর্ব গানগুলি রচনা করিলেন। এ গানগুলির প্রধান উপজীব্য ভগবৎপ্রেম। কিন্তু ভগবৎপ্রেম রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান উপজীব্য নহে। ইহাতে রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের একটি শাখা জন্মলাভ করিল, কিন্তু স্বয়ং কবি ইহাতেও তাঁহার বিলুপ্ত কবিধর্ম ফিরিয়া পাইলেন না।

এই মানসভ্রমণের পরে কবির প্রথম কাব্য, খেয়া পাঠকসমাজের কাছে দুর্বোধ্য হইয়া উঠিল। উত্তরোত্তর এই দুর্বোধ্যতার অপবাদ বাড়িয়াই চলিল। কেহ তাঁহাকে বলিল 'মিস্টিক', কেহ বলিল বাউল, কেহ বলিল পাশ্চাত্যের

অনুকরণকারী, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে বৈষ্ণবকবিদের মন্ত্রশিষ্য বলিল। কিন্তু সকলেই প্রায় একবাক্যে বলিল কবির প্রতিভার সে দীপ্তি আর নাই। সমালোচকেরা কবির পূর্বেকার কাব্য আবৃত্তি করিয়া কবিকে একেবারে নিরুত্তর করিয়া দিল। কিন্তু কেহই রবীন্দ্রনাথকে বুঝিল না।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়টিতে প্রতিভার স্বধর্মচ্যুত। রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান রস মানবরস। সর্বদেশ সর্বকালব্যাপী মানব তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিনন্দন পাইয়াছে। অভিনন্দনের এই সমগ্রতা ও আন্তরিকতা আর কেহ পায় নাই— না প্রকৃতি, না স্বয়ং ভগবান। মানসভ্রমণের ফলে, অতীত ও বর্তমানের আদর্শ ও বাস্তবের পার্থক্যে, তাঁহার চিত্তে যে দ্বিধার জন্ম, এই দ্বিধাই কিছু কালের জন্য তাঁহার কাব্যপ্রতিভাকে বাধাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। শ্রেষ্ঠকাব্যসৃষ্টির পক্ষে কবিপ্রতিভার একটি একাগ্রতা আবশ্যক। এই একাগ্রতা নানা কারণে দ্বিধা হইয়া যাইতে পারে। কাল-মাহাত্ম্য তাহার মধ্যে একটা।

এই সময়টি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেই রকম একটা দুঃসময়। এই সময়ে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য মানবসমাজ লাভ করে নাই, ভগবান লাভ করিয়াছেন। ইহাতে রবীন্দ্র-সাহিত্য বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু কাব্যপ্রতিভা স্বধর্মচ্যুত হওয়ায় বাংলা কাব্যসাহিত্যের যে কতটা ক্ষতি হইয়া গেল, তাহা কেবল অনুমানই করিতে পারি, প্রমাণ করিবার উপায় নাই।

এই কাব্যপ্রবাহ হইতে কবির গান বাদ দিয়াছি—কবির ভাষায় সুরহীন গান শিখাহীন প্রদীপের মত। এখন এই শিখাহীন প্রদীপের আলোচনা করিলে কবির প্রতি অবিচারের আশঙ্কাই অধিক। সংগীতকলায় আমাদের অধিকার না থাকায় এই অনধিকারচর্চার লোভ সংবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই গানগুলির সহিত গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালিকেও বাদ দিয়াছি। ইহাতে বোধ হয় পাঠকের দুঃখের চেয়ে বিস্ময়ের কারণ অধিক। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির দ্বারাই পাশ্চাত্যদেশে প্রখ্যাত। এদেশেও, নিতান্ত দুঃখের বিষয়, অনেক স্থলে তিনি কেবলমাত্র গীতাঞ্জলির দ্বারা পঠিত। এমন স্থলে গীতাঞ্জলিত্রয়ীকে এই কাব্য আলোচনা হইতে কেন বাদ দিলাম, একটু বিস্তৃতভাবে তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন হয়।

"চিরকাল গানের বই ছাপাইতে সংকোচ বোধ করি। কেননা, গানের

বহিতে আসল জিনিসই বাদ পড়িয়া যায়। সংগীত বাদ দিয়া সংগীতের বাহনগুলিকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয় যেমন গণপতিকে বাদ দিয়া তাঁহার মূষিকটাকে ধরিয়া রাখা।”

—জীবনস্মৃতি : গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ

গানের বই ছাপিতে গিয়া কবি এই কৈফিয়ত দিয়াছেন। গান, বিশেষ গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালি সমালোচনা না করিবার ইহা গৌণ কারণ। মুখ্য কারণ কি? এই গ্রন্থের নাম রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ; এই প্রবাহ সন্ধ্যাসংগীতের শিখর হইতে উদ্গত হইয়া, পুষ্টতর গভীরতর হইতে হইতে চলিয়াছে। আমরা মূল স্রোতকেই অনুসরণ করিতেছি, ইহার শাখা-উপশাখা অসংখ্য; তাহাদের অনুধাবন করিলে, কোনো কালেই অন্তর লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়া উঠিবে না। গীতাঞ্জলিত্রয়ী রবীন্দ্রকাব্যের একটি শাখা, ইহা সমগ্র কাব্যকে বৈচিত্র্য ও গভীরতা দিয়াছে মাত্র।

এই শাখাটি রবীন্দ্রকাব্যে অনেকটা প্রক্ষেপের মত। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে আজকাল, বিদেশে গীতাঞ্জলির সমাদরের ফলে, রবীন্দ্রনাথকে গীতাঞ্জলির কবিহিসাবে দেখিবার একটা দুশ্চেষ্টা হইতেছে। অবশ্যই তিনি গীতাঞ্জলির কবি, কিন্তু তাহা একাংশ মাত্র, এবং অবশ্যই শ্রেষ্ঠ অংশ নহে।

রবীন্দ্রকাব্যপ্রেরণার মূলে প্রধানত নারীর প্রেম; কাব্যের প্রধান ধর্ম জগতের বিচিত্রতার আকর্ষণে ইহার বহুমুখিতা; এবং এই কাব্যের মূল বন্দনীয় মানব। গীতাঞ্জলি প্রভৃতির প্রেরণার মূলে ভগবৎভক্তি। পূরবী ও তৎপরবর্তী কাব্যে দেখিতে পাই, নারীর প্রেম পুনরায় দেখা দিয়াছে। এমন ক্ষেত্রে গীতাঞ্জলি-পর্বে নারীর প্রেমের আধ্যাত্মিক রূপান্তরের কথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। কাব্যের বহুমুখিতা রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। মানবজীবনের দশ দিক তাঁহাকে ডাক দিয়াছে, এবং তাহার প্রত্যুত্তরে তিনি দশ মুখে সাড়া দিয়াছেন। এই বৈচিত্র্যের জন্য অনেক সময় তাঁহার কাব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই বিচিত্রতাও উক্ত পর্বের বৈশিষ্ট্য নহে।

তার পরে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য মানুষ পাইয়াছে; ভগবান বা প্রকৃতি নহে। গীতাঞ্জলিতে ইহারও ব্যতিক্রম। অবশ্য এই তিনটি লক্ষণেরই ব্যত্যয় গানের বই তিনখানিতে আছে।

অতীত ভারতে মানসভ্রমণের ফলে কবির জীবনে একটা আধ্যাত্মিক অরাজকতার যুগ আসিয়াছিল। ইহার পরিচয় এই সময়টিতে কাব্যের অসদ্ভাবে ও গদ্যের প্রাদুর্ভাবে। গীতাঞ্জলিতে আসিয়া তিনি আবার কাব্যকে পাইলেন, কিন্তু তাঁহার কাব্যধর্ম তখনো ফিরিয়া আসিল না।

বাহিরের কয়েকটি ঘটনায় কবির স্বাভাবিক ভগবদ্ভক্তিকে এই সময়ে আত্যন্তিক ভাবে জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল : সেই অস্বাভাবিক আগ্রহে মানবজীবনের প্রতি কবির স্বাভাবিক আগ্রহ যেন কিছুদিনের জন্য চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। এক কথায় ইতিপূর্বে কবির নিকটে মানবজীবনটা বড় ছিল, এই সময়টাতে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনটা বড় হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে কবির পত্নীর মৃত্যু হয়, তার পরে এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার প্রথমা কন্যা ও তিন বৎসর না যাইতেই কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন। উপরি-উপরি তিনটি মৃত্যুশোক, তদুপরি আবার ব্যাধিতে কবির শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এইসব কারণে কবির দৃষ্টি কিছুকালের জন্য নিজের অধ্যাত্মজীবনের দিকে পড়িল। তাঁহার জীবনে ভগবদ্ভক্তি গোড়া হইতেই ছিল। যে-সব উপাদানে কবির জীবন গঠিত হইয়াছে, মহর্ষির প্রভাব তাহার একটি। এই সময়টিতে মহর্ষির প্রভাব যেমন প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে, এমন আর কখনও নহে।

ভগবদ্ভক্তি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একটি অনুষঙ্গিক উপাদানরূপে গোড়া হইতেই ছিল, গীতাঞ্জলি-পর্ব তাহারই শ্রেষ্ঠ বিকাশ। কিন্তু যে উপাদান তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ উপাদান, সেই সর্বমানবের সহিত একাত্মবোধ, তাহা কিছু কালের জন্য গীতাঞ্জলিপর্বে বাধাগ্রস্ত ও অবলুপ্ত হইলেও পরবর্তী কাব্যে ইহার পুনরাবর্তন ও নবতেজে অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে—বলাকা, পূরবী, মহুয়ায়।[৭]

গীতাঞ্জলির সুলভ আধ্যাত্মিক আনন্দবাদ বলাকার কোনো কোনো কবিতায় বিরাট বিশ্বব্যাপী সংশয়ের দ্বারা প্রতিহত। সেই আনন্দবাদ ও সংশয় পূরবী ও মহুয়াতে চরম শান্তি ও অখণ্ড করুণায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সেই শান্তি ও করুণার আধার ভগবান নহেন, প্রকৃতির স্পর্শ ও নারীর প্রেম। সে প্রেম যৌবনের উত্তপ্ত প্রেম নহে। ইহার সহিত এমন একটি সবিষাদ করুণা ও সরল শান্তির ভাব জড়িত যে ইহাকে কৈশোর প্রেম বলা উচিত, বস্তুতঃ ইহা কৈশোর প্রেমের স্মৃতি। বর্তমানের অভিজ্ঞতা ও অতীতের স্মৃতি ইহার মূল

উপাদান। ইহা কৈশোর প্রেম বলিয়াই ইহার লক্ষ্য যে-নারী, কবি তাহাকে লীলাসঙ্গিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তিই যদি কবির যথার্থ ধর্ম হইত, তবে কাব্যের পঞ্চমাঙ্কে আসিয়া কবিপ্রতিভা এই লীলাসঙ্গিনীতে আশ্রয় খুঁজিত না। মানবমুখী কবি গীতাঞ্জলির পরবর্তী কাব্যে স্বধর্মে ফিরিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই বলাকা পূরবী মহুয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

গীতাঞ্জলি প্রভৃতি কি কারণে মূল কাব্যপ্রবাহের অন্তর্গত নহে, তাহা দেখিলাম। এখন দেখা যাক, কোন্ কোন্ গুণে কবির কাব্যে ইহার যথার্থ স্থান, অন্তত স্থান পাওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথ কৈশোর হইতেই গান লিখিতেছেন, কিন্তু হিসাব করিলে দেখা যাইবে গীতাঞ্জলি-পর্ব হইতে গান--কবিতা নহে—তাঁহার ভাবের বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি সংখ্যা বাহুল্যে, কি কাব্যসৌন্দর্যে গীতাঞ্জলির উত্তর-পর্বের গান তৎপূর্বের গানের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইহার কারণ কি? সংক্ষেপে এইটুকু বলা যাইতে পারে; জীবনের পরিণতির সঙ্গে কবি এমন একটা ছায়া-শরীরী জগতকে প্রকাশের চেষ্টা করিতেছিলেন, যাহা কেবল সংগীতের দ্বারাই কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভব। কবির জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বছরের ভাবের বাহন কবিতা, কারণ সে জগৎটা সূক্ষ্ম-শরীরী হইলেও একেবারে ছায়া-শরীরী নহে। কিন্তু পঞ্চাশের কাছে আসিয়া কবির জগৎ ছায়া-শরীরী হইয়া উঠিয়াছে।

গীতাঞ্জলি-পর্ব হইতে গান যেমন কবির ভাবের প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইল, তেমনি এই সময়ে গানের যে ঠাট তিনি আবিষ্কার করিলেন, পরবর্তী কালে তাহা কবির এবং কিয়ৎ পরিমাণে বাংলা সাহিত্যের গানের প্রধান ঠাট হইয়া উঠিয়াছে। কবির কৈশোর ও যৌবনের গানে অসংখ্য বৈচিত্র্য আছে কিন্তু তাহা যেন কোনো কলাগত পরিণতি লাভ করে নাই বলিয়াই তাহাতে এত বিচিত্রতা, এত ঠাট-বদল। গীতাঞ্জলির পরের গানগুলি ঠাটের সেই পরিণতিকে লাভ করিয়াছে, কোনো পরিবর্তনে যাহার সম্পূর্ণতার হানি না হইয়া আরো বিচিত্র হইয়া ওঠে।

এই তো গেল গানের বহিরঙ্গের কথা। অন্তরঙ্গে, অনেকের বিশ্বাস, গীতাঞ্জলির গান, বৈষ্ণবকবিতার নিছক প্রভাবমূলক। বৈষ্ণবকবিদের প্রভাব গীতাঞ্জলিতে আছে, যেমন আছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অন্যত্র। কাজেই ইহা গীতাঞ্জলির বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু একথাও সত্য নয় যে কোনো বৈষ্ণবকবি, তিনি যত বড়ই হউন না কেন, গীতাঞ্জলির গান লিখিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথের

মানসিক গঠন বিচিত্র; তাঁহার অনেকগুলি স্তর আছে; উপনিষদের স্তর, প্রাকৃতিক অনুরাগের স্তর, দেশপ্রাণতার স্তর, আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানের স্তর। বৈষ্ণবভাবের অর্থাৎ যে স্তরে মানবপ্রেমের সহিত ভগবৎপ্রেম মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, সেই বৈষ্ণবস্তরও ইহার অন্যতম। গীতাঞ্জলি-পর্বের গান এইসমস্ত স্তরের ভিতর দিয়া নির্যাসিত হইয়া রূপ লাভ করিয়াছে—বৈষ্ণবকবিদের একসুর-মনে এমন বিচিত্র রাগিণী ধ্বনিত হইতে পারিত না। বৈষ্ণবপদের যে বিচিত্রতা তাহা প্রেমের নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগের ভাববৈচিত্র্যে গঠিত। বৈষ্ণবকবিরা জীবনের একটি ভাগকেই অসংখ্যভাবে যাচাই করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক কালে জীবন যখন অত্যন্ত জটিল ও বিস্তৃত, কবির অল্পবিস্তর বহুমুখী না হইয়া উপায় নাই। এ দোষ বা গুণ কোনো কবি-সম্প্রদায়ের নয়—অতীত ও বর্তমানের। এই বহুমুখিতার দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবকবিদের হইতে পৃথক। কবির জীবনে যে স্তরগুলির কথা বলিলাম, সব স্তরের নির্যাস গীতাঞ্জলি-পর্বের গানে আছে। এমন গানও আছে (গীতিমাল্য, ৯৯) আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষায় ক্রমবিকাশবাদ না জানিলে, কোনো মহাকবির পক্ষেও লেখা যাহা অসম্ভব হইত।

আর-একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। গীতাঞ্জলিতে আসিয়া বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক অনুরাগের গান আমরা পাই। ইহার পূর্বে প্রকৃতি মানুষকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার কাব্যে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে সে কেবল নিজের গৌরবেই কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। পরবর্তীকালে বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক অনুরাগ স্পষ্টতর হইয়া অসংখ্য গানে প্রকাশিত। ইহা কেন হইল? ইহা তাঁহার শৈশবের প্রকৃতির প্রতি অনুরাগের পুনরবতারণা মাত্র। শৈশব হইতেই প্রকৃতির সহিত কবি একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন; সঙ্গিহীন শৈশবজীবনে প্রকৃতিই তাঁহার খেলার সাথী ছিল। এই প্রেম চির জীবন তিনি বহন করিয়াছেন। কিন্তু যৌবনে ও প্রৌঢ়ত্বে জীবনের বিচিত্র আবর্তে পড়িয়া শৈশবের সঙ্গী অনেকটা পিছাইয়া গিয়া অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষের প্রেমে ও প্রকৃতির প্রেমে প্রভেদ এই যে, মানুষের প্রেমে দ্বন্দ্ব আছে, তাহা সজীব মনের সহিত সজীব মনের সংঘাত; প্রকৃতির প্রেম নির্দ্বন্দ্ব; তাহার দিক হইতে কোনো বাধা, কোনো প্রচেষ্টা নাই; এই প্রেমে মানুষ যেন সম্পূর্ণভাবে আপনার শক্তিকে লাভ করিতে পায় না। যৌবনের শক্তিবহুল সময়টা দ্বন্দ্ব চায়, সংঘাত চায়,

তাহাতে আপনাকে সে সম্পূর্ণভাবে লাভ করে। কাজেই প্রাকৃতিক প্রেম অনেক সময়েই যৌবনকে পুরাপুরি সন্তুষ্ট করিতে পারে না। এ প্রেম শৈশবের এবং বার্ধক্যের। কবির শৈশবে প্রকৃতি যে সঙ্গ দান করিত, সেই পুরাতন সঙ্গ পুনরায় তিনি নূতন ভাবে, এবং দীর্ঘ জীবনের নানা অভিজ্ঞতার মিশ্রণে নিবিড়ভাবে ফিরিয়া পাইলেন এই সময়টাতে। পরবর্তী কালে এই পুরাতন সঙ্গী কবিজীবনের প্রধান একটি পাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

বলাকা পর্ব

এই সময়টিতে কবির কাব্যজীবনে একটি পরিবর্তন ধীরে ধীরে আসিতেছিল, হঠাৎ একটি ঘটনায় তাহা অভাবিতপূর্ব রূপ ধারণ করিল। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে বলাকা প্রকাশিত হইল। কিন্তু ইহার অনেক কবিতা ১৯১৪ হইতে অর্থাৎ কবির ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের অল্প পরেই রচিত হইয়াছিল। বলাকায় আসিয়া কবি পুনরায় মানুষের কবি হইয়া দেখা দিলেন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ নৈবেদ্য-প্রকাশের পর হইতে কবির প্রতিভার বনবাস; বারো বৎসর পরে কবিপ্রতিভা বনবাসের তপস্যায় উজ্জ্বল পাণ্ডবগণের মত পুনরায় মানবের ক্ষেত্রে দেখা দিল। নৈবেদ্য-প্রকাশের পর হইতে আধ্যাত্মিক অরাজকতায় কবিপ্রতিভা যে সংগতি-লাভের চেষ্টা করিতেছিল—যে অনুসন্ধানে মানবের কবিকে সাময়িক ভাবে মানুষের দেবতার পাদপীঠে লইয়া গিয়াছিল, সেই চেষ্টা সেই অনুসন্ধানের অন্তে মানুষের কবি পুনরায় সংসারের ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ঠিক পূর্বের কাব্য আর হইল না। গীতাঞ্জলি-পর্বের অভিজ্ঞতার রং কবির পরবর্তী কাব্য রঞ্জিত করিয়া তুলিল। সেই জন্য বলাকা পূর্ববর্তী কাব্য হইতে অভিজ্ঞতার ও অভিজ্ঞতার প্রকাশে বিচিত্র ও জটিলতর।

গীতাঞ্জলিতে যে অভিজ্ঞতার বিকাশ, গীতিমাল্যে আসিয়া তাহা পূর্ণতর হইয়াছে, কিন্তু গীতালি পড়িলেই স্পষ্ট দেখা যায়, সে অভিজ্ঞতার বর্ণ ফিকা হইয়া আসিতেছে, সে প্রেরণা অনেক পরিমাণে চলিয়া গিয়াছে, কেবল তাহার ঝোঁকটা রহিয়াছে মাত্র। তার পরেই বলাকা। সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বের অন্ধকারটিই গভীরতম। বলাকার পূর্বেই গীতালি।

বলাকাতে কবিপ্রতিভার পুনরাবুর্তন ঘটিল কেমন করিয়া? যে যে কারণে গীতাঞ্জলির আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল, সে সমস্ত ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া যাইতেছিল। মৃত্যুর শোক হৃদয়ের ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া কল্পনার ভাণ্ডারে গিয়া পড়িল। শারীরিক ব্যাধি ও অবসাদ দূর হইয়া নূতন ভাবে কবি স্বাস্থ্যের আনন্দ লাভ করিলেন; এবং দীর্ঘকাল বিদেশ-ভ্রমণে কবিপ্রতিভা গতিমন্ত্রে পুনরুদ্দীপিত হইয়া দেখা দিল। যে মানবকে তিনি চিরদিন অনুসন্ধান করিতেছিলেন—এদেশে কেবল যাহার ভগ্নাংশ মাত্র লাভ করিয়াছিলেন—ইউরোপের পূর্ণতর ক্ষেত্রে তাহাকে সমগ্রভাবে দেখিতে পাইলেন। সহসা নোবেল-পুরস্কারের সিংহদ্বার খুলিয়া মানুষের কবিকে সমস্ত মানবসমাজ যেন আনন্দে অভ্যর্থনা করিল।

রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবির পক্ষে নোবেলপুরস্কার এমন কিছু অসম্ভাবিত সৌভাগ্য নহে। কিন্তু এই উপলক্ষ্যটা তাঁহার কাব্য-জীবনের ইতিহাসের পক্ষে স্মরণীয়। এই সুযোগ না ঘটিলে, কবি যেভাবে ইউরোপের বৃহৎ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বিচিত্র মানবসমাজের অভিজ্ঞতা আজ লাভ করিতে পাইয়াছেন, এমন সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ; এবং ইহা সম্ভব না হইলে কবিপ্রতিভা গীতাঞ্জলির অভিজ্ঞতা-পর্ব হইতে ফিরিয়া পুনরায় আপনার স্বাভাবিক সঞ্চরণের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিত কিনা সন্দেহ। কবির প্রতিভায় বহুমুখিতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা আছে, এদেশের ক্ষুদ্র জীবনক্ষেত্রে যেন তাহা পূর্ণভাবে পাখা মেলিতে না পারিয়া সঙ্কুচিত হইয়াছিল। এই ঈগল-শিশুর সততপ্রসরণশীল ডানার পক্ষে যত বড়ই হউক, তাহা পিঞ্জর মাত্র। ইহার পাখা মেলিবার পক্ষে ইউরেশিয়ার সুবৃহৎ আকাশপট আবশ্যক।

বলাকা রবীন্দ্রকবিপ্রতিভা-নাটকের তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম অঙ্ক যতগুলি সূত্র ও সম্ভাবনা লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল, দ্বিতীয় অঙ্কে তাহা ঘাতপ্রতিঘাতে বিচিত্র হইয়া তৃতীয় অঙ্কে সম্ভাব্যতার চরমে উঠিয়াছে। শেষের দুইটি অঙ্কে অন্য কোনো সম্ভাবনা নাই—কেবল তৃতীয়ে যাহা নাটকীয়তার শিখরে উঠিয়াছে, শেষ দুইটিতে তাহারই সুযোগ্য সমাধান। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সুরু হইতে যে শিল্পধর্ম ও ভাবের সূত্রপাত দেখা যায়, বলাকায় তাহা পূর্ণ পরিণতি পাইয়াছে।

বলাকায় প্রধান লক্ষ্যণীয় ইহার ছন্দ। ছন্দের এই অভিনব বৈষম্যে কবি কি করিয়া উপস্থিত হইলেন, সে ইতিহাস আলোচনা করা যাক।

সন্ধ্যাসংগীত কবিপ্রতিভার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় কাব্য। সন্ধ্যা-সংগীতেই কবি প্রথম পূর্বতন ভাষার জড়তা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ইহার পূর্বে গীতিকাব্যের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, গতি বা ভাষার চলতা কবির আয়ত্ত ছিল না। সন্ধ্যাসংগীতে প্রথম বারের জন্য ইহা দেখা দিল।

মানসীর শেষে এবং সোনার তরীতে আসিয়া শিল্পধর্মের আর-একটি সম্পদ কবি লাভ করিলেন—তাহা ভাষার সংহতি-শক্তি। এই দুটির যে কোনো একটিকে বাদ দিলে শিল্পের চরম সার্থকতা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। এই গতি ও সংহতির সামঞ্জস্য শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যে দেখা যায়। ভাষার এই গতি যেমন মনের একটি লক্ষণ, ভাষার সংহতিও তেমনি মনের সংযমের পরিচায়ক। এই সংহতি-সংযম-বিহীন শিল্পী অপ্রতিহত গতির স্রোতে আপনাকে উদ্দাম করিয়া দিয়া নিঃস্ব করিয়া ফেলে। বিশেষ যাহার প্রতিভার ধর্মই চলতা, তাহার পক্ষে এই সংহতি-গুণ অপরিহার্য। সোনার তরীর পূর্বে কবির কাব্য যে পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাহার প্রধান কারণ তিনি এই সংহতি-শক্তি তখনও লাভ করেন নাই।

এই গতি ও সংহতির দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের চেষ্টার ইতিহাসই সোনার তরী হইতে নৈবেদ্যের ইতিহাস; গীতাঞ্জলি-পর্ব প্রধানত সংগীতাত্মক বলিয়া উহাতে গতির প্রাধান্য। শুধু তাই নহে উক্ত পর্বের আধ্যাত্মিক অরাজকতার সঙ্গে সঙ্গে কবি সোনার তরীতে আয়ত্ত সংহতি-গুণকেও এই সময়ে হারাইয়াছিলেন। বলাকায় আসিয়া প্রতিভার যথার্থ ক্ষেত্র লাভের সঙ্গেই প্রতিভার পূর্বায়ত্ত এই শক্তি ফিরিয়া আসিল। বলাকার ছন্দ এই দুই শক্তির শিল্পসম্মত সামঞ্জস্য ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কল্পনায় এই সংহতি-গুণের চরম। ইহার অনেকগুলি কবিতাই এক একটি শ্লোকে সংহত হইয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। আবার ক্ষণিকার অধিকাংশ কবিতা সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত অবিরল ধারায় যেন বহিয়া গিয়াছে। ইহাতে গতির চরম। এই দুটিই বলাকায় লক্ষ্য করিবার মত।

এই ছন্দের কবিতাগুলিতে কয়েকটি ছত্র লইয়া একটি শ্লোক বাঁধিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে বন্ধন কল্পনার শ্লোকবন্ধনের মত অপরিবর্তনীয় ও দৃঢ়পিনদ্ধ নহে। প্রত্যেকটি শ্লোক স্বকীয় প্রয়োজন ও ধর্ম অনুসারে হ্রস্বদীর্ঘ ক্ষুদ্রবৃহৎ হইয়া বিচিত্র-তার সৃষ্টি করিয়াছে। কল্পনার প্রত্যেকটি শ্লোকে একই নিয়মের পুনরাবর্তন;

একটি শ্লোকের আকৃতিকে ব্যষ্টি ধরিয়া, অনেকগুলি শ্লোকে একটি কবিতা গঠিত। ইহার বৈচিত্র্য একই ব্যষ্টির আবর্তনের উপর নির্ভর করে। বলাকায় শ্লোকের আকৃতি অপেক্ষা প্রকৃতির উপরে অধিক নির্ভর। প্রত্যেকটি শ্লোক নিজের স্বভাব অনুসারে গঠিত, আবার অনেকগুলি বিচিত্রধর্মী শ্লোক লইয়া একটি অবিভাজ্য সম্পূর্ণতার সৃষ্টি। একদিকে শ্লোকের সংহতি, অন্যদিকে প্রত্যেকটি শ্লোকের বিচিত্র গতি, ইহারই সুনিপুণ সমাবেশ বলাকার ছন্দে।

এই গেল যেমন কাব্যের বহিরঙ্গের কথা—অন্তরঙ্গেও এইরূপ একটা পরিবর্তন দেখা যায়। চলতাধর্মী রবীন্দ্রনাথের কাব্য যেন একটা নদীর স্রোতকে অনুধাবন করিয়া চলিয়াছে। পূর্বের কাব্যে ইহা পদ্মা। কিন্তু বলাকায় আসিয়া দেখি সেই মর্ত্যধারা আকাশ-গঙ্গায় পরিণত হইয়াছে। ব্যোমযানে করিয়া যতই উচ্চে ওঠা যায়, ক্রমে বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর সংস্পর্শ-শূন্য হইতে হইতে স্বচ্ছ ও লঘু হইয়া আসে। বলাকার এই অত্যুচ্চ শিখরে কাব্য প্রায় নির্গুণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যেন স্বতন্ত্র একটা দেশ—পৃথিবীর একটা ছায়াশরীরী সংস্করণের মত। ইহা পূর্ববর্তী কাব্যের মত বস্তু-বিশ্বের জগৎ নয়; কাল-বিশ্বের জগৎ। এ জগতের প্রধান উপাদান কাল এবং তাহার ধর্মই চলিয়া-যাওয়া; অর্থাৎ যে চলতা পূর্বে কাব্যের ধর্ম ছিল এখানে তাহাই কাব্য-বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

একটা উদাহরণ লওয়া যাক। সোনার তরী, চিত্রায় কবি যে ক্রমবিকাশ-বাদের কথা বলিয়াছেন, যেমন বসুন্ধরা বা সমুদ্রের প্রতি কবিতায়, তাহা ডারবিনের উদ্ভাবিত কায়িক বা পার্থিব ইভল্যুশন। স্থূল জগতের কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়মের চক্রান্তে জীবজগতে অন্ধভাবে একটা উন্নতির সোপান শ্রেণী চলিয়াছে। নিম্নতম জীব হইতে উচ্চতম সকলেই আপনার অজ্ঞাতসারে প্রাণ-পুরুষের তাড়নায় উচ্চতর সোপানে উঠিয়া যাইতেছে। ইহা হইতে না আছে তাহার নিস্তার, না আছে তাহার স্বেচ্ছায় একচুল এদিকে ওদিকে যাইবার শক্তি। এখানে মানুষ জড়জগতের সগোত্র। এই মৌলিক জড়ত্ব মানুষের পক্ষে গৌরবের নয়।

বলাকার ক্রমবিকাশবাদ এমন জড় যাত্রা নহে। ইহার কাল-বিশ্ব আপনার নিয়মে আপনি প্রবর্তনা পাইয়া বিকশিত হইতেছে। আমরা ক্ষুদ্র দৃষ্টি বশত তাহার একাংশ মাত্র দেখি বলিয়াই তাহার আদ্যন্ত সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। অবশ্য বার্গসঁ স্পষ্টত ইহার আদ্যন্ত এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার মতে

এই কাল-বিশ্বের একমাত্র ধর্ম অর্থহীন নিরুদ্দেশ গতি। রবীন্দ্রনাথ এমন কথা বলিতে পারেন না। তিনি জীবনে যে ঐক্য ও মহাপরিণামকে অনুসন্ধান করিতেছেন, যাহার আভাস তিনি ক্ষণে ক্ষণে পাইয়াছেন, গীতাঞ্জলি-পর্বের অভিজ্ঞতায় যে পরিণতির স্বাদলাভ সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল, এমত অবস্থায় বার্গসঁর দুর্জ্ঞেয় নিরর্থক গতিবাদ তিনি স্বীকার করিতে পারেন না।

যদিও ইহা সত্য, তবু তিনি এই নিরর্থক গতিবাদের যতটা নিকটে এখানে আসিয়াছেন, এমন ইহার আগেও নয়, পরেও নয়। বলাকায় এই গতিবাদ দুই ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কতকগুলি কবিতায় কেবল গতি, তাহাতে পরিণাম বা সার্থকতার উল্লেখ স্পষ্টভাবে নাই। দুই-তিনটি কবিতায় গতি যে পরিণতির মুখে আগত তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

সমসাময়িক ফাল্গুনীতেও এই একই গতিবাদ। বৎসরের চক্র নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আবর্তিত হইলে দেখি তাহার পরিণাম বসন্ত। মানুষের জীবনে একই লীলা! যৌবনের দল অবিরাম অনুসন্ধানের পর রহস্যের অন্ধকার গুহাটার ভিতর হইতে নবযৌবনকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। পিছন হইতে যাহাকে বৃদ্ধ বলিয়া মনে হইয়াছিল—চক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত হইলে সম্মুখ হইতে তাহাকে যৌবন রূপে দেখা গেল। অবশ্য সে-যৌবন 'ফাল্গুনীর যুবকদলের' অপেক্ষা গভীরতর আর-একটা অভিজ্ঞতা। এই যৌবন, দৈহিক যৌবন ও বার্ধক্য, জীবনের এই দুই বিপরীত কোটির পরপারে অবস্থিত একটা আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য ছাড়া আর কিছু নয়।

বলাকাতেও এই তত্ত্ব আর-এক ভাবে প্রকাশিত। পৃথিবীর জড় ও জৈব সকলের মধ্যেই একটা অবিশ্রাম গতির আকাঙ্ক্ষা; ইহার কারণ সকলেরই মনে একটা রূপ গ্রহণ করিবার আগ্রহ। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকে ঈপ্সিত রূপ না পাইতেছে, ততক্ষণ গতি ও পরিবর্তনের আর সীমা নাই। একটা ভাঙিয়া আর-একটা, একটির পরিবর্তনে আর-একটি—কিন্তু যেমনি ইহারা ঈপ্সিত রূপে আশ্রয় লাভ করিয়া আত্ম-অস্তিত্বে সচেতন হইতেছে অমনি এই অবিরাম গতির সার্থকতা। তার পূর্বে না আছে ইহার বিরাম, এবং স্বরূপ লাভ না করিলে না ঘুচে ইহার নিরর্থকতা। বিশ্বের ধূলাবালি হইতে মানুষের চৈতন্য সবই এই এক আন্দোলনে, এক আকাঙ্ক্ষায় জড়িত, আন্দোলিত।

যেমন ধরা যাক শিল্পীর মন। একটি ভাব-তরঙ্গে তাঁহার চিত্তের অখণ্ড

শান্তি চঞ্চল হইয়া শত সহস্র তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল। কল্পনার ক্রিয়া সুরু হইল। এই ক্রিয়াটা যতক্ষণ রূপ না পাইতেছে ততক্ষণ ইহার শান্তি নাই। যে পরিমাণে সে শান্ত হইতেছে, সেই পরিমাণে সে রূপ পাইতেছে; তাহার যতটুকু শান্ত হইল, ততটুকু রূপ পাইল। আমরা যখন শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন হই, তখন ক্রিয়াটা সম্পূর্ণভাবে থামিয়া গিয়াছে। শিল্পসৃষ্টির এক প্রান্তে সৃষ্টি, অপর প্রান্তে শিল্পীর চিত্তের ক্রিয়া, মাঝখানে এই পরিবর্তনশীল গতি ও স্থিতির লীলা। আমরা সাধারণত সৃষ্টি ও ক্রিয়া সম্বন্ধেই সচেতন, অধিকাংশ লোকেই স্পষ্টভাবে মাঝখানকার প্রক্রিয়াটাকে অনুধাবন করি না। করি আর না করি, সৃষ্টিতত্ত্বের আসল রহস্যটা ওইখানে।

সমাজে ও রাষ্ট্রেও ঠিক তেমনি। সমাজে বা রাষ্ট্রে মানুষের চিত্ত যতক্ষণ একটা ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য না পাইতেছে, ততক্ষণ বিদ্রোহ ও অরাজকতার পালা। বিদ্রোহ এবং অরাজকতা—এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যাবস্থা; ইহার পরিণাম একটা সুশৃঙ্খলিত সামাজিক ব্যবস্থান। এই মধ্যাবস্থাটাকে রবীন্দ্রনাথ চরম বলিয়া মনে করেন না, সেই জন্য তিনি সমাজে বা রাষ্ট্রে বা শিল্পে বিদ্রোহনায়ক নহেন। একথা অবশ্য সত্য, তিনি এমন অনেক মত প্রচার করিয়াছেন, যাহা বিদ্রোহের জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আরো একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে, তাঁহার বিদ্রোহ, সর্বদাই একটা গভীরতর সামঞ্জস্যে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত। আর সামঞ্জস্যই তো শান্তি। ফলত রবীন্দ্রনাথের মতে যেমন বিশ্বের মধ্যাবস্থায় বিদ্রোহ বা গতি, তেমনি তাঁহার ফিলজফির প্রারম্ভে বিদ্রোহ, আর অন্তে সামঞ্জস্য ও শান্তি।

বলাকায় তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলাম অবিরাম গতি অবিচলিত বিরামের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া সার্থকতা লাভ করিল। আবার বলাকায় বহিরঙ্গের দিক হইতেও দেখিয়াছি, কাব্যের গতি সংহতির মধ্যে ধরা দিয়াছে। অন্তরঙ্গে বহিরঙ্গে একই প্রক্রিয়া বিভিন্নভাবে অনুসৃত হইয়াছে। এই যে সর্বাঙ্গীন সমাবেশ বা সামঞ্জস্য ইহাই বলাকার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে সর্বতোভাবে অনুধাবন না করিলে বলাকা বুঝিবার চেষ্টা ব্যর্থ শ্রম মাত্র।

সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীত

সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতের রচনাকালকে এক বলিয়া ধরিলে ভুল হইবে না। দুইখানি কাব্যের অনেকগুলি কবিতা একরূপ সমকালে রচিত। কাজেই সময়ের হিসাব করিয়া বিচার করিতে গেলে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে না। সময়ের ব্যবধান এতই অল্প যে তন্মধ্যে কবির শক্তির পরিণতির সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে এমন একটি বিস্ময়জনক অভিজ্ঞতা কবির জীবনে ঘটিয়া গেল—যাহা সময়ের স্বাভাবিক ব্যবধান ও গতিকে অতিক্রম করিয়া নূতন জগতের রূপ ও তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে। এই অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের একটি প্রধান ঘটনা, প্রধানতম ঘটনাও বলিতে পারা যায়। এই ঘটনা সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

"সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধকরি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।" —জীবনস্মৃতি : প্রভাতসংগীত

ইহাকে বলা যাইতে পারে কবির বিশ্বরূপদর্শন। ইহারই নাম মহাকবিদিগের দিব্যদৃষ্টিলাভ। এই দিব্যদৃষ্টি ওয়ার্ডসওয়ার্থ অতি বাল্যকালে লাভ করিয়াছিলেন। এই দিব্যদৃষ্টিলাভের অভিজ্ঞতাই কীটস "পোয়ট্রি এণ্ড স্লীপ" নামক কবিতায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শেলি যেন এই দিব্যদৃষ্টি লইয়াই জন্মিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রতিধ্বনি এবং শৈশবসংগীতের পথিক কবিতায় একই বস্তু। যেটুকু প্রভেদ তাহা এই দিব্যদৃষ্টির অভাবসঞ্জাত। পথিক কবিতায় ইন্ধন আছে, শিখা জ্বলে নাই। সে শিখা দিব্যস্পৃহায় ছাড়া জ্বলে না। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থা "বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত

ছন্দোবাণবিদ্ধ বাল্মীকির" মতো হইয়াছিল। বাণীর বিদ্যুৎপর্ণা স্বর্গ হইতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া জড় কবিচিত্তে 'মহাকবিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। পথিক কবিতায় চন্দনের ইন্ধন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়া দিব্য আলোক ও দিব্য সুগন্ধি বিস্তার করিয়াছে।

এই অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের অন্যতম মহত্তম ঘটনা বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছি তাহার স্বপক্ষে স্বয়ং ঋবির সাক্ষ্য আছে। এই ঘটনাটির যত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুযোগ পাইলেই করিতেন, এমন আর কোনোটির নহে। শেষ বয়সের 'মানুষের ধর্ম' নামক রচনায় ইহার বিশদ ভাষ্য আছে :

"সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে যে-ভাবে আমাকে আবিষ্ট করেছিল, তার স্পষ্ট ছবি দেখা যায় আমার সেই সময়কার কবিতাতে—প্রভাতসংগীতের মধ্যে।··· তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতের তুচ্ছতার আবরণ খ'সে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে। এইটে যে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলুম, সেইজন্যই 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বার বার ধ্বনিত হয়েছে।"

—মানুষের ধর্ম

আবার—

"এই মন্ত্র [গায়ত্রীমন্ত্র] চিন্তা করতে করতে মনে হ'ত বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূর্লোক অন্তরীক্ষ আমি তারি সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব; বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।"

—মানুষের ধর্ম

সেই কবি-কৈশোরের জ্যোতির্ময় প্রভাতে যে দিব্যবাণী তিনি লাভ করিয়াছিলেন, যাহার ফলে চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহির ও অন্তর সমস্তর সমন্বয়ে এক অখণ্ড সচল সমগ্রতাকে তিনি অনুভব করিয়াছেন—তাহাই রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার জগৎ, রবীন্দ্রনাথের কবি জগৎ। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে ও প্রতিধ্বনিতে তাহারই সূচনা। কিন্তু সূচনামাত্র। প্রতিধ্বনিতে ধ্বন্যতীত, ইন্দ্রিয়াতীতের অন্বেষণ আছে। অভিজ্ঞতার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার সঙ্গে ধ্বনি ও ইন্দ্রিয়ের

জগৎ মিলিত হইয়া সাধনাজাত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেই সূর্যোদয়ের জ্যোতির্ময় প্রভাত তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছে যে জগতের জ্যোতির্ময় রূপটিই সত্য। সেই জ্যোতির্ময় স্বরূপে তিনি গায়ত্রী মন্ত্রের নূতন অর্থ পাইয়াছেন। এই অভিজ্ঞতাই জীবনের পরিণতির সঙ্গে বিকশিত হইতে হইতে রবীন্দ্রনাথের সবিতৃ-বাদে পৌঁছিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ চির নবায়মান প্রভাতের কবি; সূর্যদেব তাঁহার জীবনের অধিদেবতা, ইহাই তাঁহার সবিতৃ-বাদ। আর এই সমস্তর আদি মুহূর্তে আছে—সেদিনকার জ্যোতির্ময় সূর্যোদয়।

বাল্মীকি ও কালিদাসের কবিত্বশক্তিলাভ সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে এই মহৎ শিল্পতত্ত্বটি নিহিত যে দিব্যকবিত্ব আবির্ভাব। তাহার সঙ্গে পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা বা পৌর্বাপর্যের কোনো সম্বন্ধ নাই। বরঞ্চ পাণ্ডিত্যহীনতার শূন্য আধারেই যেন বিশেষ করিয়া এই অমৃত রস অবতীর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথের দিব্যশক্তিলাভ এই জাতীয় আবির্ভাব। এই আবির্ভাবকে চূড়ান্তরূপে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝানো সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত একটু রহস্য থাকিয়া যায়—তাহাই শিল্পের প্রাণ। শৈশবসংগীত এমনকি সন্ধ্যাসংগীত হইতে প্রভাতসংগীতে আসিতে হইলে ওই রকম একটু রহস্যের দুস্তর প্রণালী পার হইয়া আসিতে হয়। কাব্যের ক্রমবিকাশ অনুসরণ করিয়া প্রভাতসংগীতে পৌঁছানো সম্ভব নয়—মাঝখানে একটি বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। দিব্যদৃষ্টিলাভের বিপ্লব।

খাদ্য পাকস্থলীতে গিয়া শর্করাবস্তুতে পরিণত হয়। অভিজ্ঞতা কবিচিত্তে প্রবেশ করিয়া ছন্দে পরিণত হয়। জড়জগতের চরম বিশ্লেষণে যেমন কতকগুলি অবর্ণনীয় তরঙ্গ, কাব্যেরও চরম বিশ্লেষণে তেমনি কবির চিৎস্পন্দন—এই চিৎস্পন্দনেরই বাহ্যরূপ ছন্দ। আবার ঝরণার বেগ যেমন গুহাশায়ী অদৃশ্য উপলখণ্ডকে টানিয়া বাহির করিয়া আনে ছন্দের আবেগ তেমনি কবির অজ্ঞাত শব্দ বহন করিয়া বাহির হয়। সংস্কৃত-না-জানা বাংলা-ভাষা-ভোলা মাইকেল কবিতা লিখিবার সময়ে ছন্দ ও ভাষার এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

প্রভাতসংগীতের অভিজ্ঞতা যদি রবীন্দ্রনাথের জীবনে না ঘটিত তাহা হইলেও তিনি মহৎ কবি হইতেন কিন্তু দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন কবি হইতেন কি না সন্দেহ। মাইকেল মহৎ কবি ছিলেন—কিন্তু তাঁহার দিব্যদৃষ্টিলাভ ঘটে নাই। নিপুণ শিল্পজ্ঞান, ভাষা ও ছন্দের অপূর্ব কৌশল, সূক্ষ্মদৃষ্টি, অনুভূতিপ্রবণতা

প্রভৃতি গুণ রবীন্দ্রনাথে এত ছিল যে উচ্চাঙ্গের কাব্যরচনা তাঁহার পক্ষে খুবই সম্ভব ছিল। এই অভিজ্ঞতাহীন রবীন্দ্রনাথ ছবি' ও গান, কড়ি ও কোমল, কল্পনার অধিকাংশ কবিতা, কাহিনীর নাট্যকাব্য অনায়াসে লিখিতে পারিতেন। কিন্তু বসুন্ধরা, মানসসুন্দরী, উৎসর্গ, বলাকা ও পরবর্তী জীবনের অধিকাংশ গান লিখিতে পারিতেন কি বিশেষ সন্দেহের বিষয়। 'সাধারণতঃ যাহাকে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ববোধ' নাম দেওয়া হয়—তাহা তাঁহার ঘটিত না। বিশ্ববোধের প্রথম বাতায়ন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অভিজ্ঞতায় খুলিয়া গিয়াছিল। "ভূ র্ভূবঃ স্বঃ—এই ভূলোক অন্তরীক্ষ, আমি তারি সঙ্গে অখণ্ড।"

সন্ধ্যাসংগীত প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন—

"সন্ধ্যাসংগীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোনো মতে পৌছিতে পারিতেছিল না।

—জীবনস্মৃতি : সন্ধ্যাসংগীত

সেই মিলটির কথাই উপরে কথিত হইয়াছে। বাহির ও অন্তর, চৈতন্য ও বিশ্ব এতদিন পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বিভিন্ন কোঠায় ছিল। সবশুদ্ধ মিলিত হইয়া এক হইয়া কবির কাছে ধরা দেয় নাই। এই সত্যোপলব্ধির অভাবেই কবি যেন 'বিষাদ ও বেদনা' অনুভব করিতেছিলেন। প্রভাতসংগীতের জ্যোতির্ময় প্রভাতে স্বাতন্ত্র্যের রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইয়া সমস্ত এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত বলিয়া কবির চোখে উদ্ঘাটিত হইল। সন্ধ্যাসংগীতে ও প্রভাতসংগীতে ইহাই মূল প্রভেদ।

প্রভাতসংগীতের প্রধান কবিতা—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ও প্রতিধ্বনি। এ দুটির মধ্যে বীজরূপে রবীন্দ্রকাব্যের তত্ত্ব নিহিত। "নির্ঝরের" গতিময় বিশ্ব আর প্রতিধ্বনির ছায়াময় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত বিশ্ব—এ দুইয়ে মিলিয়া রবীন্দ্র-কাব্যের পূর্ণ তত্ত্ব। এই দুটির মিশ্রণেই বলাকার চঞ্চলা ও বলাকা কবিতার উদ্ভব, বলাকার, ফাল্গুনীর গতিতত্ত্বের সৃষ্টি।

ওগো প্রতিধ্বনি,
বুঝি আমি তোরে ভালোবাসি
বুঝি আর কারেও বাসি না।

বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সে কোন গানের ধ্বনি জাগিতেছে! প্রিয়মুখ হইতে, বিশ্বের

সমুদয় সুন্দর সামগ্রী হইতে প্রতিঘাত পাইয়া তাহার প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। কোনো বস্তুকে নয় কিন্তু সেই প্রতিধ্বনিকেই বুঝি আমরা ভালোবাসি... ।

"সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখে প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে।"

এই প্রতিধ্বনি কবিতাটি মহৎ ভাবের ক্ষুদ্র বীজ। সুন্দরের চেয়ে সৌন্দর্যের আকর্ষণ, সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমে পৌঁছিবার আকুতি, দৃশ্যজগতের পরপারবর্তী অসীম অদৃশ্যজগতের অনুভূতি, যে-সব ভাব রবীন্দ্র-কাব্যের প্রাণবস্তু সবগুলিই গুপ্তাকারে এই কবিতায় বর্তমান। এ কবিতাটি রসিকের প্রিয় না হইতে পারে কিন্তু জিজ্ঞাসুর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বাধ্য।

এ দুইখানি কাব্যের রসমূল্য যাহাই হোক, তত্ত্বমূল্যের জন্য ইহাদের গুরুত্ব সমধিক। রবীন্দ্রকাব্যের স্বর্ণসৌধের এ দুইটি কঠিন, শিলাময় সোপান। তাহার বেশি নয়, তাহার কমও নয়।

ছবি ও গান ও কড়ি ও কোমল

সংগীতাখ্য কাব্যদ্বয়ের অনুপ্রেরণার মূলে আছে একটি নবলব্ধ অভিজ্ঞতা, যাহার ফলে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিত হইয়াছিল। এই অভিজ্ঞতা যেন কোনো দূর আকাশ হইতে "বাণীর বিদ্যুৎ দীপ্তি"তে দিব্যদৃষ্টি বহন করিয়া কবির কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ছবি ও গান আর কড়ি ও কোমলের অনুপ্রেরণার মূল অন্যত্র নিহিত। প্রত্যেক কবির মধ্যে যেন দুইটি সত্তা বাস করে, একজন অনুপ্রেরণানির্ভর কবিসত্তা, অপরজন তাহার শিল্পীসত্তা। এখানে শিল্প বলিতে কবির 'ক্রাফটম্যানশিপ', অর্থাৎ অনুপ্রেরণা আর ক্রাফটম্যানশিপ—এই দুইয়ে মিলিয়া শিল্পের পূর্ণ মূর্তি, যাহার ইংরাজি প্রতিশব্দ 'আর্ট'। ছবি ও গান আর কড়ি ও কোমলের মূলে আছে নিছক শিল্পসৃষ্টির তাগিদ। পূর্বোল্লিখিত দুইখানি কাব্যের অনুপ্রেরণা যদি আসে বাহির হইতে, বর্তমান কাব্যদ্বয়ের প্রেরণা জাগিয়াছে

কবির অন্তর হইতেই—কবি-শিল্পীর অন্তর হইতে। শিল্পসৃষ্টির মুখ্য তাগিদ হইতে ইহাদের সৃষ্টি। আর সে শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।

এই সুন্দর ভুবনকে সৃষ্টির প্রয়াস কাব্যদ্বয়ে। শুধু সৌন্দর্যের সৃষ্টি নয়, সুন্দর ভুবনের সৃষ্টি। শুধু সৌন্দর্যের সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয় প্রভাতসংগীতে। "প্রতিধ্বনি"র জগৎ বাস্তবের পরপারবর্তী জগৎ, তাহা সুন্দর কিন্তু সে সৌন্দর্য নির্গুণ। সে সৌন্দর্য জগতে নাই, কবির অন্তরে আছে; কবির অন্তর হইতে বাহিরে তাহার প্রতিফলন হইতেছে। পরবর্তী কাব্যের সৌন্দর্য সুন্দর ভুবনে নিত্যজাগ্রৎ গুণ; বাহির হইতে সেই সৌন্দর্য কবির চিত্তে গিয়া পড়িতেছে। বহির্জগৎমুখী শিল্পীর বাহিরের দিকে তাকাইবার, বাহিরকে উপভোগ করিবার, বাহিরকে অঙ্কিত করিবার প্রথম প্রয়াস ছবি ও গানে আর কড়ি ও কোমলে।

সংগীতাখ্য কাব্যের নূতন অভিজ্ঞতার ধাক্কা কবিকে নূতন ছন্দ ও ভাষা সৃষ্টির দিকে লইয়া গিয়াছে। কাজেই প্রভাতসংগীতের ছন্দ ও ভাষায় অভিনবত্ব আছে, পূর্বতনত্ব নাই। বর্তমান দুই কাব্যে পুরাতন বহির্জগতের দিকে দৃষ্টিপাতের ফলে, এবং 'মানবের মাঝে' বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষায়, মানবের জগৎকে অঙ্কিত করিবার ইচ্ছায়, তাহার ছন্দ ও ভাষা অনেক পরিমাণে convention বা পূর্বতনত্ব ধারণ করিয়াছে, কারণ সর্বজনের অভিজ্ঞতা কেবল সর্বজনগ্রাহ্য ভাষাতেই প্রকাশ সম্ভব। পূর্ববর্তী কাব্যে ছিল মুখ্যতঃ স্বকীয় জগৎ-ভাব প্রকাশের ইচ্ছা, এবারে মুখ্যতঃ পরকীয় জগৎ-ভাব প্রকাশ। ইহার জন্য পূর্বতনতাকে স্বীকার প্রয়োজন। এই স্বীকৃতির ফলে কড়ি ও কোমলে সনেটের সৃষ্টি। যতদূর মনে পড়িতেছে ইহাই তাঁহার প্রথম সনেট রচনা। আর এই সনেটগুচ্ছই কড়ি ও কোমলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

এই সনেটগুচ্ছের অধিকাংশের উপজীব্য নারীদেহের সৌন্দর্য। "প্রতিধ্বনি"র জগৎ হইতে এ জগৎ কত দূরবর্তী। সেখানে যেন সৌন্দর্য চোখে পড়িয়াও পড়ে নাই, কিম্বা প্রত্যক্ষ সুন্দরে তৃপ্ত ছিল না বলিয়াই পরোক্ষ সৌন্দর্যের জন্য কবির এত আকাঙ্ক্ষা ছিল। এখানে প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যই যথেষ্ট।[১]

১ এক সময়ে অনেকে এই কবিতাগুলিকে অশ্লীল মনে করিতেন। কিন্তু বস্তুতঃ এ কবিতাগুলি অতি শ্লীল, অর্থাৎ অসহায়ভাবে শ্লীলতার অঁাচল চাপিয়া ধরিয়া রাখিবার একটা প্রয়াস যেন আছে। আরও দু-চার পা অগ্রসর হইলে শিল্প বা শ্লীলতা কিছুই ক্ষুণ্ণ হইত না।

প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যের এমন বাস্তব সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ 'কল্পনা'র আগে আর করেন নাই, পরেও কদাচিৎ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষটাই তখন যেন তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিতেছিল, এ যেন 'প্রতিধ্বনি'র বিপরীত 'ধ্বনি'র একটা জগৎ। সে জগৎ চিরদিনই তাঁহার চোখের সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছিল, সমাগত শুভ মুহূর্তে তাহার দিকে চোখ পড়িতেই, দুজনে চোখাচোখি হইয়া গেল—প্রত্যক্ষ জগৎ যে কত সুন্দর কবি তাহা দেখিতে পাইলেন।

"আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।...কড়ি ও কোমল মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্রজীবনের এই আত্মনিবেদন।"

—জীবনস্মৃতি : বর্ষা ও শরৎ

জগৎটা সুন্দর অর্থাৎ সত্য মনে হইলে স্বভাবতই তাহার ছবি আঁকিতে ইচ্ছা জাগে। ছবি ও গান সেই ছবি আঁকিবার ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু নয়। তাহার শিল্পমূল্য যাহাই হোক, এই ইচ্ছাটার মূল্য কম নয়, কিম্বা এই ইচ্ছার ইতিহাসই তাহার প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়।

"নানা জিনিসকে দেখিবার যে-দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।... তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রং দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে-উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ।"

—জীবনস্মৃতি : ছবি ও গান

কবি বলিয়াছেন, ছোট ছেলে রঙের বাক্স উপহার পাইলে যেমন যথেষ্ট রঙ ছড়াইয়া ছবি আঁকিতে চেষ্টা করে—"সেদিন নবযৌবনের নানান্ রঙের বাক্সটা নূতন পাইয়া" তাঁহার সেই দশা হইয়াছিল।

ঝিকিমিকি বেলা;
গাছের ছায়া কাঁপে জলে,
সোনার কিরণ করে খেলা।

ছুটিতে দোলার 'পরে দোলে রে,
দেখে রবির আঁখি ভোলে রে।

কিম্বা—

একটি মেয়ে একেলা,
সাঁঝের বেলা,
মাঠ দিয়ে চলেছে,
চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে।

কিম্বা—

ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা
ঘাসের 'পরে, সাঁঝের বেলা।"

—এ সব আর কিছুই নয়, নিজের ভালোলাগাকে রেখার বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়াস। কিন্তু হাত তখনো নিপুণতা লাভ করে নাই, রঙে রেখায় মিশিয়া ঝাপসা হইয়া গিয়াছে—কেবল ভালোলাগাটুকু বুঝিতে পারা যায়, তার বেশি সব অস্পষ্ট।

এ যেমন গেল ছবিতে ভালোলাগাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা, তেমনি আবার আছে সুরে ভালোলাগাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা।

আমার প্রাণের 'পরে চ'লে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মত।
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শতশত।

কিম্বা—

যাই, যাই, ডুবে যাই,
আরো, আরো, ডুবে যাই
বিহ্বল, অবশ অচেতন,
কোন্ খানে, কোন্ দূরে,
নিশীথের কোন্ মাঝে
কোথা হয়ে যাই নিমগন।

—এ সব সুরের দ্বারা জগৎসৃষ্টির প্রয়াস। পরবর্তী রবীন্দ্রকাব্যে 'ছবি'ও 'গানে'র দুটি রীতিই পরিণতি লাভ করিয়াছে—এখানে তাহার সূচনা মাত্র।

দূর হইতে জগৎ দেখিয়া ছবি আঁকিবার চেষ্টা ইহার প্রধান তাগিদ বলিয়া 'ছবি ও গানে' কেমন যেন একটা নির্লিপ্ত ভাব আছে, প্রভাতসংগীতে যাহা ছিল না।

'ছবি ও গান' আর 'কড়ি ও কোমল' দুই কাব্যই কবির পরীক্ষা পর্বের কাব্য। কড়ি ও কোমলে নানা শ্রেণীর কবিতা আছে। গান, সনেট, শিশু-কবিতা, অনুবাদ ও পরীক্ষামূলক কবিতা। গান ও সনেটগুলিই কড়ি ও কোমলের প্রধান সম্পদ।

বাঁশরী বাজাতে চাহি, কখন্ বসন্ত গেল, ওগো শোনো কে বাজায়, আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন, ওগো এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াষা, হেলা ফেলা সারা বেলা, আজি শরত তপনে, বিদায় করেছ যারে, তুমি কোন্ কাননের ফুল, কে যায় বাঁশরী বাজায়ে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গান কড়ি ও কোমলের অন্তর্গত। এই গানগুলি পড়িলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ছবি ও গানের পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ শিশুবিষয়ক কবিতাগুলি পরিণত বয়সে লিখিত। অল্প বয়সে শিশুকবিতা রচনা সম্ভব নয়। কিন্তু বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর আর সাতভাই চম্পা নামে দুটি ছড়া এই সময়ে রচিত। এ দুটি তাঁহার শিশু-কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ছবি ও গানের যুগ্ম উপাদানে ছড়া রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের দুটিই আয়ত্ত বলিয়া ছড়া রচনায় তাঁহার দক্ষতা আছে। মহৎ কবি হইলেই যে ভালো ছড়া লিখিতে পারে এমন নয়—ছড়া লিখিবার জন্যে বিশেষ এক প্রকার শক্তি আবশ্যক, মহৎ কবিত্বের সঙ্গে যাহার স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই।

কড়ি ও কোমলে "পুরাতন" ও "নূতন" নামে দুটি কবিতা আছে। এ দুটি যুগ্মক কবিতা বলা চলে। এই জাতীয় যুগ্মক কবিতা লিখিবার অভ্যাস গোড়া হইতে সুরু করিয়া শেষ পর্যন্ত ছিল। সন্ধ্যাসংগীতের "গান আরম্ভ" ও "গান সমাপন", "পরাজয় সংগীত" ও "সংগ্রাম সংগীত"; প্রভাত সংগীতের "অনন্ত জীবন" ও "অনন্ত মরণ" প্রভৃতি যুগ্মক কবিতা। রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা এই জাতীয় আরো অনেক যুগ্মকের নাম স্মরণ করিতে পারিবেন। যুগ্মক লিখিবার মূলে আছে বস্তুর সমগ্র রূপ দেখিবার প্রয়াস। পুরাতন একদেশ মাত্র, কাজেই তাহার সঙ্গে নূতনকে যোগ করিয়া সম্পূর্ণ

করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। এ অনেকটা পুতুলটাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিবার মতো আর কি! জীবনের সমগ্রতার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিক, বলিয়াই যুগ্মক কবিতা তাঁহার কাব্যে অবিরল।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রবীন্দ্রকাব্যের উপেক্ষিতা। এই কিশোরী তন্বী কিশোরী রাধিকার মতোই মথুরার রাজপুরীর সিংহদ্বারের প্রান্তে অবজ্ঞাত ভাবে বসিয়া আছে, রবীন্দ্রকাব্যের মণিময় প্রাসাদে কত লোকেই না প্রবেশ করিতেছে, কেহই ভালো করিয়া তাহার দিকে তাকায় না। আর ভালো করিয়া তাকায় না বলিয়াই এই তন্বীর সৌন্দর্য তাহাদের চোখে পড়ে না। স্বয়ং কবিরও ইহার প্রতি সুনজর নহে। অধিকাংশ পাঠকেই কবির দৃষ্টির সাক্ষ্য অনুসরণ করিয়া ইহাকে অনুকম্পা মাত্র করিয়া প্রস্থান করে। কিন্তু প্রেমের দৃষ্টি ছাড়া সৌন্দর্যের কখনো আত্মপ্রকাশ হয়?

রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সের একদা 'মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে' 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে' শ্লোকটি লিখিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। আজও সেই শ্লোকটি পড়িলে পাঠকের মনে মেঘমেদুর মধ্যাহ্নের মায়া ঘনাইয়া আসে; তাহার মানসের রসদর্পণের কিনারা ঘিরিয়া যে কালো কোমল আভা দেখা দেয় রাধিকার নীলাম্বরীর পাড় ছাড়া আর কোথায় তাহার উপমা। নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টি যদি কাব্যের লক্ষ্য হয় তবে ভানুসিংহের পদাবলী উচ্চাঙ্গের কাব্য। রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্য ব্যতীত ইহার দোসর পাওয়া দুষ্কর। তবে প্রভেদ এই: 'কল্পনা'র অনুপ্রেরণার মূলে কালিদাসের জগৎ, ইহার অনুপ্রেরণার মূলে বৈষ্ণবকবিদের জগৎ। 'কল্পনা'র জগৎ প্রসরতর; নন্দনের বনান্ত হইতে উজ্জয়িনীর প্রান্ত অবধি তাহার অধিকার; মদন সনাথ রতি হইতে নিপুণিকা মালবিকা বিচিত্র তাহার অধিবাসী; পৌরাণিক কাল ও ঐতিহাসিক কাল এখানে মিলিয়া গিয়া রোমান্সের অভিনব কালের যুক্তবেণীর সৃষ্টি করিয়াছে। 'ভানুসিংহের' জগৎ সংকীর্ণ, রাধা তাহার একমাত্র অধিবাসী; এখানে 'শতেকযুগের কবি দলে মিলি আকাশে' শতকণ্ঠের ধ্বনি নাই, কেবল—

গহন কুসুম পুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে।

সে ধ্বনি নিতান্ত মৃদুল, পূর্বরাগসাধনসম্পন্না রাধার প্রেমের মতোই ক্ষীণ এবং করুণ বলিয়া বহুকাব্যপ্রণয়ভাগী অভিজ্ঞ পাঠকের কানে প্রবেশ করিতে চায় না, কানে যদি বা প্রবেশ করে মরমে প্রবেশ করিয়া প্রাণ মন আকুল করিয়া তোলে না।

রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে চণ্ডীদাসের কবিতাকে বিরহিনী রাধা ও বিদ্যাপতির কবিতাকে প্রসাধনচতুরা কিশোরী রাধার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বাস্তবিক বিদ্যাপতির রাধার ন্যায় বিদ্যাপতির শিল্প বহুঅলংকারবিভূষিতা, বচনবৈভবা এবং পাঠকের নয়ন মন কাড়িবার উদ্দেশ্যে প্রসাধনের দুরূহ চাতুর্যে একান্ত নিপুণা। বিদ্যাপতির অদ্ভুতন শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস চণ্ডীদাসে নাই। চণ্ডীদাসের 'গান ছেড়েছে আজ সকল অলংকার'—হয়তো কোনো কালেই সে অলংকার পরে নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যদি একই চণ্ডীদাসের হয় তবে তাহাতে অলংকার আছে বটে। কিন্তু প্রচলিত চণ্ডীদাসী পদে অলংকারের নামমাত্র নাই। কিশোর রবীন্দ্রনাথকে চণ্ডীদাসের পরিণত শিল্প আকর্ষণ না করিয়া যে বিদ্যাপতির অলংকারময়ী পদাবলী আকর্ষণ করিবে—ইহা খুবই স্বাভাবিক। তিনি বিদ্যাপতির শিল্পরীতি, বিদ্যাপতির ভাষা অবধি গ্রহণ করিয়াছেন। শিল্পের প্রসাধনকলা অতিক্রম করিয়া বিদ্যাপতির কবিতায় মাঝে মাঝে তাঁহার চিত্তের সাধন বেগ ধ্বনিত হইয়া ওঠে—লাখো লাখো যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু। এই সাধন বেগ 'ভানুসিংহে' আশা করা নিষ্ফল। কিন্তু শিল্পকলার বিচারে ভানুসিংহ বিদ্যাপতির সমকক্ষতা লাভ করিয়াছেন—বিদ্যাপতি ইহার চেয়ে বেশি কি আর করিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে।"

—জীবনস্মৃতি: ভানুসিংহের কবিতা

এই মেকি সাধনার অভাব। কিন্তু সাধনা কবিতা নহে, কবিতা শিল্প; শিল্পাঙ্গে ভানুসিংহের মধ্যে আদৌ মেকি নাই।

শুধু তাই নয়, কবির প্রায় একই বয়সে লিখিত অন্যান্য কবিতা বা কাব্যের সঙ্গে 'ভানুসিংহের' প্রভেদ এই যে, পদাবলী পূর্ণাঙ্গ, সে নিজের গৌরবেই

দাঁড়াইতে পারে, দাঁড়াইয়া আছে। প্রভাতসংগীত ও ছবি ও গান কবির পরিণত কাব্যকে ঠেস দিয়া দণ্ডায়মান, পরবর্ত্তীদের সাহায্য ছাড়া কোনো পাঠক, তাহাদিগকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করিবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু ভানুসিংহের পক্ষে পরপ্রত্যাশা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, সে আপনাতে আপনি বিধৃত ও সম্পূর্ণ। সমুদ্রের নাবিক পশ্চিম দিগন্তের ধার ঘেঁষিয়া সূর্যাস্তের সমারোহে ঐশ্বর্যময় যে সুদূর দ্বীপখণ্ড দেখিতে পায়, যাহার 'শ্যামল' তালীবন ও সুনীল গিরিরেখার আভাস অপার্থিব সৌন্দর্যে আভাময়, চকিতের মধ্যে যে দ্বীপ একবার মাত্র আভাসিত হইয়া তরণীর গতিপথের আয়ত্তের বাহিরে অন্ধকারের মধ্যে আবার নিলীন লইয়া যায়—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী সেই দ্বীপটি। তাহার সৌন্দর্য রাধার কাছে 'নিকরুণ মাধবের' মতো ; তাহাকে ধরাও যায় না, ভোলাও যায় না, কেবল যখন 'উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত', পথতরু শাঁকল যখন লুন্ঠিত, আর শ্রাবণরাত্রির অভিসারিকার সিক্ত কেশদামের মতো নীরদপুঞ্জ যখন ধারাবর্ষী তখন কানু যে

দরুণ বাঁশী কাহে বজায়ত,
সকরুণ রাধা নাম

তাহা বুঝিতে পারিবার আগেই নিজের অজ্ঞাতসারে কখন্ যে অকারণ আকর্ষণের বেগে সমস্ত চিত্তকে উতলা করিয়া তোলে। ইহা উচ্চাঙ্গের কবিতা না হয় তবে কবিতা আর কি ?

তবে এক জায়গায় বৈষ্ণবকবিদের উপরে ভানুসিংহের জিৎ।

মরণ রে
তুঁহু মম শ্যাম সমান।

এ কবিতা কোনো বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস লিখিতে পারিতেন না। আইডিয়ার সরলতা ও সগুণ প্রকাশ প্রাচীন কবিতার লক্ষণ। কিন্তু এই কবিতাটিতে ভাবের যে জটিলতা, সূক্ষ্মতা ও অপ্রত্যাশিত মোড় ঘুরিবার চেষ্টা আছে তাহা আধুনিকমনবিশিষ্ট কবি ছাড়া আর কাহারো পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। ভাবের এই নির্গুণমুখিতাও আধুনিক মনের এবং বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের মনের লক্ষণ। এই কবিতাটি পরবর্তী প্রসিদ্ধ 'ওগো মরণ হে মোর মরণে'র অঙ্কুর বহন করিতেছে। প্রভেদ যেটুকু তাহা শিল্পের পরিণতিতে এবং প্রতীকের পরিবর্তনে। 'শ্যাম' হইয়াছে 'মহাদেব' ; নির্গুণ ক্রমে অধিকতর নির্গুণ

হইয়া উঠিতেছে। কারণ ইতিমধ্যে কবির জীবনে ও শিল্পে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। সে আলোচনার ক্ষেত্র বর্তমান প্রসঙ্গ নয়—অন্যত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

মানসী

মানসী রবীন্দ্রনাথের পরিণত শক্তির কাব্য কিন্তু তাঁহার বিশিষ্ট শক্তির কাব্য নহে। রবীন্দ্রনাথের বীণা বহুতার, তাহার নানা তারে নানা সুরের সংগীত ঝংকৃত হইয়াছে। কিন্তু সব সংগীত তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভাজাত নহে। এই বিশিষ্ট কবিপন্থায় তিনি নিশ্চিতরূপে সোনার তরী কাব্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু ইহার সূচনা সন্ধ্যাসংগীত হইতে। সন্ধ্যাসংগীত হইতে মানসী পর্যন্ত ছয়খানি কাব্যগ্রন্থে একটি পরীক্ষামূলকতার ভাব আছে। সে পরীক্ষা তাঁহার বিশিষ্ট শক্তির স্বরূপ-অন্বেষণে। এক দিকে সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত; আবার এক দিকে ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল। আর মানসীতে এই দুই কাব্যরীতির যুক্তবেণী গ্রথিত হইয়াছে। এখন এই দুটি কাব্যরীতি কি? কবির একখানি কাব্যের নামের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে পারা যায়। ছবি ও গান। তাঁহার কাব্য চিত্ররীতি অবলম্বন করিবে না সংগীতরীতি অবলম্বন করিবে নিজের অগোচরে কবি যেন তাহারই পরীক্ষা করিতেছিলেন। সংগীতাখ্য কাব্যদ্বয়ে সংগীতরীতির পরীক্ষা; ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমলে প্রধানতঃ চিত্ররীতিব পরীক্ষা। মানসীতে এই দুই রীতিই আছে। সোনার তরীকে যে তাঁহার বিশিষ্ট রীতির কাব্য বলিয়াছি, তাহার কারণ এই কাব্য হইতে চিত্ররীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। একেবারে হইয়াছে এমন নয়; কল্পনা কাব্য প্রধানতঃ চিত্ররীতির কাব্য, মহুয়া কাব্যেও চিত্ররীতির কবিতা আছে। কিন্তু তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম রূপেই থাকিয়া নিয়মের অলঙ্ঘনীয়তা যেন প্রমাণ করিতেছে।

এইজন্যই মানসীতে পরিণত শক্তির কবিতা থাকা সত্ত্বেও ইহা রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষাপর্বের শেষ কাব্য। পরীক্ষোত্তীর্ণ পর্বের আদি কাব্য নহে। মানসীতে

আসিয়া একটা পথের শেষ; সোনার তরীতে আর-একটা স্রোতের আরম্ভ, যে স্রোত দীর্ঘজীবনের অভাবনীয় বঙ্কিমতার মধ্যে দিয়া রবীন্দ্রকাব্যের সমুদ্রসংগম পর্যন্ত প্রবাহিত।

কাব্যে চিত্ররীতি ও সংগীতরীতি বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহার বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবিপ্রতিভা বস্তুর রূপকে ধরিবার প্রতিভা নয়; বস্তুর স্বরূপকে ধরিবার প্রতিভা। সেইজন্য যাহা কিছু একান্তভাবে স্থানিক, কালিক ও ব্যক্তিক তাহার চেয়ে সর্বস্থানিক, সর্বকালিক ও সর্বব্যক্তিক তাঁহাকে বেশি আকর্ষণ করে। এটাকেই বলা চলে বস্তুর স্বরূপ। বস্তুরূপে পৌঁছিবার উপায় চিত্র; আর বস্তুস্বরূপে পৌঁছিবার উপায় সংগীত; সেইজন্য সংগীতকেই তিনি তাঁহার বিশিষ্ট বাহন করিয়া লইয়াছেন। সংগীত নিজে অশরীরী বলিয়া অশরীরী স্বরূপকে প্রকাশ করিতে সক্ষম।

মানসীতে চিত্ররীতি ও সংগীতরীতির কবিতা আছে। তাহার প্রারম্ভে চিত্র-রীতি, পরিণামে সংগীতরীতি। তাহার এক কোটিতে মেঘদূত, অন্য কোটিতে সুরদাসের প্রার্থনা। মাঝখানে নানা বিচিত্র পর্যায়ের কাব্য আছে, বিশেষ বিশেষ কারণে সেগুলিও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের অনুসরণে এই দুই রীতির কাব্যের যেমন গুরুত্ব এমন আর কোনো পর্যায়ের নহে।

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের অনুবাদ করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক—কিন্তু তাহার সার্থক অনুবাদ সম্ভব নয়। সন্ধিসমাস স্বরব্যঞ্জনের গুরুলঘুতার প্রতি উদাসীন বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ একপ্রকার অসম্ভব। কালিদাসের মেঘদূতের বাংলা ভাষায় সার্থকতমরূপ মানসীর মেঘদূত কবিতা। ইহা অনুবাদও নয়, আবার মৌলিকও নয়, ইহাকে মৌলিক অনুবাদ বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কলম ধরিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হাতকে পরিচালিত করিতেছেন অন্য একজন, এমনি এক অসম্ভব প্রক্রিয়ায় এই আশ্চর্য কবিতাটির সৃষ্টি। এই কবিতাসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের মন এবং আধুনিক মন; কিন্তু ইহার কাব্যরীতিটি কালিদাসীয়। কালিদাসের কাব্যরীতি বস্তুরূপকে ধরিতে সচেষ্ট, বস্তুরূপের ভিতর দিয়াই তিনি বস্তুস্বরূপকে ফুটাইয়া তুলেন, যেমন বস্তুস্বরূপের ভিতর দিয়া বস্তুরূপকে ফুটাইতে রবীন্দ্রনাথ অভ্যস্ত। বস্তুরূপে পৌঁছিবার মাধ্যম ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের সেরা চোখ। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই মেঘদূত ইন্দ্রিয়নির্ভর, ইন্দ্রিয়বিলাসী কবির কাব্য: চোখ দেখিয়াছে, তুলি আঁকিয়াছে, ছবির পরে ছবি ফুটিয়া

াছে, সে ছবির রং কবির ভালোমন্দ লাগা দিয়া গুলিয়া লওয়া। বিধাতা যেমন জগৎ সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন,—এই দিলাম, দেখো এবং দেখিয়া ইহার রসরূপে গিয়া পৌছিতে চেষ্টা করো। কাব্যে চিত্ররীতি অনেকটা সেইরকম। কবি বিধাতার জগতের সমান্তরাল আর-একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া বলেন—এই সৃষ্টি করিলাম, ইহাকে ভোগ করার দ্বারা ইহার রসরূপ উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করো। কবি ও বিধাতা উভয়েই সাঙ্খ্যের পুরুষের মতো নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষ এবং নির্বিকার। আর সংগীতরীতির কবি সাঙ্খ্যের প্রকৃতির মতো সক্রিয়, পাঠকাপেক্ষী এবং চঞ্চল। তিনি সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত নহেন; সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্য না বুঝাইয়া দেওয়া পর্যন্ত তাঁহার শান্তি নাই। তিনি যেন বলেন—আমি বাঁশির সুরে বস্তুর রূপ উদ্ঘাটন করিতে করিতে স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতেছি, তুমি আমাকে অনুসরণ করিয়া প্রবেশ করো। তোমাকে বাহির দরজায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া আমার চিন্তা মেটে না, তুমি না বোঝা পর্যন্ত আমার সৃষ্টির সার্থকতা নাই। এইজন্যই মানসীর মেঘদূতের শেষে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়া যাহা বলিয়াছেন—কালিদাস তাহা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্র-নয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানস সরসী-তীরে বিরহ-শয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে।

কালিদাস এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন বুঝেন নাই; রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাখ্যা না দিয়া কবিতাটি শেষ করিতে পারেন নাই। এ কয়টি ছত্র লিখিবার সময়ে কালিদাস রবীন্দ্রনাথের হাত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এতক্ষণ বস্তুরূপের সৃষ্টি চলিতেছিল, এই কয়টি ছত্রে বস্তুস্বরূপের উদ্ঘাটন। কবিতাটির চরম লগ্নে চিত্ররীতি পরিত্যাগ করিয়া কবি সংগীতরীতি অবলম্বন করিয়া সুরের সিঁদকাঠি দিয়া একেবারে জগতের প্রেমরহস্যের অন্তর্লোকে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই কাব্যে সংগীতরীতি। মেঘদূত কাব্যে দুইটি রীতিরই পরিচয় পাওয়া গেল।

ইহার বিপরীত কোটির কবিতা সুরদাসের প্রার্থনা। ইহা সংগীতরীতির কাব্য। সুরদাস অন্ধ এবং গায়ক। কালিদাস চক্ষুষ্মান কবি। কাব্য-অমরার তিনি সহস্র চক্ষু। কালিদাস ও সুরদাসকে কাব্যের বিষয়ীভূত করিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজের অগোচরেই যেন এই দুই রীতির আভাস দিয়া রাখিয়াছেন। মানসীর কবিতাগুলি নূতন করিয়া সাজাইবার অধিকার পাইলে প্রারম্ভে মেঘদূত ও প্রান্তে সুরদাসের প্রার্থনা বিন্যাস করিয়া চিত্ররীতি ও সংগীতরীতির মর্ম পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতাম।

সুরদাস দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে যে, একদা আমি তোমাকে চোখের দৃষ্টিতে দেখিয়া তোমার বিলাসের মূর্তি দেখিয়াছি, সে আমারই অপরাধ। এবার আমি চোখের দৃষ্টি ঘুচাইয়া দিয়া তোমাকে দেখিতে চাই, এখন কেমন করিয়া তোমার নির্মল মূর্তি ঢাকিয়া রাখিবে? এই দেবী কে? সুরদাস যেখানে প্রেমিক সেখানে এই দেবী নিশ্চয় তাহার প্রেমের আশ্রয়। সুরদাস যেখানে কবি এই দেবী তাহার সরস্বতী। এই কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-জীবনের কোন্ ইতিহাস লুক্কায়িত আছে তাহা উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টা বৃথা—কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের যে মানসিক ও শিল্প ইতিহাস অবগুণ্ঠিত আছে তাহার মূল্য সামান্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই দেবী তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী বা সরস্বতী, এই দেবী তাঁহার জগৎ-মূর্তি, চোখের দৃষ্টিতে যাঁহার রূপ মাত্র তিনি দেখিয়াছিলেন, এবারে ইন্দ্রিয়াতীত দৃষ্টিতে তাঁহার স্বরূপ দেখিতে তিনি উদ্‌গ্রীব। এই দেবী এতদিন চিত্ররীতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এবার সংগীত-রীতিতে তিনি কবির কাছে আত্মপ্রকাশ করুন। কবির শিল্প চিত্ররীতি পরিত্যাগ করিয়া সংগীতরীতিতে সংক্রামণ করিতেছে—সুরদাসের প্রার্থনা তাহার পাতকীস্থান।

জান কি আমি এ পাপ-আঁখি মেলি
তোমারে দেখেছি চেয়ে,
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা
ওই মুখপানে ধেয়ে,

এবারে—

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাতরশ্মিসম;

লও, বিঁধে দাও বাসনা-সঘন
এ কালো নয়ন মম।

সুরদাস বলিতেছে কেবল দেবীমূর্তি নয়, এই বিশ্বভুবনের সৌন্দর্যও চোখের দৃষ্টিতে মাত্র ধরা দিয়াছে—কিন্তু ইহাতে তৃপ্তি কই? বিশ্বভুবনের সৌন্দর্যমাত্র নয়, সৌন্দর্যস্বরূপ না দেখা অবধি শান্তি নাই।

ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমারি মূর্তি
পশেছে জীবন-মূলে,
এই ছুরি দিয়ে সে মূরতিখানি
কেটে কেটে লও তুলে।
তারি সাথে হায় আঁধারে মিশাবে
নিখিলের শোভা যত,
লক্ষ্মী যাবেন, তারি সাথে যাবে
জগৎ ছায়ার মতো।
যাক্, তাই যাক্! পারি নে ভাসিতে
কেবল মুরতিস্রোতে,
লহ মোরে তুলি আলোকমগন
মুরতি-ভুবন হতে।

কিন্তু চোখের আলো গেলে যে-অন্ধকার ঘিরিয়া আসিবে তাহা কি একান্তই অন্ধকার? সেই অন্ধকারের পটে কি কোনো নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই? তখন—

শান্তিরূপিণী এ মুরতি তব
অতি অপূর্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্ত নিশি-মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ
আপনি সৃজিত হবে।...
সে নব জগতে কালস্রোত নাই,
পরিবর্তন নাহি,
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে
চিরদিন রবে চাহি।

সুরদাসের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়াতীত সে জগৎ ইন্দ্রিয়গত জগতের চেয়ে সত্যতর—কারণ তাহা বস্তুস্বরূপের জগৎ। এখন এ দুটা জগতের মধ্যে কোনটা সত্যতর সে তত্ত্ববিচার নিষ্ফল, দুই জাতীয় কবি-মনের কাছে দুই জগৎ সত্য, কাজেই কাব্যজগতে দুটাই সমান সত্য। এক্ষেত্রে যাহা উল্লেখযোগ্য তাঁহা এই যে, মেঘদূত কবিতা ও সুরদাসের প্রার্থনা দুই স্বতন্ত্র কবি-মনের সৃষ্টি, একই কবির মধ্যে যে দুই মন প্রাধান্যলাভের জন্য সচেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টি ও শিল্প-দৃষ্টি যেন ধীরে ধীরে এক রাশি হইতে আর-এক রাশিতে সঞ্চারিত হইতেছে এবং এই সঞ্চারের ফলে কবির দৃষ্টিতে মানব ও জগতের মূর্তি বদল হইতেছে; কায়াময় জগৎ ছায়াময় হইতেছে; ছায়াময় বলিয়া অলীক মনে করিবার কারণ নাই, দান্তে যে ছায়াময় জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহা কোন্ কায়ার চেয়ে অসত্য?

তাহা হইলে দেখা গেল মানসী বস্তুরূপ হইতে বস্তুস্বরূপে, কায়াময় সত্য হইতে ছায়াময় সত্যে, কালিদাসীয় মানস হইতে সুরদাসীয় মানসে অর্থাৎ চিত্ররীতি হইতে সংগীতরীতিতে সংক্রমণের কাব্য। এখন এই পরিবর্তন মানব ও প্রকৃতির দৃষ্টিতে লক্ষিত হইবে। রবীন্দ্রনাথ বহু প্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই যেন প্রেমিকের চেয়ে প্রেমের প্রতি লিখিত। সগুণ প্রেমিকের চেয়ে নির্গুণ প্রেমের প্রতিই তাঁর যেন আকর্ষণ প্রধানতর। কিন্তু প্রেমিকের প্রতি যে কবিতা নাই এমন নয়, তবে তাহার অধিকাংশই মানসীতে; মানসীর আগেও আছে, পরে অতি অল্পই; বেশি সংখ্যক প্রেমিকের প্রতি কবিতা পূরবীর আগে আর দৃষ্ট হয় না। সে একেবারে জীবনের শেষে সগুণ প্রণয়িনী নির্গুণ প্রেম হইয়া উঠিল—এ সেই বস্তুরূপ হইতে বস্তুস্বরূপে যাইবার ফল। কায়াময়ের ছায়াময়ী ভবন। ভুলে, ভুল-ভাঙা, ক্ষণিক মিলন, শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, সংশয়ের আবেগ, বিচ্ছেদের শান্তি, তবু, আকাঙ্ক্ষা, মানসিক অভিসার, অপেক্ষা, বর্ষার দিনে প্রভৃতি কবিতার জন্ম-ইতিহাস নিপুণ হস্তে মুছিয়া দিলেও বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, ইহাদের জন্মলগ্নে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি কবির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিল। ঠিক এই শ্রেণীর বিশিষ্টব্যক্তি-অনুপ্রাণিত কবিতা পূরবীতে পৌছিবার আগে কচিৎ মিলিবে। ইহা প্রেমের বস্তুরূপের 'কবিতা'। আবার বিপরীত কোটির অর্থাৎ প্রেমের বস্তুস্বরূপের কবিতাও আছে—যথাসময়ে তাহাদের আলোচনা করা যাইবে।

এ যেমন মানুষ সম্বন্ধে গেল তেমনি প্রকৃতি সম্বন্ধেও সমান পরিবর্তন লক্ষ্য করিবার যোগ্য। প্রকৃতির প্রতি গভীর আকর্ষণ লইয়াই রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছিলেন: কাজেই তাঁহার কাব্যে আদিম পর্ব হইতে প্রকৃতির প্রতি প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রীতি এক কথা, পরিচয় আর-এক কথা। প্রকৃতির বিশিষ্ট মূর্তির সঙ্গে কবির পরিচয় পরবর্তী কালে ঘটিয়াছে, সে এই মানসী কাব্যের কাল। মানসী কাব্যে আসিয়া রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম প্রকৃতির স্থানিক মূর্তির পরিচয় মেলে। ইহার পূর্বে যে প্রাকৃতিক চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা প্রীতি-জাত বটে, কিন্তু তেমন করিয়া অভিজ্ঞতাজাত নহে।* আবার মানসীর পরে অজস্র প্রকৃতিচিত্র তাঁহার কলমে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেগুলি মূলতঃ মানসীর চিত্র হইতে ভিন্ন। এই প্রভেদটা কিসের? ইহা বস্তুরূপ হইতে বস্তুস্বরূপের ভেদ। সেইজন্যই মানসীর স্থানিক চিত্র পরবর্তী কাব্যে সর্বস্থানিক হইয়া উঠিয়াছে।

ছায়া মেলি সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন চারি
সিসুগাছ পাণ্ডু-কিশলয়,
নিম্ববৃক্ষ ঘন শাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা;
আম্রবন তাম্রফলময়।...
বসি আঙিনার কোণে গম ভাঙে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি;
বাঁধা কূপ, তরুতল; বালিকা তুলিছে জল,
খরতাপে ম্লান মুখখানি।

এই শ্রেণীর স্থানিক লক্ষণযুক্ত চিত্র মানসীর পরে বিরল; এই জাতীয় স্থানিক চিত্র গদ্য-কবিতায় পৌঁছিবার আগে আর বেশি মিলিবে না; সে তো কবির শেষ জীবনের কথা। কি মানুষ, কি প্রকৃতি দুই বিষয়েই রবীন্দ্রনাথ চিত্ররীতি ত্যাগ করিয়া সংগীতরীতির পথের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এখন মেঘদূত ও সুরদাসের প্রার্থনাকে দুই কোটি বলিয়া স্বীকার করিলে অনেকগুলি কবিতা স্বতঃই বিভক্ত হইয়া দুই কোটি প্রান্তে গিয়া পড়ে। এবারে যে সব কবিতার উল্লেখ করিব, সেগুলি 'সুরদাসের প্রার্থনা'র সগোত্র এবং বস্তুস্বরূপের বা সংগীতরীতির অন্তর্গত কবিতা। নিষ্ফল কামনা, একাল ও সেকাল,

* অচলিত সংগ্রহের কোনো কোনো কাব্যে হিমালয়ের বর্ণনায় অভিজ্ঞতার প্রমাণ আছে।

মরণ-স্বপ্ন, ধ্যান, মেঘের খেলা, নিষ্ফল প্রয়াস, হৃদয়ের ধন, নিভৃত আশ্রম প্রভৃতি কবিতায় বস্তুরূপকে লঙ্ঘন করিয়া বস্তুস্বরূপে পৌঁছিবার চেষ্টা অতিশয় স্পষ্ট। এগুলিও প্রেমের কবিতা। কিন্তু ইহাদের জন্মলগ্নে কোনো বিশেষ ব্যক্তির মুগ্ধনেত্রের দৃষ্টির অনুপ্রেরণা নাই, প্রেমের দেহহীন ভাবমূর্তির দ্বারা এগুলি উদ্বোধিত। মেঘদূত শ্রেণীর কবিতায় যে বিশিষ্ট স্থানিকতা, কালিকতা, যে বিশিষ্ট ব্যক্তি-মূর্তি আছে, এ সব কবিতায় তাহার একান্ত অভাব।

ক্রমে মিলাইয়া গেল সময়ের সীমা
অনন্তে মুহূর্তে কিছু ভেদ নাহি আর।
ব্যাপ্তিহারা শূন্য সিন্ধু শুধু যেন এক বিন্দু
গাঢ়তম অনন্ত কালিমা।
আমারে গ্রাসিল সেই বিন্দু-পারাবার।

মানসীকাব্যের ভূমিকাস্বরূপ 'উপহার' কবিতায় কবি বলিয়াছেন যে,

এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

মানসী কাব্যে অসীমের সীমা টানিবার প্রয়াস। মেঘদূত ও তৎশ্রেণীর কাব্য সসীমের কোটি, সুরদাসের প্রার্থনা ও তৎশ্রেণীর কাব্য অসীমের কোটি। অসীমের সীমা তখনি রচনা সম্ভব হয়, যখন সসীম অসীমে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অনন্ত ও সান্ত বা Ideal ও Real-এর সমন্বয় ঘটে। অন্তত সে দুরূহ সমন্বয় মানসীতে ঘটে নাই, পরবর্তী কাব্যে ঘটিয়াছে কি না তাহা পরে আলোচ্য, কিন্তু মূল কথাটা এই যে, এই দুরূহ সমন্বয়ের দিকেই কবির প্রতিভাও সিদ্ধতীর্থযাত্রী; এই দুরূহ সমন্বয়রূপ সিদ্ধি ব্যতীত যে কবি-জন্মের সার্থকতা নাই, সে বিষয়ে কবি নিঃসন্দেহ। মানসীকাব্য এই দুই বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত কোটিযুক্ত বিরাট হরধনুতে জ্যারোপ করিবার প্রাথমিক প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়।

দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন
রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস।

কিম্বা—

নাই, নাই, কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ,
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?

এই দুটি কাব্যাংশ অসীমের সীমা রচনার ব্যর্থতাজাত ক্ষুব্ধতা। অসীমের সীমা রচনা করা সম্ভব হইল না বটে, কিন্তু এটুকু কবি বুঝিতে পারিলেন যে, সীমার মধ্যে ছলনাময় একটা অসীমী সত্তা রহিয়াছে। ওটুকু বড় কম লাভ নয়। প্রেমিক সসীম, প্রেম অসীম; এ দুয়েরই রহস্য কবিকে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু কি উপায়ে যে এই দুই বিরুদ্ধ সত্তাকে মিলিত করিয়া ভোগ করা যায়, তাহা কবি বুঝিতে অক্ষম। প্রেমিক ছাড়া প্রেমের অস্তিত্ব কোথায়? উপলব্ধি কেমন করিয়া হয়? আর প্রেমিককে বুকে টানিতে গিয়া দেখা যায়—

দেহ শুধু হাতে আসে!

একাল ও সেকাল কবিতায় অসীমের সীমা রচনার আর-একটা চেষ্টা। একটি বিশেষ দিনের বর্ষা চিরকালীন বর্ষার ভূমিকায় আজ দণ্ডায়মান; একটি বিশেষ লৌকিক প্রেমিকার কথা মনে হইবামাত্র চিরকালীন প্রণয়িনীর মুখ কবির চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। লৌকিক বৃন্দাবন অলৌকিক সত্তায় মানুষের মনে বিরাজমান এবং সেদিনকার সেই বংশীধ্বনিত কুটিরপ্রান্তের রাধিকা লৌকিক বিরহীর বিষাদের তমালচ্ছায়া নিবিড় সুপ্তপ্রায় বনপথ দিয়া চিরকালীন অভি-সারিকার বেশে যাত্রা করিয়াছে। একাল ও সেকাল কবিতায় এই দুই বিপরীত ধর্মের সার্থক মিলন যেমন ঘটিয়াছে এমন আর মানসীর কোনো কবিতায় নহে। মেঘদূত ও সুরদাসের প্রার্থনা যদি দুই প্রান্ত হয় তবে একাল ও সেকাল তাহাদের মিলনবিন্দু।

এ পর্যন্ত যে কবিতাগুলির উল্লেখ করিলাম তাহারা মানসীর মূল ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিতেছে; এই ভাবধারা আবার কবির পূর্বাপর কাব্য-গ্রন্থের পৌর্বাপর্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে বিশেষ একটা পরিণতির পথে, বিশেষ একটা

লক্ষ্যের মুখে। কিন্তু এবারে কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করিব, যাহাদের বৈশিষ্ট্য অন্য কারণে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও শিল্প নিয়ত পরিবর্তনশীল, নানাবিধ পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাহারা গিয়াছে—কিন্তু একটি বিষয়ে কথনো তাহাদের পরিবর্তন ঘটে নাই, এমন কি, সে বিষয়ে কথনো তাহারা সংশয়িত অনুভব করিয়াছে। বিশ্ববিধানের পরিণাম মঙ্গলময়, বাহ্য দুঃখকষ্ট ও অমঙ্গল উদারতর দৃষ্টিতে শুভেরই ছদ্মবেশ, বিশ্বব্যাপারে যিনি কর্তা, তিনি আনন্দ ও কল্যাণস্বরূপ এবং তিনি একম্। মোটের উপর এই ভাবটিকে রবীন্দ্র-কাব্য ও রবীন্দ্র-জীবনের ভিত্তি বলা যাইতে পারে। এই ভাব তাঁহার জীবন-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হইলেও গোড়া হইতেই তাঁহার কাব্যে আছে; যেন মাতৃ-স্তন্যের সঙ্গেই ইহা তিনি পান করিয়াছিলেন, যেন পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকাররূপে তিনি ইহা পাইয়াছিলেন, যেন পূর্বজন্মের সংস্কাররূপে তিনি ইহা রক্তের মধ্যে বহন করিয়াই জন্মিয়াছিলেন।

কাজেই এই ভাবধারা রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান প্রবাহ হইলেও বিস্ময়জনক নহে, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মানসী কাব্যে কয়েকটি কবিতায় এই ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মানসীর পরবর্তী কাব্যে এই জাতীয় স্পষ্ট ব্যতিক্রম আছে কি না সন্দেহজনক। নিষ্ঠুর সৃষ্টি, প্রকৃতির প্রতি, মরণ-স্বপ্ন, শূন্য গৃহে, জীবন-মধ্যাহ্ন, ভৈরবী গান ও সিন্ধুতরঙ্গ রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট কবিতা এবং সেই জন্যই বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য।

> মনে হয়, সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়মনিগড়ে,
> আনাগোনা মেলামেশা সবি অন্ধ দৈবের ঘটনা।...
> মোরা শুধু খড়কুটো স্রোতোমুখে চলিয়াছি ছুটি...
> সৃষ্টিস্রোতকোলাহলে বিলাপ শুনিবে কেবা কার।

এই জাতীয় কথা রবীন্দ্রকাব্যে একান্ত বিরল। কিন্তু এই অন্ধকার নৈরাশ্যে কবিতাটির শেষ নয়—

> সত্য আছে স্তব্ধছবি
> যেমন উষার রবি,
> নিম্নে তারি ভাঙে গড়ে মিথ্যা যত কুহককল্পনা।

মঙ্গলের আশ্বাসে কবিতাটির শেষ—কিন্তু তাহা যেন হঠাৎ মনে-পড়া। কিন্তু আসল কবিতাটি যে-দোলায় দুলিতেছে, তাহা কবি-মনের একপ্রকার অবিশ্বাসজাত তিক্ততা।

হৃদয় কোথায় তোর খুঁজিয়া বেড়াই
নিষ্ঠুরা প্রকৃতি।
এত ফুল, এত আলো, এত গন্ধগান,
কোথায় পিরীতি।
আপন রূপের রাশে
আপনি লুকায়ে হাসে,
আমরা কাঁদিয়া মরি
এ কেমন রীতি।...

বিশ্ব নিবু-নিবু, যেন দীপ তৈলহীন ;...
সমস্ত মানবপ্রাণ বেদনায় কম্পমান—
নিয়মের লৌহবক্ষে বাজিবে না ব্যথা ! ..

এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু
রবে না।...
ভবে সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ,
কে রেখেছে মত আঁটিয়া
যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে।...
সেই যেখানে জগৎ ছিল এক কালে
সেইখানে আছে বসিয়া।...

নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন, নিরানন্দ
জড়ের নর্তন।
সহস্র জীবনে বেঁচে ওই কি উঠিছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ ?

নারীর উক্তি, পুরুষের উক্তি, ব্যক্ত প্রেম, গুপ্ত প্রেম পাত্রপাত্রীর দ্বারা কথিত 'নাটকীয় উক্তি' শ্রেণীর কবিতা। এই পরীক্ষার ধারাকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কাব্যে আর অনুসরণ করেন নাই।

গুরুগোবিন্দ ও নিষ্ফল উপহার 'ব্যালাড়' বা 'কথা' জাতীয় কাব্য। এই ধারা পরবর্তী কালে অনুসৃত হইয়াছে—ইহাদের সংকলন কথা ও কাহিনী কাব্যে। তবে এখানে দুটিই পরীক্ষামূলকতার স্তরে। গুরুগোবিন্দর সবটাই গুরুগোবিন্দের উক্তি—ঘটনাবিন্যাস ইহাতে নাই। কেবল শেষ শ্লোকটি উক্তি নয়—ঘটনার বিন্যাস। কিন্তু এই শ্লোকটি পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হইয়াছে। নিষ্ফল উপহারে ঘটনাবিন্যাস আছে।

মানসীতে রবীন্দ্রনাথ আর-একটি ছন্দরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন—ইহাকে মুক্ত পয়ার বলা যাইতে পারে। মেঘদূত ও অহল্যার প্রতি কবিতা নবপ্রবর্তিত মুক্ত পয়ারে লিখিত। মুক্ত পয়ার অমিত্রাক্ষর ও পয়ার মিলাইয়া গঠিত। ইহাতে অমিত্রাক্ষরের যতিপাতের স্বাধীনতার সহিত পয়ারের অন্ত্যানুপ্রাস মিশ্রিত। এই ছন্দরূপ পববর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ভাব-প্রকাশের একটি প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; বহু কবিতায় ও নাটকে এই ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়া মনে হয় কবি ইহাকে নিজের শক্তির অনুকূল বাহন বলিয়া মনে করিতেন। মধুসূদনেব পক্ষে যেমন অমিত্রাক্ষর, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তেমনি এই মুক্ত পয়ার।

এবারে মানসীর কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতার উল্লেখ করিব—বর্তমান লেখকের মতে এইগুলিই মানসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা। মেঘদূত, অহল্যার প্রতি, একাল ও সেকাল, কুহুধ্বনি এবং সিন্ধুতরঙ্গ। মেঘদূত সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

'অহল্যার প্রতি'কে, সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' কবিতার প্রথম খসড়া বলিয়া ধরা উচিত। অহল্যা বসুন্ধরা ছাড়া আর কেহ নহে। বসুন্ধরা জীবমাত্রেরই জননী, কিন্তু এক সময়ে সে লালনশীলা, স্নেহময়ী অন্নদায়িনী ছিল না ; সে অহল্যার মতোই অভিশপ্ত ও বন্ধ্যা ছিল—মেরুত মেরুতে ও নির্বান্ধব আদিম

সুপ্রয়োগ নহে বিবেচনা করিয়াই কবি পাঠান্তরে ইহার পরিবর্তন করিয়াছেন। অপর পক্ষে, 'ভুল-ভাঙা' কবিতা নাচাড়ী বা নাচিয়া-চলা ছন্দ—ইহাতে যুক্তাক্ষরের দুই মাত্রা গণনা সুপ্রযুক্ত হইয়াছে—

বাহুলতা শুধু বন্ধন পাশ
বাহুতে মোর।

অরণ্যের শ্বাপদসংকুল দুর্গম ভীষণতায়। কিন্তু এই অভিশাপ কাটাইয়া এখন বসুন্ধরা জননী হইয়া প্রসন্নদাক্ষিণ্যে জীবমাত্রকেই আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অহল্যার এখনো সে অভিশাপের অবস্থা সম্পূর্ণ কাটে নাই—কেবল সে অভিশাপমুক্ত হইয়া মাতৃত্বের মধ্যে নূতন জন্ম লাভ করিবার মুখে। কাজেই অহল্যার প্রভৃতি যেখানে শেষ, বসুন্ধরার সেখানে সূচনা। এইভাবে দুটিকে মিলাইয়া পড়িলে দুটিরই পূর্ণতর রূপ উপলব্ধি হইবে।

একাল ও সেকাল সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা পূর্বে করিয়াছি। এই নিখুঁৎ ক্ষুদ্র কবিতাটির একমাত্র খুঁৎ ইহার ষষ্ঠ শ্লোক—সেখানে বিরহিণী যক্ষনারীর চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকে পথিক বধূর উল্লেখ থাকিলেও সে ত্রুটি একেবারে অমার্জনীয় নহে। এই ক্ষুদ্রকায় কবিতাটিতে রসের জটিলতার স্থানাভাব—প্রারম্ভ হইতে শেষ অবধি এক-রসত্বই ইহার সাফল্যের প্রধান কারণ। একালের বিরহের প্রতিবিম্ব সেকালের রাধার বিরহের মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছে—আগাগোড়াই যমুনা ও বৃন্দাবনবিহারিণী বিরহিণীর চিত্র—তন্মধ্যে একটি শ্লোকে কালিদাসের যক্ষনারী আসিয়া পড়াতে রসবোধের অখণ্ডতা খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শেষ দুই শ্লোকে একালের বিরহ ও সেকালের বিরহকে চিরকালের বিরহের সংগীতের মধ্যে গ্রথিত করিয়া দিয়া চিরকালীন বিরহব্যথা ধ্বনিত করিয়া তোলা হইয়াছে।

কুহুধ্বনি রবীন্দ্রনাথের একটি রসোত্তীর্ণ কবিতা। এই কবিতাটির উপরে কীট্‌সের নাইটিংগেল কবিতার প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। কীট্‌সের নাইটিংগেল পৃথিবীর সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা; কুহুধ্বনির পক্ষে সে দাবী কেহ উত্থাপন করিবে না। মৃত্যুশীল জন্মস্রোতের মধ্যে ওই নাইটিংগেলই জীবনের শাশ্বত রূপ—ইহাই কীট্‌সের বক্তব্য। কর্মস্রোতের সুরহীন তালকাটা সংগীতের মধ্যে ওই কুহুধ্বনি সৌন্দর্যের ও পূর্ণতার ধুয়া বা ধ্রুবপদ ধরিয়া রাখিয়াছে। মানবজীবনের খণ্ডিত সংগীতকে সে অনাদিকাল হইতে বিশ্বের সৌন্দর্য-অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিলাইতে চেষ্টা করিতেছে। সফল সে হোক বা না হোক, ওইটাই জীবনের শাশ্বত রূপ—যতক্ষণ না মানবের খণ্ডিত জীবনসংগীত ওই অখণ্ড রসরূপের সঙ্গে মিলিত হইতেছে, ততক্ষণ মানবের মুক্তি নাই। তত্ত্ব আলোচনা করিয়া কাব্য বুঝিবার প্রয়াস বৃথা—কবিতাটি বারংবার পাঠ করা দরকার।

সিন্ধুতরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সমুদ্রবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্য কারণে 'সমুদ্রের প্রতি' ইহার চেয়ে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত—কিন্তু সমুদ্রের কবিতায় যদি সমুদ্রের বিশেষ রূপ, বিশেষ স্পর্শ, বিশেষ সংগীত অনিবার্য হয়—তবে সিন্ধুতরঙ্গ কেবল যে রবীন্দ্রনাথের সমুদ্রবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহা নয়, বাঙলা ভাষাতেই ইহা শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক কবিতা। ইংরেজি সাহিত্যে যে শ্রেণীর সামুদ্রিক কবিতা আছে, বাঙলা ভাষায় তাহার একান্ত অভাব—তার কারণ বাঙালী সমুদ্রচারী, সমুদ্রবিলাসী, সমুদ্রলালিত জাতি নহে। সমুদ্রকে আমরা কদাচিৎ দেখি, দূর হইতে দেখি—তাহার সহস্র মূর্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই। সেই জন্য সমুদ্রের কবিতা বাঙালী কবির হাতে সমুদ্রের রূপের কবিতা না হইয়া তাহার স্বরূপের বা ভাবমূর্তির কবিতা হইয়া ওঠে। ইংরেজি কবিতায় সমুদ্রের লবণাম্বুস্পর্শ, তাহার তাণ্ডব দোল, তাহার প্রলয় নৃত্য পাই, অথবা তাহার মুগ্ধ শান্ত শিশুসম রূপ পাই; যেভাবেই পাই, বিশিষ্টভাবে সমুদ্রকেই পাই—বাঙলায় তেমন সম্ভব নহে। সিন্ধুতরঙ্গ কবিতায় বাঙলা কাব্যের সেই অভাব কিঞ্চিৎ পূর্ণ হইয়াছে। ইহা বিশেষভাবে সমুদ্রের কবিতা—সমুদ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া কবির ভাবনার প্রকাশ মাত্র নয়। ইহার বুকফাটা ছন্দের উদার নৈরাশ্যে মজ্জমান জাহাজের ঝঞ্ঝোৎকণ্ঠ অন্তিম ক্রন্দন ধ্বনিত; জড়ে ও জীবে, বিশ্বের মঙ্গলময় পরিণামে ও আপাত নিষ্ঠুর ক্রিয়ায় যে মন্থন চলিতেছে—তাহার আন্দোলন অনুভূত হয় ছন্দ ব্যবহারে। শ্লোকের প্রথম চারটি ছত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, যেন তাহা ঝড়ের প্রাথমিক ঝাপটা; কিন্তু তারপরেই দীর্ঘায়ত চারটা ছত্র আসল ঝড়টার মতো একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়ে, বাঁচিলাম কি মরিলাম স্থির করিবার আগেই সে নিদারুণ ঝাপট চলিয়া যায়—তখন আবার ক্ষুদ্রতর দুটা ছত্র অপেক্ষাকৃত সুস্থ অবস্থা। শেষে একটি একক ছত্র—একটু নিশ্বাস ফেলিবার সুযোগ—

দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায়।

ছন্দে ভাবে ছবিতে সমুদ্রের এমন অনিবার্য কবিতা বাঙলা সাহিত্যে আর নাই—এই দ্বিরুক্তি করিয়া আমার রসবিস্ময় পুনরায় প্রকাশ করিলাম।

সোনার তরী

সোনার তরীতে আসিয়া কবির কাব্যপ্রতিভা পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইতিপূর্বের কাব্যগ্রন্থে দু-চারটা করিয়া ভালো কবিতা থাকিলেও, মোটের উপর সে কাব্যগুলিকে কাব্যসাধনার উদ্‌যোগপর্ব বলা যাইতে পারে। এই পরিণতির সঙ্গে কবিপ্রতিভার যে স্বভাব মগ্নচৈতন্যলোকে পূর্বে গুপ্তপ্রায় ছিল তাহা অনেকটা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এই স্বভাবের ধারাকে অনুসরণ করিতে পারিলে কবিকে সহজে বুঝা যাইবে। তার আগে কবির লিখিত দুইখানি পত্র পড়িয়া দেখা যাক।

প্রথম পত্র :

"মানসী সম্বন্ধে লিখেছ যে, তার মধ্যে একটা Despair এবং Resignation-এর ভাব প্রবল, সেই কথাটা আমি ভাবছিলুম। কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন, জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তিই আমার কবিত্বের মূলমন্ত্র, তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল, হতেও পারে। এখন এক-একবার মনে হয়, আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে, আর-একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে—সেইজন্যে এক দিকে বেদনা, আর-এক দিকে বৈরাগ্য। এক দিকে কবিতা, আর-এক দিকে ফিলজফি। এক দিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা, আর-এক দিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। এক দিকে কর্মের প্রতি আসক্তি, আর-এক দিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এই জন্য সবশুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য।"

—১৮৯৮, ২৯ জানুয়ারী ; সবুজপত্র, ১৩২৫

দ্বিতীয় পত্র :

"আমি সত্যি বুঝতে পারি নে আমার মনে সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিকজাতীয় উদাসীন-গৃহত্যাগী, নিরাকারের অভিমুখী।

ভালোবাসাটা লৌকিকজাতীয় সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে শেলির স্কাইলার্ক, আর-একটা হচ্ছে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্ক। এক জন অনন্ত সুধা প্রার্থনা করছে, আর-এক জন অনন্ত সুধা দান করছে; সুতরাং স্বভাবতই এক জন সম্পূর্ণতার আর-এক জন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে-ভালোবাসে সে অভাব-দুঃখ-পীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালোবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক; আর যে সৌন্দর্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ, যে যেটা অধিক ক'রে অনুভব করে।" —সবুজপত্র, ১৩২৪, ৪র্থ সংখ্যা

কবি এই দুইখানি পত্রে নিজের কাব্যপ্রতিভার বিশ্লেষণ করিয়া সমালোচকের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া দিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে কোনো অসঙ্গতি নাই। প্রথম পত্রের Despair ও Resignation দ্বিতীয় পত্রের সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এবং প্রথম পত্রের জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তি সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ [মানুষের প্রতি] ভালোবাসার নামান্তর মাত্র। এই দুই ধারার দ্বন্দ্ব ও পরিণাম রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ইতিহাস, এ কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। এখন দেখা যাক সোনার তরীতে এই ভাবদ্বন্দ্ব কি আকার লাভ করিয়াছে, এবং পরবর্তী কাব্যের কি ভবিষ্যৎ সূচিত করিতেছে।

১

কাব্যের গোড়াতে সোনার তরী, শেষে নিরুদ্দেশ যাত্রা। এই কবিতা দুইটি প্রতিভার ভিন্নমুখী দুটি ধারার প্রতীক। সোনার তরী প্রারম্ভে অবস্থিত হইয়া কবির মানবাভিমুখিতার সুরটি ধরাইয়া দেয়; এবং খুব সম্ভবত, নিরুদ্দেশযাত্রার চূড়ান্ত অবস্থান নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা সূচনা করে। বোধ হয় এ দুটি কবিতার অবস্থানের দ্বারা কবি ইহাই জানাইতে চাহেন প্রারম্ভের মানবাভিমুখিতা অন্তত এ কাব্যে সার্থকতা লাভ করে নাই। সৌন্দর্যের নিরুদ্দিষ্টলোকের আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা তাঁহাকে অসম্পূর্ণ মানবের সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া গিয়াছে। প্রথম কবিতাটির ইতিহাস গল্পে শোনা যাক।

"আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষারা নৌকা বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসচে, আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকা

যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্চি—যখন আর কয়দিন থাকলে ধান পাকতো তখন কাঁচা ধান কেটে আনা। চাষার পক্ষে কি নিদারুণ তা বুঝতেই পারা যায়!" —ছিন্নপত্র ১৪৮

প্রথম বর্ষার এই রকম একটি করুণ দৃশ্য সোনার তরী কবিতাটির জন্মলগ্নে। অতএব দেখা যাইতেছে ধান সোনার বর্ণ নহে, নিতান্তই সবুজ।

কবি তাঁহার এক আঁটি সোনার ধান লইয়া নিজের জীবনের ক্ষুদ্র ঘাটটিতে, ক্ষুদ্রতর অভিজ্ঞতার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখের কালস্রোত জগতের বৃহৎ জীবনযাত্রার প্রতি ধাবিত; বড় বড় নৌকার আনাগোনা সেই মহা জীবনযাত্রার আভাস বহন করিয়া আনিতেছে। কবি সেই বৃহৎ জীবনের জন্য উৎসুক, মাঝি নৌকা তীরে ভিড়াইল; কবির দান, তাঁহার সাধনার ফসল, একান্ত হইয়া যাহা তাঁহাকে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, মাঝি তাহা তুলিয়া লইল, কিন্তু সাধকের স্থান আর হইল না। কবিতাটির প্রাণ এই করুণ রসে। কবির দুঃখ কিসের! এতদিন নদীকূলে যাহা লইয়া তিনি আর-সমস্ত ভুলিয়াছিলেন সে সমস্তই সোনার তরীর মাঝি তুলিয়া লইয়া গেল। এই প্রিয়বস্তু-বিচ্ছেদের দুঃখ কবির।

কিন্তু সোনার তরীতে উঠিয়া পড়িবার সময় তাঁহার এখনো হয় নাই। এখনো তাঁহাকে এই শূন্য নদীর তীরে পড়িয়া থাকিয়া এই ছোটো খেতে একাকী সাধনা করিয়া আরো অনেক ফসল ফলাইতে হইবে, তবে না তাঁহাকে মাঝি তুলিয়া লইবে। অপূর্ণ জীবনের এক আঁটি ফসল দিয়া তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু এ সত্য তাঁহার কাছে উদ্ঘাটিত হয় নাই। তাহা হইলে দেখা গেল, সোনার তরী মানবের বৃহৎ জীবনের আভাস বহন করিয়া আনিল, কিন্তু কবির স্থান তাহাতে হইল না। তবে সেই জীবনের সংবাদ যে তিনি লাভ করিলেন, মনে যে তাঁহার ব্যাকুলতা জাগিল, আপাতত এইটুকুই সান্ত্বনা।

কবিতাটি চিত্ররস প্রধান। পদ্মাতীরের অতি পুরাতন একটি ঘটনাকে অপূর্ব শব্দ-সঙ্গতি ও ছান্দো-মাহাত্ম্যে আশ্চর্য চিত্রসম্পদ দান করা হইয়াছে। ইহা প্রধানত একটি নিখুঁত চিত্র, ইহাতে যে করুণ রস আছে তাহা আমাদের চিত্তে সঞ্চারিত হইয়া গিয়া সেখানে এক অলৌকিক মায়াময় করুণ ব্যঞ্জনা জাগাইয়া দেয়।

শৈশব সন্ধ্যা কবিতাটিতেও এই বৃহৎ জীবনের আভাস। ইহাতে তিনটি স্তর। প্রথমে—

সহসা উঠিল গাহি কোন্ খান হ'তে
বন-অন্ধকারঘন কোন্ গ্রাম পথে
যেতে যেতে গৃহমুখে বালক পথিক।

তারপরে সন্ধ্যায় গৃহমুখী বালকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া

মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলা
শৈশবের।

তৃতীয়স্তরে, নিজের শৈশবকে বিশ্বময় বিস্তৃত করিয়া অনুভব ;

দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা মার মুখ, দীপের আলোক।

এখানে দুটি ব্যাপার লক্ষ্য করিতে হইবে : প্রথমত, এই বিশ্বজীবনের অস্তিত্ব কবির নিকটে কল্পনা মাত্র ; দ্বিতীয়ত, নিজের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাকে দেখিবার শক্তি নাই! এই বৃহৎ জীবন এখনো কবির নিকটে স্বয়ংনির্ভর ও বাস্তব হইয়া ওঠে নাই।

"আমার শৈশব সন্ধ্যা কবিতায় বোধ হয় কতকটা এইভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম। কথাটা সংক্ষেপে এই যে, মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী অথচ ভালোমন্দ এবং সুখদুঃখ-পরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন কলস্বরে চিরদিন চলছে ও চলবে—নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।" —ছিন্নপত্র ২৬৯

এই ক্ষুদ্র জীবন ও চিরন্তন কলধ্বনি ব্যক্তিগত জীবন ও বিশ্বজীবন ব্যতীত আর কিছুই নহে, একটির পটভূমিতে আর-একটি; একটিকে দেখিয়া আর-একটিকে মনে পড়িয়া যায় ; একটি প্রত্যক্ষ, অপরটি কেবলমাত্র আভাস।

বৈষ্ণব-কবিতাতে মানবসমাজের প্রতি প্রীতি কবির চিত্তে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণবপদাবলীকে মানবসংসার হইতে বঞ্চিত করিয়া কেবল ভগবান্ ও ভক্তের উপভোগে নিয়োগ করিতে চান কবি তাঁহাদের সহিত একমত নহেন। ভক্ত ও ভগবান্ সংসারকে অতিক্রম করিয়া নাই। এই গানগুলির এমনই

মোহ যে ইহাতে ভক্ত, ভগবান্‌ও মানবসমাজ একীভূত হইয়া যায়—একের প্রেম হইতে অনেকের প্রেমে যাইবার সিংহদ্বার ইহাতে বন্ধ নয়। সেই জন্য যাঁহারা এ প্রেমকে মানুষের প্রয়োজন হইতে নির্বাসিত করিয়া রাখিতে চান তাঁহারা কৃপার পাত্র।

এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তারে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাবো কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

যেতে নাহি দিব কবিতার মূল ভাবটি পৃথিবীর প্রতি, জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি। আবার সে আসক্তি বিজ্ঞ বয়ঃপ্রাপ্তের নহে। জীবনের অভিজ্ঞতা যাহার খানিকটা জন্মিয়াছে সে জানে, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা ভবে' কিন্তু চারি বছরের মেয়ে বুঝিতেই পারে না কেন যে তাহার পিতা তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে। তাহার হৃদয়ের ব্যাকুল আগ্রহ সত্ত্বেও স্নেহময় পিতা ছাড়িয়া যান। ইহাই দুঃখের রহস্য। এই শিশুকন্যার ক্রন্দন আমাদের সকলের জীবনেই রহিয়াছে। পৃথিবীর বয়সের তুলনায় আমরা শিশু বই কি! এখানে কবির চিত্ত তাঁহার শিশুকন্যার মত বহুকালের পৃথিবীকে, প্রিয় বস্তুকে, অপস্রিয়মান সৌন্দর্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে।

তাঁহার চোখে—

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
"যেতে আমি দিব না তোমায়।"

বসুন্ধরা মানুষের জননী; সন্তানের দুঃখে তিনিও দুঃখিত। এই ভাবটিও মূল ভাবটির আনুষঙ্গিক।

বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ···
তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মত।

পৃথিবী দরিদ্রা, স্বর্গের অমৃত তাহার নাই, সে প্রাণপণ বলে সেই অমৃতের আভাস মাত্র দিতে পারে। পৃথিবীর সস্নেহ অক্ষমতা ও তাহার প্রতি আকর্ষণের ভাব নিম্নলিখিত কয়েকটি সনেটে প্রকাশ পাইয়াছে। মায়াবাদ, খেলা, বন্ধন, গতি, অক্ষমা, দরিদ্রা, আত্মসমর্পণ।

বসুন্ধরা একটি অপূর্ব কবিতা। বিজ্ঞানের কোনো একটি মতবাদের সহিত সুসঙ্গত অথচ পরিপূর্ণভাবে কাব্য, এমন কবিতা প্রায়ই দেখা যায় না। ইহাতে বিশ্বকে জানিবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষার সহিত, অন্তঃপুরবাসিনী ধরিত্রীকে জড়াইয়া থাকিবার ব্যাকুল আগ্রহ টানা-পোড়েনের মত বুনিয়া গিয়া বিচিত্র এক রসের সৃষ্টি করিয়াছে। এক দিকে—

নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন, এক হ'য়ে
সকলের সনে।

কিন্তু—

এখনো মিটেনি আশা,
এখনো তোমার স্তন-অমৃত পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি।···
এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়
মুখপানে চেয়ে।

কবি নিজেই এই ভাবটিকে গদ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপরে সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূরদূরান্তর কত দেশদেশান্তরের জলস্থলপর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।" —ছিন্নপত্র, পৃ. ১১৪

এবার পদ্যে দেখা যাক, এই ভাবটি কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের; তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে ল'য়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু। তাই আজি
কোনোদিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকামাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে

> কী জীবন রসধারা অহর্নিশি ধরে
> করিতেছে সঞ্চরণ ;...

কবিতাটির প্রথম অংশ কবির মানসভ্রমণের চিত্রে পূর্ণ। কবি কল্পনায় নব নব রাজ্য দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু এখনো ইহা মানসভ্রমণ মাত্র। গৃহের তৃষ্ণা মিটিলে তবে বাহিরের প্রতি টান সত্য হইয়া দেখা দেয়। ইহাতে ঘরের টানটাই বাস্তব, বাহিরের জিজ্ঞাসা কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষা। বিশ্বের বৈচিত্র্যের জন্য আকুলতা এবং ঘরের প্রতি বালকোচিত অসহায় ও করুণ আসক্তির সম্মিলনে যে রসসঙ্গম হইয়াছে—ইহাতেই কবিতাটির বিশেষত্ব।

এই সুদীর্ঘ কবিতাটি অনেকখানিই পৃথিবীর নানা দৃশ্যের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। মানসভ্রমণের অংশটা পড়িলেই বর্ণনার মধ্যে কেমন বড় বড় ফাঁক চোখে পড়ে। কিন্তু তাহার পাশেই পদ্মাতীরের বর্ণনায় কি প্রভেদ! একখানি ছবি পাঠকের দৃষ্টিতে পরিস্ফুট হইয়া ওঠে, যে ছবি কবি বহুবার দেখিয়াছেন, কবির জীবনের সহিত যাহা বহুকালের সহবাসে একীভূত হইয়াছে।

> হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে
> বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
> দূর গোষ্ঠে, মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি,
> তরু-ঘেরা গ্রাম হ'তে উঠে ধূম-লেখা
> সন্ধ্যাকাশে ; যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
> শ্রান্ত পথিকের মত অতি ধীরে ধীরে
> নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে।

কিম্বা—

> শরৎ-কিরণ
> পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র'পরে,
> নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
> আলোকে ঝিকিয়া...

জগতে নানা কবি সমুদ্রকে বিভিন্ন ভাবে দেখিয়াছেন। সোনার তরীর কবির সমুদ্র, কবির জননী, শুধু তাহাই নহে, সে সমস্ত পৃথিবীর আদিম জননী ; এ বিষয়ে কবির একখানি চিঠিতে আছে—

এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায়! পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়। আমার অন্তর-সমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কি একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠছে। কত অনির্দিষ্ট আশা, অকারণ আশঙ্কা, কত রকমের প্রলয়, কত স্বর্গ নরক, কত বিশ্বাস সন্দেহ, কত লোকাতীত, প্রত্যক্ষাতীত, প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি—মানব-মনের জড়িত জটিল সহস্র রকমের অপূর্ব অপরিমেয় ব্যাপার।" —ছিন্নপত্র, পৃ. ১৩২

এখন দেখা যাক, এই ভাবটি কেমন করিয়া কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

মনে হয়, যেন মনে পড়ে—
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট্ জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে…

আবার—

মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।

এখানে দুর্জয় সিন্ধুর সহিত কবির আত্মীয়তার সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ শিশু ও জননীর। কবি নিতান্ত অসহায় শিশুর মত আদিম জননীর নিকটে সকরুণ তাহার বলিতেছেন—

জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এপাশ ওপাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণ শ্বাস।

তাই—

স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারংবার হানি...
বলো তারে "শান্তি, শান্তি", বলো তারে "ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা।"

এ আবেদন নীড়কাতর বৃহৎ জগতের সহিত অর্ধপরিচিত বালকের, যে সুর পূর্বের কয়েকটি কবিতায় আমরা দেখিয়াছি।

সমুদ্রের প্রতি কবিতাটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সমুদ্র ও পৃথিবী; সমুদ্র মাতা, পৃথিবী একমাত্র কন্যা। সমুদ্র ও পৃথিবীর নানা প্রাকৃতিকদৃশ্য-বৈচিত্র্যকে মাতা ও শিশুকন্যার নানা ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কখনো আশা, কখনো শঙ্কা, কখনো মহেন্দ্রমন্দিরপানে অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, কখনো সুকোমল কৌশলে সমুদ্র মাতার ন্যায় পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে, আবার কখনো স্নেহগর্বসুখে ধরিত্রীর নির্মল ললাট আশীর্বাদে আর্দ্র করিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে সমুদ্র স্নেহক্ষুধার প্রচণ্ড পীড়নে তাহাকে চাপিয়া ধরিতেছে, আবার পরক্ষণেই নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় পদতলে আসিয়া পড়িতেছে। মাতা ও কন্যার ভাব অভিব্যক্তির বর্ণনায় কবি সাঁইত্রিশটি ছত্র লইয়াছেন। যখন দুইটি পদার্থ ভিন্ন প্রকৃতির হয়, অথচ সেই আপাত পার্থক্যের মধ্যেও একটি গূঢ় ঐক্য থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে উপমা চলিতে পারে, কিন্তু সর্বদাই দৃষ্টি রাখা দরকার উপমার আতিশয্যে তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিকৃত হইয়া না যায়। এখন, সমুদ্র ও পৃথিবী এই দুইটি পদার্থকে মাতা ও কন্যার সকল ভাবভঙ্গীতে কিছুদূর পর্যন্ত বর্ণনা করা চলে, তাহার বেশি গেলে অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। আমাদের মনে হয়, অতি উপমার চাপে এই স্বাভাবিকত্ব কিয়ৎ পরিমাণে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু শেষাংশের দোষ ইহার চেয়েও গুরুতর। কবিতাটির প্রথমাংশ কল্পনা ও ভাবের যে উচ্চগ্রামে আরব্ধ হইয়াছে, পরিসমাপ্তিতে তাহা রক্ষিত হয় নাই। মধ্যমাংশে পৃথিবীর শিশু-কবি আদিম জননীর ভাষা যেন কিছু কিছু বুঝিতে

পারিতেছেন, এবং যখন ওই বিরাট জঠরে বিলীন হইয়াছিলেন তখনকার কথা স্মরণ করিতেছিলেন। সমুদ্রে যেমন এক সময়ে মহাদেশ জাগিতেছিল, তেমনি তিনি অনুভব করিতেছেন, মানবহৃদয়সিন্ধুতলেও একটা বিরাট সৃষ্টি চলিতেছে, যদিও কবি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু দিতে পারেন না। অবশেষে কবি সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমার পৃথিবী পীড়ায় আজ পীড়িত, চক্ষে তাহার অশ্রু, ঘন ঘন তাহার উষ্ণশ্বাস, সে তৃষিত, সে যেন বিকারের মরীচিকা-জালে পথ হারাইয়াছে, অতএব

অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মত…

পাঠক যখন আদি জননীর সান্ত্বনাবাক্যের জন্য উৎসুক হইয়া ওঠে, তখন সে কি শোনে—

শান্তি, শান্তি—ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা।

ইহা এমন কি সান্ত্বনার! অন্তত এমন তুচ্ছ সান্ত্বনা আদিম জননীর যোগ্য নহে। প্রথম হইতে পাঠকের মনে যে ঔৎসুক্য ও আশা জমিয়া উঠিতেছিল, দুর্বল পরিসমাপ্তিতে তাহা একেবারে ভাঙিয়া না পড়িলেও পাঠককে বড়ই নিরাশ করিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক শ্রেষ্ঠ ও দীর্ঘ কবিতা শেষাংশে এই রকম একান্ত দুর্বল। দেউল, বিশ্বনৃত্য, পুরস্কার প্রভৃতি কবিতার আলোচনা বাহুল্য বোধে করা হইল না, এগুলিও উপরি-উক্ত মূল ভাবের অন্তর্গত।

২

কবির প্রতিভার মূল দুইটি ধারার একটির আলোচনা করিলাম; কবি যাহাকে বলিয়াছেন জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তি এবং সুখদুঃখপূর্ণ অসম্পূর্ণ মানবের প্রতি ভালোবাসা; দ্বিতীয় ধারাটিকে কবি বলিয়াছেন—একটি Despair ও Resignationএর ভাব। ইহা সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা; ইহা মানুষের অসম্পূর্ণ জগৎ হইতে সম্পূর্ণ Ideal লোকের দিকে কবিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

সোনার তরীর শেষতম নিরুদ্দেশ যাত্রায় ইহার আভাস। গোড়ার কবিতার মত এটিতেও সোনার তরী, সেই নদী, কেবল তাহাতে নাবিকাটি অপেক্ষাকৃত

মনোরম। কিন্তু এ তরী সোনার ধান, অর্থাৎ মানুষের যেটুকু পূর্ণতা, Ideal বহন করিয়া অসম্পূর্ণ মানুষকে ফেলিয়া রাখিয়া যায় না। এ তরী স্বয়ং অসম্পূর্ণ কবিকে নিরুদ্দিষ্ট সৌন্দর্যের আদর্শলোকে বহন করিয়া লইয়া যায়। মানুষের সংসারের দিকে এ তরীর গতি নয়, ইহার লক্ষ্য—

উর্মিমুখর সাগরের পার,
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে।

এ তরীর যাত্রীর চোখে পড়ে—

পশ্চিমপানে অসীম সাগর
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।

মনে আশা হয়—

আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়,
সোনার ফলে।

ইহার লক্ষ্য একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতায়—

স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি
তিমিরতলে।

ইহার লক্ষ্য সৌন্দর্যলোক, নিরুদিষ্ট সৌন্দর্যলোক, এবং নিরুদিষ্ট সৌন্দর্যের সম্পূর্ণলোক। গোড়ার কবিতাটি হইতে ইহা মূলত ভিন্ন।

আকাশের চাঁদ ও পরশ-পাথর দুটি কবিতাই এই এক ভাবকে প্রকাশ করিতেছে। একজন অপ্রাপ্য আকাশের চাঁদের সাধনায়, আর-একজন দুষ্প্রাপ্য পরশ-পাথরের সন্ধানে জীবনের সহজ-দুর্লভ ছোটখাট আনন্দগুলিকে মাটি করিয়া দিল। জীবনকে অতিক্রম করিয়া একটা অলৌকিক আদর্শের সাধনায় ক্লান্ত ও হতাশ হইয়া জীবনের শেষে হঠাৎ একদিন পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া দেখে, কি ভুল তাহারা করিয়াছে। জীবন কত সুন্দর, কিন্তু সুযোগ টলিয়া গেলে তাহা

কত দুর্লভ! তাহারা আর আকাশের চাঁদ চাহে না, পরশ-পাথর চাহে না, জীবনের ক্ষণিক অমরতার স্বাদের জন্য তখন তাহাদের ব্যাকুলতা!

পথিকেরা এসে তাহারে শুধায়
'কে তুমি কাঁদিছ বসি?'
সে কেবল বলে নয়নের জলে
'হাতে পাই নাই শশী।'

দ্বিতীয় শ্লোকে সংসারের মধুরতার বর্ণনা—

এই পথে গৃহে কত আনাগোনা
কত ভালোবাসাবাসি,
সংসারসুখ কাছে কাছে তার
কত আসে যায় ভাসি,
মুখ ফিরাইয়া সে রহে বসিয়া
কহে সে নয়নজলে,
'তোমাদের আমি চাহি না কারেও
শশী চাই করতলে।'

কিন্তু—

শশী যেথা ছিল সেথাই রহিল
সেও বসে এক ঠাঁই।
অবশেষে যবে জীবনের দিন
আর বেশি বাকি নাই।

তখন দেখিল জীবন সুন্দর, পৃথিবী সুন্দর, প্রেম দুর্লভ, তখন—

নিশ্বাস ফেলি রহে আঁখি মেলি
কহে ম্রিয়মাণ মন,
'শশী নাহি চাই, যদি ফিরে পাই
আরবার এ জীবন।'

তখন—

দেখিল চাহিয়া জীবন পূর্ণ
সুন্দর লোকালয়...

দেখে বহু দূরে ছায়াপুরীসম
অতীত জীবন-রেখা।...

সোনার জীবন রহিল পড়িয়া
কোথা সে চলিল ভেসে।
শশীর লাগিয়া কাঁদিতে গেল কি
রবিশশীহীন দেশে।

পরশ-পাথরের ট্রাজেডি আরও করুণ। সে যে-স্পর্শমণির সন্ধান করিতেছিল, কোন্ অনবহিত ক্ষণে তাহার স্পর্শও পাইয়াছিল, কিন্তু অভ্যাসের জড়তায় তাহাকে চিনিতে না পারিয়া রক্ষা করিতে পারে নাই। হঠাৎ এ ভুল যখন ধরা পড়িল,

সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্ব পথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন করে হারানো রতন।...

অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুঁজি
স্পর্শ লভেছিল যার একপল ভর;
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর।

এই ক্ষ্যাপাকে সন্ন্যাসী বলা হইল কেন? কারণ সে জীবনের চরম আনন্দকে লাভ করিবার জন্য ভুল পথ ধরিয়াছিল। জীবনের সাধনা সন্ন্যাসের সাধনা নয়, সেই জন্যই তাহার এই ব্যর্থতা।

এই দুইটি কবিতাতেই জীবনকে অতিক্রম করিয়া নিরুদ্দেশ Ideal-লোক খুঁজিবার ব্যর্থতা কবি দেখাইয়াছেন। বুদ্ধিতে ইহার ব্যর্থতা কবি বুঝিলেও জীবনে ইহার হাত সম্পূর্ণভাবে তিনি এড়াইতে পারেন নাই।

মানস-সুন্দরী রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এটি বাস্তব ও আদর্শ দুই লোকের মধ্যে উভচর। কবির প্রেয়সী, কল্পনা ও বাস্তব রাজ্যের গোধূলি-আকাশের দিক্‌প্রান্তশায়িনী সন্ধ্যার নিঃসঙ্গ তারকা; কখনো সে পৃথিবীর দীপ, কখনো বা আকাশের তারা। কখনো সে একটি বিশিষ্ট নারীমূর্তিতে ধরা দেয়, আবার কখনো মূর্তি দীর্ণ করিয়া বিশ্বের সৌন্দর্যলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। বাস্তবলোকে—

কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্বজন্মে নারী-রূপে ছিলে কি না তুমি
আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুসুমি
প্রণয়ে বিকশি।

আদর্শলোকে—

বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধ বাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজ চারিধার।
গৃহের বনিতা ছিলে—টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়—

এ কবিতাটিতে কবির যুগ্ম ধারার দ্বন্দ্ব বেশ ফুটিয়াছে। কবি যাহাকে নিতান্ত ব্যক্তিগত করিয়া, গৃহলক্ষ্মী করিয়া উপভোগ করিতে চান, কোন্ অদৃষ্টের উপহাসে সে বারংবার ব্যক্তিগত এই বাস্তবতাকে উচ্ছেদ করিয়া নৈর্ব্যক্তিক রূপ গ্রহণ করে; গৃহের লক্ষ্মী নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলক্ষ্মী হইয়া উঠে।

হৃদয়-যমুনাতেও এই একই সুর। এক হিসাবে ইহা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ত্রুটিহীন। নিজেকে উপভোগ করিবার সমস্ত আয়োজন ইহাতে পরিপূর্ণতম। কবির হৃদয় হইতেছে যমুনা, তাহা আবার কূলে কূলে পূর্ণ, তাহাতে আবার—

আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।

দুই তীর নির্জন এবং মেঘের যবনিকায় আচ্ছন্ন। এমন যমুনায় কেবল একটিমাত্র সে। ইহাতে কবি নিখিল বন্ধন খুলে আপনার কল্পনায় আপনি মগ্ন। যমুনার ধীর গম্ভীর একতান তরঙ্গধ্বনি প্রতি শ্লোকের পাঁচটি করিয়া এক-শব্দক মিলে সুন্দরভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। যমুনার বৈচিত্র্যহীন তরঙ্গধ্বনি, বর্ষার অবিরল ঝর্ঝর, মেঘযবনিকায় আচ্ছন্ন একীভূত বিশ্ব এবং কবির অন্যসমস্ত-ভোলা

একটিমাত্র ব্যাকুল বাসনা, সমস্তই ছন্দের ও মিলের monotonyর দ্বারা চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে।

হৃদয়-যমুনাতে প্রেমের সূচনা ও পরিণাম সুকৌশলে দেখানো হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে শুধু ভরিয়া লইবে কুম্ভ। যেন হৃদয়-যমুনার জল কুম্ভ ভরিবার জন্যই, গৃহকাজের জন্যই; প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো আবশ্যক যেন তাহার আর নাই। প্রেমের সূচনা তো এই রকমই। সংকোচে সাধ্বসে প্রথম পরিচয়, মৃদু মৃদু আধ আধ ভাষণ—'তল তল ছল ছল, কাঁদিবে গভীর জল।' অর্ধ শঙ্কিত, মৃদু কম্পিত পায়ে আগমন—নূপুরের রিণিকি ঝিনিকি-মাত্র। প্রেমিকের হৃদয়ে গভীর জল, কিন্তু তার শব্দটি প্রায় নীরবতার মতই—তল তল ছল ছল! আর-একজনের হৃদিসংলগ্ন কুম্ভ শূন্য, কিন্তু তার পা-দুখানিও চলে কি না চলে—নূপুর রিণিকি ঝিনি।

দ্বিতীয় শ্লোকে, প্রথম শ্লোকের সে প্রথম পরিচয়ের সংকোচ খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে। কলস ভরিবার কথা আর মনে নাই। এখন—

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে…

এ জলে আর গৃহকার্য সম্পন্ন হইবার নয়। এ যমুনার সমস্ত আবশ্যক যেন এমনি নীরবে আত্মবিস্মৃত হইয়া তীরে বসিয়া থাকিবার জন্যই। সেই আত্মবিস্মৃতার দুটি কালো আঁখি দিয়া মন কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার অঞ্চল যে কখন স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মনেও নাই। যে প্রয়োজন সাধনের জন্য তাহার আগমন, সে প্রয়োজন ওই ভাসমান কলসের সঙ্গেই কোথায় ভাসিয়া গেল!

তৃতীয় শ্লোকে দেখি—কলস পূর্ণ করাও নহে, কলস ভাসাইয়া বসিয়া থাকাও নহে। প্রণয়ীযুগলের সম্বন্ধ নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। এখন—

যদি গাহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো, হেথা
গহনতল।

সামাজিক লজ্জাসরমের কথা আর তেমন করিয়া মনে পড়ে না,

নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ।

কিন্তু এখনো লজ্জা সম্পূর্ণ যায় নাই; তাই—

ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।

আর—

সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি

চতুর্থ শ্লোকে—উভয় সত্তা এক হইয়া গিয়াছে—আর কোনো ভেদ চোখে পড়ে না।

যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে!

প্রেমের পরিণামে এক সত্তা সম্পূর্ণভাবে আর-একটির মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। ইহার তল নাই, তীর নাই, ইহা মৃত্যুর মতোই শান্ত এবং স্নিগ্ধ এবং সুগভীর। ধরিত্রীর দিনরাত্রির দ্বারা ইহা অপরিমেয় এবং সূচনায় যে গীত গান ছিল তাহাও কখন নীরব হইয়া গিয়াছে। জীবনের সকল বন্ধন এবং গৃহের সকল কাজ, আজ তাহার কোথায়!

এই জীবন-অতিক্রমকারী নিরুদ্দেশলোককে অহেতুক বিষাদের রাজ্য বলা যাইতে পারে। ইহা হৃদয়ে একটি অসীমতার ভাব জাগাইয়া দেয়। প্রকৃতির বিষাদের চিত্র চিত্তে বিষাদময় নিরুদ্দেশলোককে জাগ্রত করিয়া তোলে। এক হিসাবে ইহা সৌন্দর্যলোকও বটে, কারণ জীবনের অসম্পূর্ণতা ক্ষুদ্র খণ্ডতা ইহাতে নাই।

"ভারতবর্ষে যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি আছে এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই জন্যে আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম বৈরাগ্য আবিষ্কার করতে পেরেছে,—এই জন্যে আমাদের পূরবীতে কিংবা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের হাঁ-হা ধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারো ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটা অংশ আছে, যেটা কর্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায় নি; পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মীড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে।"

—ছিন্নপত্র, ১৮৯১, পৃ. ৩২-৩৩

আবার—

"আমাদের এই আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে আর ঐ বহুদূরবর্তী আকাশের সঙ্গে কী একটি স্নেহভারবিনত মৌন ম্লান মিলন। অনন্তের মধ্যে যে একটি

প্রকাণ্ড চিরবিরহবিষাদ আছে সে এই সন্ধ্যেবেলাকার পরিত্যক্তা পৃথিবীর উপরে কী একটি উদাস আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে দেয়—সমস্ত জলে স্থলে আকাশে কী একটি ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা !'

—ছিন্নপত্র, ১৮৯২, পৃ. ১১৭

এখন, সোনার তরীর মাঝি, নিরুদ্দেশ যাত্রার অপরিচিতা ইহারা কে ? এবং ইহারা একই ব্যক্তি কি না ? যদি ইহারা এক ব্যক্তি হয়, তবে এ কে। এবং মানস-সুন্দরীতে যাঁহার উল্লেখ সে-ই বা কে ?

এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে ? সৌন্দর্যপাথারে
যে বেদনা-বায়ু-ভরে ছুটে মনতরী,
সে বাতাসে কতবার মনে শঙ্কা করি
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল ;
অভয়আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই ; বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে—আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।

এই কর্ণধার কে ? বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় নিরুদ্দেশ যাত্রার নাবিকা এবং এ ভিন্ন নহে। বাস্তবিক পক্ষে, এই তিন চিত্রই এক ব্যক্তির, এবং এ কবির জীবনদেবতা !

চিত্রাতে জীবনদেবতার কথা স্পষ্ট করিয়া চিত্রিত, সোনার তরীতে অস্পষ্টভাবে তাহার পূর্বাভাসপাত। বর্তমান গ্রন্থে জীবনদেবতার আকৃতি ও প্রকৃতি কবির নিকটে প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে নাই ; তাই সোনার তরীর জীবনদেবতা ছায়াসার এবং তাঁহার ক্রিয়াপদ্ধতিও অত্যন্ত অনির্দিষ্ট। চিত্রাতে

জীবনদেবতা কি আকার লাভ করিয়াছেন এবং কবির জীবন ও কাব্যের কতখানি তিনি অধিকার করিয়া বসিয়াছেন তাহা যথাস্থানে দেখিব। বর্তমানে জীবনদেবতা কেবল কবির কবিতা ও কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী—

আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনা-লতা।

কথনো বা তিনি প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্তা—

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হ'তে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি...

আবার কখনো বা তিনি সোনার তরীর মাঝি হইয়া কবির জীবনের সাধনার ফসল বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। ফল কথা, সোনার তরীর জীবনদেবতা কবির সমগ্র জীবনকে অধিকার করিয়া বসেন নাই, তাঁহার সম্বন্ধে কবির অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ও সচেতন নহে। সেই জন্যই সোনার তরীতে তাঁহার পরিচয় এমন ভাসা-ভাসা, খণ্ডশ, তাহা কোনো একটি বৃহৎ রূপের অন্তর্গত হইয়া অখণ্ড, এক ও সচেতন হইয়া উঠে নাই।

৩

সোনার তরীর কয়েকটি কবিতাকে আমরা রূপকথার পর্যায়ে ফেলিতে পারি: বিম্ববতী, রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে, নিদ্রিতা, সুপ্তোত্থিতা। এই ধারাটি 'কড়ি ও কোমল' হইতে সুরু; তাহার উপকথা, বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, সাতভাই চম্পা এই পর্যায়ের। পরবর্তী কাব্যের ভ্রষ্ট লগ্ন, সব পেয়েছির দেশের অভিজ্ঞতা গভীরতর ও ইঙ্গিত সুদূরতর প্রসারী হইলেও উহাদের ঠাটটি রূপকথার। বর্তমান কাব্যে ইহাদের মূল্য রূপকথার মারফতে কবির নিজের শৈশবকে পুনরায় উপভোগ করার চেষ্টায়।

৪

সোনার তরীতে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা আছে, হিং টিং ছট্। এই ধারাটিও পূর্ববর্তী 'মানসী' হইতে সুরু। মানসীর বঙ্গবীর, ধর্ম্মপ্রচার, নববঙ্গ দম্পতীর প্রেমালাপ বিদ্রূপাত্মক। পরবর্তী কাব্যের উন্নতি-লক্ষণ এই পর্যায়ের। "এক দিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা আর-এক দিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস" কবি চিত্তের এই দ্বন্দ্বের একটি দিক এইসব কবিতা প্রকাশ করিতেছে।

চিত্রা

সোনার তরীতে কবিপ্রতিভার যে দ্বন্দ্ব ও যে পরিণামের দিকে প্রাগ্রসর গতি দেখিলাম, চিত্রাতে তাহা পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত কবির প্রতিভা সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, ক্ষণিকা পর্যন্ত এই পরিণামের দিকেই ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছে। কল্পনা, কথা ও কাহিনী ও নৈবেদ্যে তাহা একটা মোড় ফিরিলেও মূলত সে-সব কাব্য এই মূল ধারার অন্তর্গত। এই ভাবটি মনে রাখিলে চিত্রা, চৈতালি দুর্বোধ্য লাগিবে না।

চিত্রাতে কবির প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বৃক্ষ-জীবনের মত দুই দিকে প্রসারলাভ করিতেছে। এক দিকে তাহা আপন ব্যক্তিত্বের নব নব দ্বার মোচন করিতেছে, অপর দিকে বিশ্বকে, নানা দিক হইতে—সমাজ, রাজনীতি, সৌন্দর্যতত্ত্ব—নানা ভাবে আয়ত্ত করিতে চাহিতেছে।

এই কাব্যের প্রথম কবিতার নাম চিত্রা। কবিতাটিতে দুইটি ধারার আভাস আছে। এক দিকে—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

আবার—

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।

যে-সত্তা সমগ্র বিশ্ব নানা বিচিত্র সৌন্দর্যে পূর্ণ করিয়া বিরাজিত, তাহাই আবার অন্তর্লোকে শাশ্বতরূপে একাকিত্বে উদ্ভাসিত। যাহা বাহিরে শব্দে, গন্ধে, বর্ণে এবং অসংখ্য ছন্দভঙ্গীতে ইন্দ্রিয়গ্রামকে অধিকার করিয়া আছে, তাহাই অন্তরে ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া, দেশ ও কালের অতীত রূপে কেবলমাত্র মানসযুক্তে পরম বিস্ময়ে প্রস্ফুটিত। ইহাই চিত্রার মূল সুর।

ইহাতে কতকগুলি কবিতা আছে, যাহাতে কবি ব্যক্তিগত জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ, প্রেম ও অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছেন। আবার কতকগুলিতে ব্যক্তিগত জীবনের দিক্-রেখা অতিক্রম করিয়া যে বৃহৎ সংসার বিরাজ করিতেছে, যে-সংসারের সহিত কবির পরিচয় অল্প, কিন্তু যাহাকে জানিবার ঔৎসুক্য তাঁহার অল্প নহে, সেই বৃহৎ জীবনযাত্রার প্রতি ব্যগ্র আকুতি। এই দুই শ্রেণী ব্যতীত কয়েকটি কবিতা উপরি-উক্ত দুই ভাবরাজ্যের সীমান্তশায়ী; সেগুলিতে কথনো একটি কথনো বা অপর ভাবের আধিক্য। এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, পূর্বে যাহাকে আমরা সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশলোক বলিয়াছি, আর এখানে যাহাকে ব্যক্তিগতজীবনের রহস্যলোক বলিতেছি, ইহারা অভিন্ন নয়। বৃহৎ মানবজীবনধারা হইতে কবি যখনই পলাতক হইয়াছেন, তখনই তিনি এই ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থান করিয়াছেন। ব্যক্তিগত রহস্য ও নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোক, দুই-ই আত্মগত, দুই-ই কবিকে মানব-সংসার হইতে দূরে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

১

এখন প্রথমে আমাদের বিচার্য রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কে? রবীন্দ্র সাহিত্যে যে-সমস্ত দুরূহ আলোচ্য আছে, তন্মধ্যে জীবনদেবতা প্রধান।

প্রথমে স্বীকার করাই শ্রেয় যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' বা 'অন্তর্যামী' কবিতাকে আমরা কাব্য হিসাবে উচ্চাঙ্গ মনে করি না। কবির চিন্তাধারা ও তত্ত্বব্যাখ্যার দিক দিয়া কবিতা দুইটির বিশেষ মূল্য আছে। আমরা সেই হিসাবেই ঐ দুইটিকে বিচার করিব।

জীবনদেবতা কি? জীবনদেবতা আর যাহাই হউক, ঈশ্বর নহে। পৃথিবীর দুইটি গতি আহ্নিক ও বার্ষিক; একটির দ্বারা সে চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের

চতুর্দিকে আবর্তিত হয়, অন্যটির দ্বারা তিনশ পঁয়ষট্টি দিনে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে; আবার এই দুইটি গতি পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। আপাতদৃষ্টিতে আহ্নিক গতি বিচ্ছিন্ন হইলেও, সেই বিচ্ছিন্নতা, খণ্ডতা অবশেষে এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন জপমালায় আবর্তিত হইতে হইতে বার্ষিক গতিকে সম্পূর্ণ করে। মানুষেরও দুইটি জীবন; একটি ব্যক্তিগত, অপরটি বিশ্বের আব্রহ্মস্তম্ব সমগ্র জীব অণুপরমাণুর সহিত একাত্ম; এইখানেই জীবনরহস্যের দ্বন্দ্ব। এক স্থানে আমি আমার 'অহং'কে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের আর সকলের হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। আবার অন্যত্র এক প্রকাণ্ড ইতিহাসের মধ্যে একত্র বিধৃত। ইহা স্বতবিরোধী হইলেও পরম সত্য। জীবনদেবতা এই ব্যক্তিগত জীবনের অধিষ্ঠাতা, তিনি বিশ্বদেবতা নহেন। পৃথিবীর খণ্ড আহ্নিক গতির মতো মানুষের এই বিচ্ছিন্ন জীবন বহু পূর্বজন্মের এবং বহুতর পরজন্মের দ্বারা একটি অখণ্ড জীবনস্রোত গাঁথিয়া তুলিতেছে। সেই অখণ্ডতার দেবতা বিশ্বদেবতা। কাজেই দেখা যাইতেছে, জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতা এক না হইলেও পরস্পর সংবদ্ধ, যেমন সংবদ্ধ মানুষের ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত জীবন, যেমন সংবদ্ধ পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক আবর্তন। আবার এই জীবনদেবতা আছেন বলিয়াই মানুষের খণ্ড ও অখণ্ড জীবন এক পরম সমন্বয়ের সূত্রে সংযুক্ত হইয়া উঠিতেছে, নহিলে এই খণ্ড খণ্ড জীবনগুলি সূত্রহীন পুষ্পের ন্যায় মাল্য রচনা না করিয়া ঝরিয়া পড়িত। ফলতঃ জীবনদেবতা, ব্যক্তি ও বিশ্বের মধ্যে সামঞ্জস্যের সেতু। জীবনদেবতা-তত্ত্বের গুরুত্ব সম্বন্ধে স্বয়ং কবিও সচেতন এবং সৌভাগ্যক্রমে তিনি 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

— "আমার সুদীর্ঘকালের কবিতালেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই, এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটা সত্য নহে। * * তাহাদের প্রত্যেকের [কবিতার] যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম—

এ কি কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

যখন যেটা লিখিতেছিলাম, তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। * * কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে সকল লেখা উপলক্ষ্য মাত্র; তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর-একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য বর্তমান।

বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে…
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।"

কবি এখানে ব্যক্তিগত কথা বলিতেছিলেন, কি জাদু মন্ত্রে তাহা বিশ্বের হইয়া উঠিল। কবি নিজেই বিস্মিত—

যে-কথা ভাবি নি বলি সেই কথা,
যে-ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

শুধু যে কবিকে অতিক্রম করিয়া আর-একজন নিভৃতচারী কবি বিরাজ করিতেছেন তাহা নয়। "সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত

হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন।"

যেমন কবির ব্যক্তিগত কথার মধ্যে কাহার ইচ্ছায় বৃহত্তর জীবনের আভাস ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, তেমনি আবার দেখিতে পাই গৃহমুখী কবিকে টানিয়া আনিয়া বিরাট সংসারের বিচিত্র পথের উপর কে দাঁড় করাইয়া দিল।

> "একি কৌতুক নিত্যনূতন
> ওগো কৌতুকময়ী!
> যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে
> চলিতে দিতেছ কই।...

এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদি কাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন; সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।"

কবির একখানি চিঠিতে পাই—"নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি, তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই—আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এইটেকে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণুপরমাণুও থাকতে পারে না; আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছু মাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়—সেইজন্যই এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত ক'রে নেয়। নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত? নইলে তাকে কি আমি সুন্দর বলে অনুভব করতেম? * * আমার সঙ্গে অনন্ত জগৎ-প্রাণের যে চিরকালের নিগূঢ়

সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণ, গন্ধ, গীত। চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য-অলক্ষ্যভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে, কথাবার্তা দিন-রাত্রিই চলছে।"

যে জীবনদেবতা "রূপরূপান্তর-জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই" উদ্দেশ করিয়া লিখিত—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?"

তখন "মনে কেবল এই প্রশ্নই ওঠে, আমি আমার এই আশ্চর্য অস্তিত্বের অধিকার কেমন করিয়া রক্ষা করিতেছি, আমার উপরে যে প্রেম, যে আনন্দ অশ্রান্ত রহিয়াছে, যাহা না থাকিলে আমার থাকিবার কোনো শক্তিই থাকিত না, আমি তাহাকে কি কিছুই দিতেছি না?

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভালো, হে জীবননাথ,
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার নর্ম আমার কর্ম
তোমার বিজন বাসে!"

এখন "যদি এমন হয় যে, আমার বর্তমান জীবনের মধ্যে এই জীবনদেবতার সেবার সম্ভাবনা যতদূর ছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়া থাকে, তবে তিনি ইহজীবনের এই ভস্ম-শেষ আবর্জনাকে ফেলিয়া দিবেন, কিন্তু যে জ্যোতিঃ-শিখা ইহার অন্তরে তাহাকে মরিতে দিবেন কেন?

এখন কি শেষ হয়েছে, প্রাণেশ,
যা-কিছু আছিল মোর?...
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আন নব রূপ, আন নব শোভা,

নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে,
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে।

"নিজের জীবনের মধ্যে এই যে আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে, যে-আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কাল মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম।"

—বঙ্গভাষার লেখক, প্রথম খণ্ড

২

সোনার তরীতে যে-সব ছায়াপাতের কথা বলিয়াছি, এখানে তাহা গভীরতর হইয়াছে। সেখানে যাহা আভাসমাত্র ছিল কবি এখানে আসিয়া তাহাকে জীবনের অধিষ্ঠাতা, জীবনদেবতারূপে দেখিলেন। একটি কথা ভুলিলে চলিবে না, এই ব্যক্তিগত ও বৃহত্তর জীবনকে দুই কোঠায় স্বতন্ত্র করা যায় না। আলোচনার সুবিধার জন্যই কবিতাগুলিকে দুই ভাগ করা, আবার আলোচনা করিতে গিয়াই দেখিতে পাইব, এমন ভাগ চলে না, একটার মধ্যে আর-একটার আভাস। ব্যক্তিগত জীবন কখন অকস্মাৎ বৃহত্তর জীবনের উদারতা লাভ করিতেছে আবার বৃহৎ জীবনের মধ্যেও ব্যক্তিগত জীবনের পরম ঘনিষ্ঠতা!

'জীবনদেবতা' যেমন ব্যক্তিগত দেবতার বন্দনা, 'প্রেমের অভিষেক' তেমনি বন্দনা ব্যক্তিগত জীবনের পরম রমণীয় মাহাত্ম্যের। সংসারের প্রাত্যহিক আবর্তের মধ্যে—

আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন, সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার, কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ;

কিন্তু যখনি এই তুচ্ছ ক্ষুদ্র জীবন তোমার স্পর্শ-রসে রসিয়া ওঠে, অমনি—

আমি জ্যোতিষ্মান্,
অক্ষয় যৌবন মম দেবতা সমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,···
সেথা মোর সভাসদ্,
রবিচন্দ্র তারা···

সেই পরম স্পর্শে ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করে—ক্ষুদ্র মরজীবন অমর হইয়া প্রেমের অমরাবতীতে চিরন্তন প্রণয়ীযুগ্মের সহিত একাসনে বিরাজ করিতে থাকে।

এই প্রেয়সী কে? ইহাকে জীবনদেবতা বলিলে অত্যন্ত ফিকা করিয়া দেওয়া হয়। ইহা একান্ত সুনিশ্চিত যে কোনো ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতিই কবিকে অনুপ্রেরণা দিয়াছে, কিন্তু ইহাও আবার তেমনি সুনিশ্চিত যে সেই স্মৃতির সহিত বহুল পরিমাণে জীবনদেবতার ভাবটি মিশিয়া গিয়াছে। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই, ব্যক্তিগত জীবন ও প্রেম দেখিতে দেখিতে বৃহৎ জীবন ও প্রেমে পরিণত হইয়া যায়। সীমাকে ও অসীমকে দুই কোঠায় কেমন করিয়া বাঁধিয়া রাখা চলে! কবির ভাষাতে—"আমি জড় নাম দিয়ে, সসীম নাম দিয়ে কোনো জিনিসকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই অনন্তের যে প্রকাশ তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ।" জড়কে জড়, সীমাকে সসীম করিয়া তিনি রাখেন নাই, ইহা মনে করিলে বুঝিতে পারা যাইবে কেমন করিয়া একটি সন্ধ্যার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহার কল্পনায় লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার পৃথিবীর কুমারী-দিবসের বিস্মৃত-স্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিল।

ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ননিমেষে
কত যুগ যুগান্তের অতীত আভাস
কত জীব জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।

সেই বাল্য নীহারিকা, প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা, এবং অবশেষে স্নিগ্ধ শ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে জীবধাত্রী জননীর কাজ, এই সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া সুপ্ত বিশ্ব-পরিবার গগনমণ্ডলে নিঃসঙ্গিনী ধরণীর অন্তর হইতে যে সুগম্ভীর ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর উঠিতেছে, তাহাও কবির প্রাণে প্রবেশ করিতেছে।

জীবনদেবতার ভাবটি কবির জীবনের নানা রসের অভিজ্ঞতার সহিত মিলিয়া বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের রসে মিশ্রিত হইয়া 'মানসসুন্দরী' কবিতার সৃষ্টি করিয়াছে। চিত্রাতেও এই শ্রেণীর কয়েকটি কবিতা আছে। 'জীবনদেবতা' কবিতাও এক হিসাবে প্রেমের বিকাশ কিন্তু তাহা সর্বতোভাবে জীবনদেবতাকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত। এবার যে কবিতাগুলির আলোচনা করিব তাহাতে ব্যক্তিগত প্রেম জীবনদেবতার ছায়াসম্পাতে অলৌকিক হইয়া উঠিয়াছে। 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতাটি। প্রেয়সী নিশীথে একান্তভাবে কবির, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত, বিশ্বের পটভূমি হইতে ছিন্ন হইয়া একজনের বাহুবন্ধনে সে প্রেয়সীমাত্র, সখীমাত্র। কিন্তু প্রভাতে তাহার আর-এক অপূর্ব মূর্তি, সে যেন তেমন ঘনিষ্ঠভাবে একজনের মাত্র নয়, ব্যক্তিগত সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তখন তাহাকে দর্শন।

দেবি, তব সীঁথি-মূলে লেখা
নব অরুণ-সিঁদুর রেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয়
তরুণ ইন্দুলেখা।

প্রাতঃকালে প্রেয়সী দেবী, বিশ্বের সহিত সে একাত্ম, তাই তাহার সীঁথির সিঁদুরে সূর্যের অরুণরাগ এবং হাতের শঙ্খে তরুণ চন্দ্রের আভাস অসম্ভব ব্যাপার নহে।

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরি,
প্রাতে কখন্ দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে।
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে।

রাত্রে যে রমণী প্রাণেশ্বরী, প্রভাতের পুষ্পলাবী সেই নারীই দেবী, তখন আর তাহাকে বলিবার উপায় নাই—

ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা
ধরেছি তোমার মুখে।

তখন আর না বলিয়া উপায় নাই যে—

সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে।

প্রিয়জনকে এই দুইভাবে দেখিবার আভাস সোনার তরীতেও আছে "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।" 'উৎসব' ও 'সান্ত্বনা' কবিতা দুটিও ব্যক্তিগত প্রেমের দ্বারা উদ্বোধিত।

কোনো কোনো কবিতায় কবির কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী কাব্যলক্ষ্মীর ভাবের সহিত জীবনদেবতার ভাবটি মিশিয়া গিয়াছে। মুস্কিল এই যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা কোন্ কবিতায় কোন্ ভাবটি কি পরিমাণে মিশিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করা যায় না। 'আবেদন' কবিতাটিতে কবি বহুজনবাঞ্ছিত পার্থিব ঐশ্বর্যের লোভ ত্যাগ করিয়াছেন, প্রার্থনা তাঁহার অতি সামান্য, "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।" 'সাধনায়' কবির কাব্যসাধনার কথা। জগতের বহু গুণী অনেক অর্ঘ্য, অনেক যন্ত্র, অনেক গান দেবীর সভায় উপস্থিত করিয়াছে। এই গুণীর সভায় কবি তাঁহার ব্যর্থ সাধনা লইয়া উপস্থিত; মনে আশা আছে সকলের নিকটে অবজ্ঞাত হইয়াও যদি দেবীর প্রসাদ লাভ করেন তবে তাঁহার সাধনা নিষ্ফল হইবে না। আর একটি কবিতা 'নীরব তন্ত্রী'। কবির বীণার একটি তার নীরব! যে-তারটিতে—

আমার হৃদয় বনের
যত মধুকর
ক্ষণেকে ক্ষণেকে ধ্বনিয়া তুলিত
গুঞ্জন স্বর।

সেই শ্রেষ্ঠ তারটি কবি দেবীর চরণে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাই—

এ বীণায় বাজে না কেবল
একখানি তার
আছে তাহা শুধু মৌন মহৎ
পূজা উপহার।

কিন্তু যেখানে জীবনদেবতার ভাবের সহিত অন্য কোনো ভাবের মিশ্রণ ঘটে নাই, সে-সব কবিতা কাব্যহিসাবে উচ্চ দরের নহে অন্তর্যামী ও জীবনদেবতার

আলোচনা উপলক্ষ্যে ইহা বলিয়াছি।" আর-একটি উদাহরণ 'সিন্ধুতীরে' কবিতাটি। সিন্ধুতীরের রমণী জীবনদেবতা ছাড়া আর কেহ নহেন। কবি এ কবিতায় যে অলৌকিক রহস্য সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সফল না হইবার একটি কারণ ইহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ তুচ্ছ বিষয়ের বর্ণনার বাহুল্য। রহস্যের প্রধান রস অজানার ভাব; এখন এই ভাব সৃষ্টি করিতে গেলে বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে ফাঁক রাখিয়া যাইতে হয়—পাঠক সেই ফাঁকগুলি কতক কল্পনায়, কতক আভাসে ভরিয়া তুলিয়া রহস্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু কবি যদি নিজেই উপযাচক হইয়া সমস্ত ফাঁকগুলি ভরিয়া দেন, তবে অজানা কিছুই থাকে না, পাঠকের মনে রহস্যের ভাব মোটেই উদ্রিক্ত হয় না। কীট্‌সের সেই দুইটি ছত্র—একটি বাতায়ন, সম্মুখে অপার ফেন-দুরন্ত সমুদ্র। বাস্, আর কিছুই নয়! পাঠকের মন নানা কল্পনায়, নানা আভাসে ইঙ্গিতে অমনি সেই রহস্যলোক নির্মাণ করিতে লাগিয়া যায়।

দ্বিতীয় কারণ, কবিতাটি পড়িতে পড়িতে স্পষ্ট অনুভব করা যায়, কবির মনে একটা কিছু তত্ত্ব অত্যন্ত জাগ্রত এবং কবি সে সম্বন্ধে একান্ত সচেতন। নর্তকী যখন নাচে, কিছু অলংকার, কিছু পরিচ্ছদ, সে দেহে বহন করে; তাহাও কতক্ষণ, যতক্ষণ তাহা নাচের সহিত তাল রাখিতে পারে। কিন্তু নৃত্যকে যদি বিজ্ঞাপনের সহায় করা হয়, ঐ উপলক্ষ্যে অলংকার ও বস্ত্রের নমুনা নর্তকীর অঙ্গে চাপাইয়া দেওয়া হয়, তবে জিনিসের কাট্‌তি বাড়িবার সম্ভাবনা থাকিলেও বারংবার তাল কাটিয়া যায়। অযথা অতিরিক্ত পরিমাণে তত্ত্ব এই কবিতাটিতে চাপানো হইয়াছে।

তৃতীয় কারণ, কেবল জীবনদেবতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন বলিয়া কবি উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টি এখানে করিতে পারেন নাই। যে কয়টি কবিতা একমাত্র জীবনদেবতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ, তাহাদের অন্য মূল্য থাকিলেও কাব্যমূল্য বেশি নহে। উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টির জন্য অন্য কোনো রসের উদ্বোধন তাঁহার প্রয়োজন; যেমন প্রেম, দেশপ্রীতি, কাব্যসাধনা ইত্যাদি।

এবার আমরা বৃহত্তর জীবনের আকাঙ্ক্ষা যে কবিতাগুলিতে স্পষ্টরূপে আছে তাহাদের আলোচনা করিব। 'স্বর্গ হইতে বিদায়'। যে স্বর্গ হইতে কবি বিদায় প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা নিজের কল্পনার বিশ্ববিহীন সুখৈকরস স্বর্গ। সুখের আয়োজন যেখানে সম্পূর্ণ, কিন্তু কিছুদিন বাস' করিলেই অন্তরাত্মা বিরক্ত হইয়া উঠে। এই রকম এক সুখসর্বস্ব স্বর্গ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কবি

মানসীর জীবন হইতে ছুটিয়া পালাইয়া ছিলেন। শিলাইদহের সোনার তরীর জীবনে, বৃহত্তর সংসারের বার্তা মাঝে মাঝে দূর হইতে পৌছিলেও বস্তুত তখনো তিনি সেই স্বর্গেরই অধিবাসী। স্বর্গের অবিমিশ্র সুখে মানুষ দীর্ঘকাল তৃপ্তি পায় না; নিবিড় সুখের মধ্যে থাকিয়াও তাহার মনে ব্যাকুলতা জাগিয়া ওঠে, এই ব্যাকুলতা বৃহত্তর জীবনের জন্য। সুখ যেখানে অবিমিশ্র নয়, আরাম সেখানে স্বল্পই কিন্তু মানুষের মুক্তিও সেইখানেই নিহিত।

স্বর্গে তবে বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেম ধারা, অশ্রুজলে চির শ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

পৃথিবীতে সুখ দুঃখ দুই-ই আছে, সেই তো তাহার গৌরব, বস্তুত, স্বর্গে সুখ আছে কিন্তু আনন্দ নাই, আনন্দ একান্তভাবে পার্থিব। পৃথিবীতে পূর্ণতা নাই, কেবল তাহার আভাস; এই ভাবটি সোনার তরীর 'দরিদ্রা', 'অক্ষমা' প্রভৃতি কবিতায় আছে। "ভূতলের স্বর্গ খণ্ডগুলি"র পরিচয় কবি শিলাইদহের পল্লীজীবনে প্রথমে পাইয়াছিলেন। পৃথিবীর দীনতা ও মানব-জীবনের অসম্পূর্ণতার মাধুর্যই এই কবিতার চরম রস।

'স্বর্গ হইতে বিদায়ে'র বিশেষ রস যেমন সৌন্দর্যের স্বাভাবিক অসম্পূর্ণতা, 'উর্বশী'র বিশেষত্ব সৌন্দর্যের পরম পরিপূর্ণতায়। ইহাতে সৌন্দর্যকে একেবারে বিশ্বের পটভূমিতে স্থাপন করা হইয়াছে। উর্বশী তুমি, "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ"—সে মানসসুন্দরীর খেলার সঙ্গিনী, সখী, গেহিণী নহে, সে রাত্রের ও প্রভাতের প্রাণেশ্বরীও নহে। এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের কোনোই পূর্বাপর, কোনোই ইতিহাস নাই। সে—

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি,
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী।

এই সৌন্দর্য যেমন সমস্ত মনুষ্য-সম্পর্কের বাহিরে, তেমনি আবার ইহা সমগ্র কালেরও অতীত—

যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী।

এই সৌন্দর্য যতই পরিপূর্ণ, যতই দেশকালাতীত হউক না কেন, তবু ইহার মধ্যে কোথায় যেন একটুখানি অশ্রুর আভাস আছে। নতুবা এই পূর্ণ সৌন্দর্যও আমাদের তৃপ্তি দিতে পারিত না। এই যে একটুখানি খুঁৎ—ইহাতেই এমন সৌন্দর্যের শেষরক্ষা হইয়াছে। 'বিজয়িনী'তেও ঠিক এই ভাবটি। অচ্ছোদ সরসীনীরে স্নানার্থিনী সমস্ত মানবসম্পর্কের অতীত। এমন যে অক্ষোভণীয় রমণীয়তা তাহাকে কামনার সামগ্রী বলিয়া চিন্তা করাই চলে না, কাজেই—

পুষ্প ধনু পুষ্প শর ভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার।

ইহাতে যেমন সৌন্দর্যকে জীবন হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার প্রয়াস, '১৪০০ সাল' কবিতায় কবি নিজের জীবনকে বর্তমান কাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

'পূর্ণিমা' কবিতা। কবি পূর্ণিমা রাত্রে দীপালোকে বসিয়া সৌন্দর্যতত্ত্ব পড়িতে পড়িতে বিরক্ত হইয়া যেমনি প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন অমনি—

উচ্ছ্বসিত স্রোতে
মুক্ত দ্বারে বাতায়নে, চতুর্দিক হ'তে
চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি
ত্রিভুবন বিপ্লাবিনী মৌন সুধা হাসি।

একটি ক্ষুদ্র শিখা বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যকে আড়াল করিয়া রাখে। সেই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীবনের কথা। ক্ষুদ্র বৃহতের অনুবর্তী না হইলে এইরকমটি ঘটে।

সোনার তরীতে 'আকাশের চাঁদ' নামে একটি কবিতা আছে। ইহাতে কবি অত্যন্ত একটা অবাস্তব আকাশের চাঁদের জন্য জীবনটাকে মাটি করিতে বসিয়াছিলেন, কিন্তু চিত্রার 'সুখ' কবিতাতে বুঝিতে পারিলেন—

মনে হ'ল সুখ অতি সহজ সরল।

মানুষের চারিদিকে যে সুখে দুঃখে পূর্ণ জীবন আছে, আকাশের চাঁদ হইতে কবির দৃষ্টি নামিয়া, সহজ আনন্দে পূর্ণ সেই জীবনের প্রতি পড়িয়াছে।

৩

'এবার ফিরাও মোরে' বৃহৎ জীবনের জয়গানে অভিষিক্ত। আমাদের দেশের জনসাধারণ যে কত দরিদ্র, কত অসহায়, কত শিশুর মত, এবং

সেই জন্যই তাহাদের প্রতি কবির আগ্রহ, সহৃদয়তা ও শ্রদ্ধা কেমন, তাহার অনেক পরিচয় ছিন্নপত্রের পত্রে পত্রে আছে। একটি স্থান উদ্ধার করিয়া দিলাম।

"ঘরে ঘরে বাত ধরচে, পা ফুলচে, সর্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরচে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদচে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারচে না, এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য, দারিদ্র্য মানুষের বাসস্থানে কি সহ্য হয়? সকল রকম শক্তির কাছেই আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। প্রকৃতি উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা উপদ্রব করে তাও সই, শাস্ত্র চিরদিন ধরে যে উপদ্রব করে আসচে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না। —ছিন্নপত্র, ২০২

সম্মুখে যখন "কষ্টের সংসার, বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার" তখন কি বিমুখ হইয়া কবি আপনার কল্পনার কুঞ্জে বাস করিতে পারেন, জীবনের বিচিত্রতার জন্য যাহার স্বাদ, পরিপূর্ণ জীবনকে উপলব্ধি করা যাঁহার আদর্শ, তাঁহার নিকটে কল্পনার রাজত্ব যতই দুর্লভ হউক না কেন, শুধু তাহাতে তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। এই রকম এক অতৃপ্তির তাড়নাতেই একদিন তিনি গাজিপুরের মানসীর নিকুঞ্জবিলাস ত্যাগ করিয়া শিলাইদহের কর্মঘন জীবন বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কবি কল্পনার কুঞ্জ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু কল্পনাকে নহে। কারণ—

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে,
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি।

যে দিব্যকল্পনা একদিন তাঁহাকে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের নন্দনলোকে উর্বশীর সমীপে লইয়া গিয়াছিল, সেই কল্পনাই তাঁহাকে শতদুঃখে জীর্ণ সংসারের মধ্যে, একেবারে সংসারের আত্মার মধ্যে লইয়া চলিয়াছে। ইহাই কবির কর্ম-প্রয়াণ। কাজের লোক তথ্য অবলম্বন করিয়া সংসারের সুখ দুঃখের চতুর্দিকে ঘুরিয়া মরে, কবি কল্পনার সাহায্যে একেবারে তথ্যের অন্তরশায়ী সত্যের সন্ধান লাভ করেন।

কবি জমিদারি পরিচালনা করিতে গিয়া দেশের লোকের প্রকৃত জীবনের পরিচয় পাইলেন, সে জীবন কত অভাবের দ্বারা ক্ষীণ, এবং বৃথা অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ। আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের সংকীর্ণ পরিধিতে আরামে থাকা যায়, কিন্তু তাহা তো নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া, সত্যভাবে নিজেকে জানিতে হইলে বৃহত্তর জীবনের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের সম্বন্ধটি জানা আবশ্যক। তাই—

কবি, তবে উঠে এস, যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই কর আজি দান।

কবি তো উঠিয়া আসিলেন, কিন্তু এত রকম অভাবের মহামারীর মধ্যে কি তিনি দান করিবেন! কোনো তুচ্ছ দান নহে; প্ল্যান, দরখাস্তবৃত্তি কিছুই নহে। একটা আত্মবিস্মৃত জাতিকে আত্মবিশ্বাস দান করার মতো আর কি বড়ো কাজ আছে? সত্য কথা বলিতে কি আর কিই-বা তাঁহাকে দেওয়া যায়; এই আত্ম-বিশ্বাসের উদ্বোধন করিবার সংকল্পই তাঁহার সমস্ত সামাজিক, রাজনীতিক সন্দর্ভ-গুলির প্রাণ। একবার এই আত্মবিশ্বাস জাগরিত হইলে, কোনো প্ল্যান বা প্রোগ্রামের জন্য বাধে না। উহা যে কোনো লোক দিতে পারে, কিন্তু আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, এক কথায় প্রাণ, একমাত্র দিতে পারেন কবি।

এখন আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাগাইয়া দিবার কি উপায়? উপায় আর কিছুই নহে। একবার অতীত-বিমূঢ় জাতির সম্মুখে বৃহৎ পৃথিবীর বাতায়নটা খুলিয়া যাক, সে দেখুক, জীবনের সেইসব অকৃতী দুঃখাভিসারী মহাপুরুষের দল, কেহ বা স্বেচ্ছায় "পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী" কেহ বা "মৃত্যুর গর্জন শুনেছে সে সংগীতের মতো।" কাহাকেও বা "বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে।" যে মহা আদর্শের জন্য এত দুঃখের সহন, এত কঠোরতার বহন, সেই অত্যুচ্চ আদর্শের ছায়াখানিও যদি একবার এই আত্মবিমূঢ় জাতিটার চক্ষে প্রতিভাসিত হইয়া ওঠে, তবে আর ভয় নাই। এই মহা আদর্শকে কবি কর্মীর দৃষ্টিতে এমন কি সাধকের দৃষ্টিতেও দেখেন নাই। তিনি কবির দৃষ্টিতে এই আদর্শকে দেখিয়াছেন, কাজেই এই মহা আদর্শ এখানে সৌন্দর্যপ্রতিমা; বিশেষভাবে ইহার সৌন্দর্যের দিকটাকেই দেখানো হইয়াছে। জীবনের উচ্চতম ধারণা সৌন্দর্যরূপে কবির ধ্যাননেত্রে প্রকাশিত।

এই যে আইডিয়া, ইহা কেবল একটা শৌখীন কবিকল্পনামাত্র না হইয়া কবির নিকটে কঠোর সত্যরূপে দেখা দিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা সমসাময়িক গদ্য-প্রবন্ধগুলিতে পাই। "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখ" এবং "এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুক" অন্তর বাহিরের তাড়ায় অস্থির। একদিকে সামাজিক আচার-সর্ব্বস্ব শাস্ত্রের বন্ধন, বাহিরে নানাপ্রকার ছোটো-বড়ো রাজার আস্ত্রিক তাড়না, এই দুই জাতীয় অত্যাচারে দীন দরিদ্র প্রজাগণ লাঞ্ছিত! কিন্তু এই দুই রকম অত্যাচারের মূল এক। প্রজাদের আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস। আর কিছুই নয়, একবার শুধু—

ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে।

একবার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাগিলে—

তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মত সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।

১৩০২ সালে কবি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে চরিত্রচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিদ্যাসাগরকে অটল মনুষ্যত্বের, অচল আত্মবিশ্বাসের আদর্শস্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন।

"আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি, এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মত দুর্গম বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য-বীর্য মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব, এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।"

কবি দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

সাতকোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করি মানুষ কর নি।

কিন্তু বিদ্যাসাগরকে তিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম-স্বরূপ দেখিয়াছিলেন—

"মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চারকোটি বাঙালী নির্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।"

—বিদ্যাসাগর-চরিত

কবির চক্ষে—এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।

বিদ্যাসাগর তো হইলেন পূর্ণ মনুষ্যের আদর্শ। এখন দেখা যাক এই তার্কিক জাতির নিষ্ফল তর্কপ্রিয়তা-সম্বন্ধে কবির কি মত। তর্কের দ্বারা ছোটকে বড়ো, বড়োকে নিরর্থক প্রমাণ করা যায়, এবং প্রমাণ করা যায় যে একিলিস ও কচ্ছপের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাবে কচ্ছপই জয়ী।

"কিন্তু এই কুতর্কে তার্কিক অসীমভগ্নাংশের হিসাব ধরিয়াছেন, কড়া ক্রান্তি দন্তি কাকের দ্বারা তিনি ঘরে বসিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, কচ্ছপ চিরদিন অগ্রবর্তী থাকিবে। কিন্তু এদিকে প্রকৃত কর্মভূমিতে একিলিস একপদক্ষেপে সমস্ত কড়া ক্রান্তি দন্তি কাক লঙ্ঘন করিয়া কচ্ছপকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়।"

আমাদের এই কচ্ছপস্বভাবসুলভ-দেশে বিদ্যাসাগর কুতর্কচ্ছেদী একিলিস। এই অপরিমিত বন্ধন ও তর্কের ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে—

"সামাজিক আচার হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মনীতির ধ্রুব অনুশাসনগুলি পর্যন্ত সকলেরই প্রতি সমান কড়াক্কড় করাতে, ফল হইয়াছে, আমাদের দেশে সমাজনীতি ক্রমে সুদৃঢ় কঠিন হইয়াছে, কিন্তু ধর্মনীতি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ কড়াক্কড়ি করিতে গিয়া আমরা মানসিক যে স্বাধীনতা না থাকিলে পাপপুণ্যের কোনো অর্থই থাকে না, সেই স্বাধীনতা বলি দিয়া নামমাত্র পুণ্যকে তহবিলে জমা করিয়াছি।" —আচারের অত্যাচার, সমাজ

উক্ত গ্রন্থের সমুদ্র যাত্রা প্রবন্ধেও এই একই কথা আছে। আমরা মানসিক স্বাধীনতা হারাইয়াছি বলিয়াই "তর্কটা এই লইয়া যে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রসিদ্ধ না শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সমুদ্রযাত্রা ভালো কি মন্দ, তাহা লইয়া কোনো কথা নহে।"

৪

দেশের সাধারণ মানবজীবনের প্রতি একটা ঔৎসুক্য ধীরে ধীরে কবির মনে জাগিয়া উঠিতেছিল, সেই তাগিদেই তিনি এই সময়ে ছেলে-ভুলানো ছড়া সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এ ছড়াগুলিকে তিনি ঐতিহাসিকের হাতে সংগ্রহ করেন নাই, রসগ্রাহীর মন লইয়া করিয়াছিলেন। কিন্তু এগুলি যে-জীবনের প্রতিচ্ছবি সেই সরল শিশুসুলভ পল্লীবাসিদের প্রতি একাত্মতা অনুভব না করিলে এ ছড়াগুলি কখনই তাঁহার ভালো লাগিতে পারিত না।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় যে আগ্রহাতিশয্য কেবলমাত্র কাব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, উদ্ধৃত প্রবন্ধাংশ হইতে সেই ঔৎসুক্যের অপেক্ষাকৃত নিরেট গদ্যমূর্তি পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি।

কি নিজের অন্তর্লোক, কি নিরুদ্দেশ-সৌন্দর্যের লোক (দুইই অভিন্ন, কারণ এ দুইই বৃহৎ সংসার হইতে কবিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, এবং উভয়েরই রস পরিপূর্ণতার রস) হইতে মানবের বাস্তব জগতের বাহির হইয়া পড়িবার চেষ্টাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য। সোনার তরীতে এ চেষ্টা আভাসমাত্রে প্রকাশিত ছিল, এখানে তাহা আকাঙ্ক্ষার রূপ লাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রকৃত সংসারে সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়াতে কোন্‌জাতীয় কাব্যবস্তু কবির প্রতিভার অনুকূল তাহা কবি ক্রমশ বুঝিতে পারিতেছিলেন। মানসী পর্যন্ত কবির কাব্য যে অপরিণত তাহার প্রধান কারণ প্রতিভার অনুকূল কাব্যবস্তু কবি সব সময়ে ধরিতে পারেন নাই। প্রতিভা তখনই বেশ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, সমসাময়িক চিত্রাঙ্গদা, বিসর্জন, রাজা ও রানী প্রভৃতি নাটকগুলিতে তাহা পরিস্ফুট।

সোনার তরীতে প্রথমে তিনি নিঃসংশয়িত ভাবে অনুকূল কাব্যবস্তুর সাক্ষাৎ পাইলেন এবং ক্রমে নৈবেদ্য পর্যন্ত তাহা অধিকতর আয়ত্ত হইতে লাগিল। তারপরে কয়েক বৎসর, কোন্ দুষ্টগ্রহের অভিশাপে, অনুকূল কাব্যবস্তু হইতে কবি বিচ্যুত। বলাকায় পুনরায় পুরাতন কাব্যবস্তু নূতনভাবে ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছে।

চৈতালি

চৈতালি কাব্যখানি কবির চৌত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের লেখা। সোনার তরী ও চিত্রায় পদ্মার যে রূপ দেখি, ইহাতে পদ্মা সে পদ্মা নয়। ইহার পদ্মা বর্ষার নহে, শীত-শেষের; এখানে বর্ষার উদ্বেলতা স্তিমিত হইয়া শীতের শান্তি ও চৈত্রের শ্রান্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নহে; কবি এখানে আসল পদ্মা ত্যাগ করিয়া শাখানদী বাহিয়া লোকালয়ের

মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। চৈতালিতে ছোট নদীর সুর— যাহার কলগর্জন তীর-ভূমির লোকালয়ের কণ্ঠধ্বনিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় না; যাহার এপারে ওপারের তরুপল্লব ছুঁই-ছুঁই করে; যাহার উভয় কূলের প্রতিবেশীদের মধ্যে ঘাটে আসিয়া অনায়াসে কথাবার্তা চলে; ইহা আত্মীয়তার তরল সূত্র বিশেষ। ইহাতে নীর হইতে তীরের প্রাধান্য অধিক; লোকালয় এখানে লক্ষ্য— জলাশয় নহে। কবি নিজের অন্তর্লোক হইতে বাহির হইয়া এখানে জনসমাজের সহিত প্রেম ও জ্ঞানের সূত্রে মিলিত হইতেছেন। জ্ঞান ও প্রেম এই দুই অংশে হৃদয়ের পরিপূর্ণতা। মানুষের প্রতি প্রেমের পরিচয় তাঁহার পূর্ববর্তী কাব্যে দেখিয়াছি কিন্তু জ্ঞানযোগের অভাবে যে-প্রেম শূন্য ছিল এইবার তাহার আভাস দেখিয়া স্পষ্ট মনে হইতেছে কবির প্রতিভা সম্পূর্ণতার দিকে চলিয়াছে।

চৈতালিতে কবি শুধু যে লোকালয়ের সহিত ব্যক্তিগতভাবে মিলিত হইতে পারিয়াছেন তাহা নহে; এতদিন তিনি পদ্মার বক্ষে থাকিয়াও পদ্মাকে নিকটতম ভাবে পান নাই— তাহাকে তিনি যথার্থভাবে লাভ করিলেন, এইখানেই। বড় নদী যেন একখানা মহাকাব্য— তাহাকে আয়ত্ত করা যায় না; শাখানদী একটি লিরিক কবিতার মতো— দুইবার আনাগোনা করিলেই মুখস্থ হইয়া যায়। কবির কথাই শোনা যাক—

"পদ্মার মতো বড়ো নদী এতই বড়ো যে, সে যেন ঠিক মুখস্থ ক'রে নেওয়া যায় না, আর এই কেবল ক'টি বর্ষামাসের দ্বারা অক্ষর-গোনা ছোটো বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ ক'রে আমার হয়ে যাচ্ছে। পদ্মানদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইচ্ছামতী মানুষ-ঘেঁষা নদী; তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের কর্মপ্রবাহের স্রোত মিশে যাচ্ছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী।"

শুধু তাই নহে, একান্তভাবে ভালোবাসিবার নদীও ইহাই। ফরাসী লেখক জুবেয়ারের একটি বচন আছে— ভগবান এতই বিরাট যে তাঁহাকে খণ্ড করিয়া না লইলে আমরা ধারণা করিতে পারি না। নদী সম্বন্ধেও এই একই কথা। কবি এই শাখানদীতে আসিয়াই পদ্মাকে প্রেয়সীরূপে সম্বোধন করিতে পারিয়াছেন। নদীতীর ও নদী উভয়ের সঙ্গেই তাঁহার সম্বন্ধটি এখানে ব্যক্তিগত।

শ্রেণীগত হিসাবে চৈতালি পূর্বের কাব্য দুখানি হইতে স্বতন্ত্র নহে— কেবল ইহা ঐ দুখানি গ্রন্থ হইতে খানিকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পূর্বে

যাহা কেবল সামান্যত সত্য ছিল এখানে তাহা বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে ছিল "ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি"র জন্য আকাঙ্ক্ষা, এখানে তাহার পরিচয়।

ইহাতে পূর্বের ভাবের আবেগ, কল্পনার মাধুর্য, আসক্তির তীব্রতা কিছুই নাই, তবু ইহা পরিপূর্ণতা ও পরিপক্কতার গভীর মাধুর্যে স্নিগ্ধ ও কর্মাবসানের সার্থকতায় নীরব।

সেই কারণেই চৈতালির ভাবের বাহন সনেট। লিরিক কবিতা উদ্বাহিত নদীর স্রোতের মত— তাহাতে তীব্রতা আছে, আবেগ আছে, তাহার প্রধান ধর্ম দ্রুতি বা চলতা। তাহা দিয়া চৈতালির আসক্তিহীন ভাবগুলি প্রকাশ করা চলে না। লিরিক যদি প্রবাহিত নদীর স্রোত, সনেট সেই নদীর হিম-কঠিন তুষার, নিতান্তই স্থিতিধর্মী। তাহাতে সুবিধা এই— সনেট বেশ ভাবিয়া-চিন্তিয়া রহিয়া-বসিয়া অবসরমত লেখা চলে, তাহাতে লিরিকের ত্বরা নাই। সনেট স্থপতিবিদ্যার সগোত্র, লিরিক সগোত্র সংগীতের। সেইজন্য যাঁহারা শ্রেষ্ঠ লিরিক কবি, সংগীত যাঁহাদের বাহন, দ্রুতি বা চলতা যাঁহাদের ধর্ম, তাঁহারা অনেক সময়ে উচ্চদরের সনেট-রচয়িতা নহেন, যেমন শেলি, সুইনবার্ন, রবীন্দ্রনাথ। চৈতালির অনেকটা মন্থর ভাব, তাহা বর্ষার পদ্মার মত অত্যন্ত সচল নহে, শীত-শেষের পদ্মার ন্যায় অনেকটা স্তিমিত— কাজেই সনেট এখানে স্বভাবতই ভাবের বাহন হইয়া পড়িয়াছে। একই কারণে নৈবেদ্য কাব্যও সনেটবহুল। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ সনেট-লিখিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁহার কাব্য স্থাপত্যের ন্যায় স্থিতিশীল— তাহা যেন খণ্ড খণ্ড শ্বেত পাথরের দ্বারা গঠিত অখণ্ড একটি সুগঠিত অট্টালিকা। সনেটের গঠনের একটি অমোঘ নিয়ম-কৌশল আছে রবীন্দ্রনাথ সেদিকে মোটেই দৃষ্টি দেন নাই—মিল ও শ্লোক-বিভাগ তাঁহার ইচ্ছাকৃত। মাইকেল এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান ও কৃতার্থ; কিন্তু আবার ভাববৈদগ্ধ্যে রবীন্দ্রনাথের সহিত মাইকেলের কোনোই তুলনা চলে না।

চৈতালিতে যে ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতা আছে সেইগুলি এখন আলোচনা করিব। প্রথম কবিতাটি 'উৎসর্গ'— ব্যক্তিগত প্রেম ইহার বিষয়বস্তু হইলেও, এই কাব্যখানির মূল সুরটি ইহাতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কবিতাটিতে একটি আসক্তিবিহীন সার্থক সম্পূর্ণতার ভাব আছে— কাব্যখানিরও মূল সুর ইহাই।

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।

সোনার তরী ও চিত্রাতে যে অপূর্ব ভাবোচ্ছ্বাস তাহা এই দ্রাক্ষাকুঞ্জের ফুলের মদির গন্ধে এবং সৌন্দর্যে, ভ্রমরের গুঞ্জনে এবং দক্ষিণ-বাতাসের অকারণ চাঞ্চল্যে; সমস্ত কানন উন্মথিত। তাহাতে আসক্তির তীব্রতা এবং অসম্পূর্ণতার আসক্তি। কিন্তু এখানে দেখি— ফুলগুলির ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ হইয়া

রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল।

যতদিন ফুল ছিল, তাহা একান্তভাবে আমারই ছিল, আমাকে লইয়াই তাহার সার্থকতা— কিন্তু আজ তাহার সফলতা আমাতে নাই। আজ তুমি ইহা লইয়া কি করিবে তাহা জানিতে চাহি না— তুমি খুসি হইয়া হাতে লইবে, ইহাই যথেষ্ট।

লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকলসম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব-সমর্পণ ;...
শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি ফেল বৃন্তগুলি—

এই নীরবে নিতান্ত অবনত প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত উদার ত্যাগের ভাব আছে—প্রেমের পরিণতির ত্যাগ—মানস-সুন্দরীর ঘনিষ্ঠ আসক্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

এই 'তুমি' কে, ইহা লইয়া নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে। অনেকে 'জীবনদেবতা' বলিয়া সহজে এবং সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন; জীবনদেবতা বা ভগবানের মারফতে অনেক জটিলতা সরল করিয়া ফেলা যায়, কিন্তু রসবোধ সন্তুষ্ট হয় না। এই 'তুমি' যে কে, বাস্তবিক সে প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং কবিও আর দিতে পারিবেন না। একটি কবিতা লিখিবার সময় কবির অন্তর্লোকে যে সহস্র ভাবের আলো-ছায়াপাত হইতে থাকে, অজস্র স্মৃতি ও অসংখ্য নরনারীর মুখচ্ছবি উদিত

হইতে থাকে, সেই সমস্ত হইতে বিশিষ্ট একজনকে বাছিয়া নাম করা নিতান্তই অরসিকের কাজ। বহু দিনরজনীর, বহু নরনারীর, বহু স্মৃতিবিস্মৃতির, বহু আশা-আকাঙ্ক্ষার, বহু ভালোলাগার একত্র ঘনীভূত সমাবেশ এই 'তুমি'।

সোনার তরীতে যেমন 'হৃদয়-যমুনা', চিত্রাতে যেমন 'চিত্রা', '১৪০০ সাল' চৈতালিতে তেমনি এই কবিতাটি, সর্বপ্রকার ভ্রমপ্রমাদ ও ত্রুটি-বর্জিত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে প্রধান দুইটি দোষ, সামান্য-কথন ও অতি-কথন, এই উভয় দোষ-বিমুক্ত ইহা একান্ত নিখুঁত। ইহাতে যে 'তুমি'-র উল্লেখ আছে তাঁহাকে একটি মাত্র বিশেষণে রূপ দেওয়া হইয়াছে— "শুক্তিরক্ত-নখরে বিক্ষত"। শুধু তাহাই নহে— বিশেষণের আলোকটি ওই লীলাচঞ্চল চম্পককলিকা-নিটোল অঙ্গুলিটির উপরে ফেলাতে সমস্ত মূর্তি, কেবল মূর্তি নহে, মূর্তির অন্তরে মনটি অবধি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এই 'শুক্তিরক্ত' বিশেষণটি শুধু নখর নহে, সুখাবেশে অন্যমনে বসিয়া দশন-দংশনে ফলগুলি ছেদন করিতে করিতে বহু স্মৃতির প্রগল্‌ভতায় কপোলে যে ক্ষণিক দ্যুতি জাগিতেছে তাহারও আভাস দিতেছে। আবার রাগ হইতে রক্ত— সেই দিক হইতে দেখিলে একটি মাত্র সুদূর বিশেষণের দ্বারা অনুরাগের ভাবটিও ইহাতে নাই এমন কথা বলা চলে না। শেষের শ্লোকটিতে আছে—

সারাদিন অশান্ত বাতাস
ফেলিতেছে মর্মর-নিশ্বাস,
বনের বুকের আন্দোলনে
কাঁপিতেছে পল্লব-অঞ্চল।

ইহা কি শুধু বনেরই কথা! সমস্ত সুখকে অতিক্রম করিয়াও যে একটি অতৃপ্তি থাকিয়া যায়, তাহাতেই কি এই মর্মর-নিশ্বাস পড়িতেছে না? এই মর্মর-নিশ্বাস কি তাহারই নহে? সমগ্র বনের সার্থক পরিপূর্ণতা আপনার আয়ত্তে পাইয়াও কেন যে অতৃপ্তি ঘোচে না! অঞ্চল শব্দটিতে আর কাহাকেও নহে, এই অঞ্চলবতীকেই প্রকাশ করিতেছে। বনের বুকে সমস্ত ফসল ফলাইয়াও যে আকাঙ্ক্ষা রহিয়া যায় তাহাতেই কি আন্দোলন নহে, আর সেই আন্দোলনেই কি অঞ্চলবতীর বুক কাঁপিতেছে না? কিন্তু অঞ্চল তো শুধু অঞ্চল নহে, তাহা 'পল্লব-অঞ্চল'— পল্লবের মতই কোমল, পল্লবের মতই অন্তরের মাধুর্যকে

আচ্ছাদন করিয়া রহস্যময়। শেষের শ্লোকে কি কবি নিজেকেই বনের সহিত একাত্ম করিয়া ফেলেন নাই— বনের মধুকের আন্দোলন কবিরই বুকের; মর্মর-নিশ্বাস, তাঁহারই গভীর অতৃপ্তির। কবিতাটি আকারে ক্ষুদ্র বলিয়া পাঠকের দৃষ্টি এড়ায়, কিন্তু ইহা রবীন্দ্রনাথের অতিশ্রেষ্ঠ কয়েকটি কবিতার অন্যতম।

'উৎসর্গ' সম্বন্ধে যাহা বলিলাম চৈতালির প্রেমের কবিতাগুলিতে তাহা প্রযোজ্য। উদ্দামতা কাটিয়া গিয়া যৌবন প্রায় শেষ হইয়া আসিল এমন একটা সকরুণ ভাব দেখা দিতেছে। কবিতাগুলি যেন গোধূলির ছায়াতে আচ্ছন্ন। তার পরে, পল্লীগ্রামের দুইটি রূপ আছে— এক, বর্ষার পল্লী, খরস্রোতের দুর্দামতায়, আর এক, শীত-শেষ ও চৈত্রের পল্লী, ক্লান্তি ও করুণায় ভরা। অন্তরে যেমন কবির যৌবনশেষের সকরুণ অবসাদ, বাহিরে আবার চৈতালির সময়কার সফল ক্লান্তি। এই কাব্যের আবহাওয়া এমনিতরো ম্লায়মান।

'গীতহীন,' 'আশা,' 'স্বপ্ন,' 'পল্লীগ্রামে,' প্রভৃতি কয়টি কবিতাতেই লক্ষ্য করা যায় প্রিয়ার স্মৃতি লইয়াই কবি সন্তুষ্ট, কারণ কোথাও কবিপ্রিয়ার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধের কোনো চিহ্ন নাই। কিন্তু কবির প্রেয়সী যে-সব কবিতায় স্বয়ং আবির্ভূতা সেখানেও আর পূর্বের তীব্রতা লক্ষিত হয় না; 'অসময়ে' আছে—

> এমন সময়ে হেথা বৃথা তুমি প্রিয়া
> বসন্তকুসুমমালা এসেছ পরিয়া;...
> তোমারে হেরিয়া তারা হতেছে ব্যাকুল,
> অকালে ফুটিতে চাহে সকল মুকুল।

আর সে দুর্জয় ভাবাবেগ নাই— কেবল 'অকালে ফুটিতে চাহে সকল মুকুল', এইটুকুমাত্র। 'গান' কবিতাটিতে খানিকটা ভাবাবেগ আছে— কিন্তু তাহা 'হৃদয়-যমুনা,' বা 'মানস-সুন্দরী'র তুলনায় নিতান্তই ফিকা।

এই পর্য্যায়ে কতকগুলি কবিতা নারীর সৃষ্টি এবং রহস্য বিষয়ে— তাহাতেও এই একই ভাব। মানস-সুন্দরী একান্ত ভাবে কবির কল্পনার ধন, নিজের সৃষ্টি, উর্বশী কাহারো সৃষ্ট নহে, 'আপনাতে আপনি বিকশি' সে ফুটিয়াছে। এতদুভয়ই অতিবাদ। কিন্তু এখানে দেখি ভাবকেন্দ্র বেশ মধ্যস্থতা লাভ করিয়াছে।

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।

মানব-সমাজের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হওয়াতে কবি বুঝিতে পারিয়াছেন—

অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।

এই যে সৃষ্টি ইহা মনেরও বটে, মানবেরও বটে, অন্তরেরও বটে, বহির্জগতেরও বটে, নহিলে সে কি এমন ভাবে উভয় লোককে মুগ্ধ করিতে পারিত!

তুমি এ মনের সৃষ্টি তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।
যখন তোমারে হেরি জগতের তীরে
মনে হয় মন হতে এসেছ বাহিরে।

বাস্তবিক নারীর রূপ বাহিরের কি অন্তরের, মাঝে-মাঝে তাহাতেই সন্দেহ উপস্থিত হয়।

নানা ভাবাধিক্যের ঘাত-প্রতিঘাতে কবির কল্পনা যে একটি দিব্য সমতা লাভ করিতেছে, অন্তর ও বাহিরের একটি সমন্বয় সন্ধান করিতেছে, এই কবিতাগুলি সেই পরিচয় বহন করে। এই রকম সমতাদ্বারা কবি শুধু যে প্রিয়াকে সত্যভাবে জানিতেছেন তাহা নহে, তাহাকে সত্যভাবে জানিতে গিয়া জগতেরও প্রকৃত রূপ জানিতে পারিলেন।

যখন তোমার 'পরে পড়েনি নয়ন
জগৎ-লক্ষ্মীর দেখা পাইনি তখন।

গৃহলক্ষ্মী কোন্ মায়ামন্ত্রবলে জগৎ-লক্ষ্মী হইয়া উঠিল! সেই পুরাতন কথা! জড় ও জীবকে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎকে কবি বিচ্ছিন্ন কোঠায় ঠেলিয়া রাখিতে পারেন না। সীমার মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনা!

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

কেবল যে জগৎকে সত্যভাবে বুঝিতে পারিতেছেন তাহা নহে, প্রিয়ার মুখপদ্মে স্বয়ং জগৎপতি আত্মরূপ দর্শন করিতেছেন—

নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্ব-ভূপ
তোমা মাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ।

চৈতালিতে একজোড়া কবিতা আছে; 'প্রথম চুম্বন' ও 'শেষ চুম্বন'। সন্ধ্যাকালে প্রেমিকযুগলের প্রথম চুম্বন, শেষরাত্রে তাহাদের শেষ চুম্বন। প্রেমের এই ছবি দুখানি একান্তভাবে প্রণয়ীযুগলের হইলে তাহার কোনো সার্থকতা ছিল না— এই দুটি ছবিকেই সন্ধ্যায় বিশ্বের ও প্রাতে সংসারের পটভূমিতে দেখানো হইয়াছে। শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে নক্ষত্রসভা এবং প্রণয়ীযুগল বুঝিতে পারিল, কেহই একক নহে, বৃহৎ একটা সংসার অদূরে রহিয়াছে এবং সকলেই একপরিবারভুক্ত।

প্রভাতের কর্মঘন সংসার প্রণয়ীযুগলকে বিচ্ছিন্ন করে বটে, কিন্তু সংসারে বিচ্ছেদ আছে বলিয়াই তো প্রেম মধুর এবং সেই বিচ্ছেদের অন্তে সন্ধ্যায় চুম্বন এত নিবিড়।

মৃত্যু যে প্রেমকে মুছিয়া ফেলে না, মৃত্যুও যে জীবনের স্বাভাবিক একটা অঙ্গ— এ সত্যটা কবি এমন স্পষ্টভাবে ইতিপূর্বে বুঝিতে পারেন নাই। জীবনের সহিত ঘনীভূত পরিচয়েই বিচ্ছেদকে মৃত্যুকে জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে বুঝিতে পারা গেল।

প্রথম মিলন-ভীতি ভেঙেছে বধূর,
তোমার বিরাট মূর্তি নিরখি মধুর।

ইহাতে সোনার তরীর প্রতীক্ষার ভীতিবিহ্বল আকুলতা নাই।

সে ছিল আরেকদিন এই তরী 'পরে,
কণ্ঠ তার পূর্ণ ছিল সুধাগীতিস্বরে।

কিন্তু—

আজি সে অনন্ত বিশ্বে আছে কোন্‌খানে
তাই ভাবিতেছি বসি সজলনয়ানে।

এই ভাবনার উত্তরের খানিকটা আভাস যেন পাওয়া যায়—

যেন তার আঁখি দুটি নবনীল ভাসে
ফুটিয়া উঠিছে আজি অসীম আকাশে।

জগতের সমস্ত সৌন্দর্যে প্রিয়ার একটা-সংহত সৌন্দর্য পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যে বৃহত্তর জীবনের আভাস ইতিপূর্বে পাইয়াছি চৈতালিতে আসিয়া তাহা যে শুধু গভীরতর, পরিব্যাপ্ততর হইয়াছে এমন নহে, তাহাতে আরো দুটি নূতন ভাবের ধারা সংযুক্ত হইয়া প্রশস্ততা লাভ করিয়াছে। পূর্বে এই বৃহৎ জীবনে দেশের দৈন্যদুঃখের জন্য কাতরতা লক্ষ্য করিয়াছি, ইহাকে দেশপ্রেম বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাক। আরো একটা ভাব লক্ষ্য করিয়াছি, সংসারে যাহা কিছু মহার্ঘ, মহামূল্য, তাহাদের ক্ষণিকতায় এবং অসম্পূর্ণতায় কবির বৈরাগ্য উপস্থিত না হইয়া এই ক্ষণিক অসম্পূর্ণ জিনিসগুলিকে নিবিড়তর ভাবে উপলব্ধি করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা। এই দুইটি ভাবই এখানে আছে। দেশপ্রেমের স্রোতে কবি উজান বাহিয়া প্রাচীন ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই মানস-ভ্রমণের অনেক পরিচয় আছে চৈতালিতে। যে একাত্মকতা-বলে তিনি সংসারকে ভালোবাসিয়াছেন— মানব-সমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশে যে অবজ্ঞাত দীনতম দুর্ভাগার দল বসতি করে এবং যে জীবজন্তু-তরুলতার জগৎ বর্তমান— কবির আত্মভাব এতদুভয়ের প্রতি প্রসারিত হইয়াছে। অবশ্য এক হিসাবে, পশুপক্ষী-তরুলতা প্রকৃতির অন্তর্গত, এবং প্রকৃতির প্রতি-প্রেম নূতন নহে। কিন্তু এখানে তিনি ইহাদিগকে সেই প্রকৃতির অন্তর্গত করিয়া অর্থাৎ এক বৃহৎ ব্যাপারের অঙ্গভাবে দেখেন নাই; তাহারা স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করিতেছে, যেন তাহারা প্রত্যেকে এই মানবসংসারেই নিম্নতর দিকের সোপান-সমূহ; তাহাদের সম্বন্ধ যেন প্রকৃতি হইতে মানবের সহিত ঘনিষ্ঠতর— এই ভাবেই কবি তাহাদিগকে দেখিয়াছেন।

আরো একটি কথা। পূর্বের দুইটি ধারা বিপুলতর হইয়া যে নূতন দুইটি ধারার সৃষ্টি করিল, তাহাদের আর নূতন বলা চলে কই। বিশেষত, পূর্বেও তাহাদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য ইহাদিগকে নূতন বলিয়াই ধরিয়া লইব— কেননা তাহাদের রূপ এমন স্পষ্ট হইয়া পূর্বে দেখা দেয় নাই।

চৈতালিতে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়, পূর্বে যাহা সামান্যত সত্য ছিল এখানে আসিয়া তাহা বিশিষ্টভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাবরূপ ব্যক্তিত্ব তখনই পায়, বস্তুর সহিত আমাদের পরিচয় যখন নিকটতর প্রত্যক্ষতর সত্যতর হইয়া উঠে। পূর্বে কবির প্রেম ছিল মানবের জন্য; এখন তাহা সংহত ঘনীভূত হইয়া ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথমটা মনে হয় ইহা যেন প্রেমের অবনতি, কিন্তু বাস্তবিক প্রেমের পরীক্ষাই তো ইহাতে। তত্ত্বলোকবাসী মানবকে ভালোবাসা মন্দ নহে, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের প্রেমের দ্বারা তাহার যাচাই হওয়া দরকার। চৈতালির প্রেমের কবিতাগুলি পড়িলেই অনুভব করা যায় যে, কোনো মানসসুন্দরী বা জীবনদেবতার প্রতি সেগুলি লেখা নহে। এই কথা চৈতালির সব কবিতার ক্ষেত্রেই খাটে।

কবির মানবপ্রীতি এক পা অগ্রসর হইয়া মানবসমাজের অবজ্ঞাত শ্রেণীকে এবং আরো এক পা অগ্রসর হইয়া পশুপক্ষী এবং তরুলতাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। কবির যে-দৃষ্টি ইতিপূর্বে উর্বশীর মত ত্রিলোক-নন্দিনী ছবি আঁকিয়াছে— এখানে দেখি সেই দৃষ্টি অতি সাধারণ, এবং অত্যন্ত সাধারণ বলিয়াই, মনোযোগের দুয়োরানীর মত যাহারা দিনপাত করিতেছে, তাহাদের প্রতি করুণায় সজল। "সতীলোকে বসি আছে কত পতিব্রতা", তাহাদের কথা সকলেই জানে; "আরো আছে শত লক্ষ অজ্ঞাত-নামিনী", তাহাদের কথা কেহই জানে না— আর একজন আছে যাহাকে জানিয়াও লোকে নাম করে না—"তারি মাঝে বসি আছে পতিতা রমণী"— কিন্তু কবির কাছে তিনি অবজ্ঞাত নহেন।

নারী পতিতা হইলেই তাহার নারীত্ব লোপ পায়, একথা কবি বিশ্বাস করেন না। তাহারও হৃদয়ে সন্তানস্নেহ উজ্জ্বল, এবং নিজের সন্তান না থাকিলেও পরের সন্তানের মৃত্যুতে দুঃখ তাহার আপন সন্তানবিয়োগের মতই সুতীব্র। "দোকানীর খেলা-মুগ্ধ ছেলের" গাড়ি-চাপা পড়ার করুণ ক্রন্দনধ্বনিতে চকিত হইয়া কবি দেখিলেন—

> ঊর্ধ্বপানে চেয়ে দেখি স্খলিতবসনা
> লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাঁদে বারাঙ্গনা।

রুগ্ন সন্তানের প্রতি জননীর সতর্ক মমত্ব কত সাধারণ এবং সেই জন্যই কত তুচ্ছ।

বয়স বিংশতি হবে, শীর্ণ তনু তার
বহু বরষের রোগে অস্থিচর্মসার।

জননী তাহাকে কি যত্নের সহিত, সতর্কতার সহিত সেবা করিতেছেন! তাঁহার মনে কি আশা! সন্তানটিকে জননী পৃথিবীর জনতার প্রতি আসক্ত দেখিতে চাহেন, কেননা

যদি কিছু ফিরে চায় জগতের পানে,
এইটুকু আশা ধরি মা তাহারে আনে

দিদি কবিতাটিতে কেমন একটি সহৃদয় সকৌতুক ভাব। দিদির পিছনে ছোট ভাইটি আসিয়া, যতক্ষণ দিদি বাসন মাজে, স্থির ধৈর্যভরে বসিয়া থাকে। এবং অবশেষে

বাম কক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
ধরি শিশুকর ; জননীর প্রতিনিধি
কর্মভারে অবনত অতি ছোট দিদি।

এ ছবি কবি নিশ্চয় সহস্রবার বোটে বসিয়া তীরে দেখিয়াছেন— তাঁহার সেই দেখা সত্য হইয়াছে বলিয়াই আমরা এমন করিয়া ছবিটি দেখিতে পাই এবং এমন কৌতুকপূর্ণ করুণায় আমাদের হৃদয় ভিজিয়া ওঠে।

পূর্বে বলিয়াছি, চৈতালি কাব্যগ্রন্থ জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠতার পরিচয় বহন করে ; অর্থাৎ তাঁহার কাব্য ও জীবন নিতান্ত নিকটতম প্রতিবেশীর মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে— তাহাদের নৈকট্য এতই অধিক যে কাব্য অনেক সময় দৈনন্দিন ঘটনার সামান্য পরিবর্তন মাত্র। একখানি চিঠিতে পাই—

"মনে আছে সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরি করে আসাতে আমি রাগ করেছিলুম ; সে এসে তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে। এই বলে ঝাড়নটি কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোছ করতে গেল।"

—ছিন্নপত্র, শিলাইদা, ১৪ আগস্ট, ১৮৯৫

'কর্ম' কবিতায় ভৃত্যটি তিরস্কৃত হইয়া বলিতেছে—

"কালি রাত্রি দ্বিপ্রহরে
মারা গেছে মোর ছোট মেয়ে।"

এত কহি ত্বরা করি গামোছাটি কাঁধে ধরি
নিত্যকাজে গেল সে একাকী।

ইতর প্রাণীর জগতের প্রতি যে সহৃদয়তার উল্লেখ করিয়াছি সেই সম্বন্ধে একখানি চিঠিতে আছে—

"কাল আমি বোটে বসে জানলার বাইরে নদীর দিকে চেয়ে আছি এমন সময় হঠাৎ দেখি—একটা কি পাখি সাঁতরে তাড়াতাড়ি ওপারের দিকে চলে যাচ্ছে আর তারি পিছনে মহা ধর্ ধর্ মার্ মার্ মার্ রব উঠেছে। শেষকালে দেখি একটি মুরগী— তার আসন্ন মৃত্যুকালে বাবুর্চিখানার নৌকো থেকে হঠাৎ কি রকমে ছাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, ঠিক যেই তীরের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে অমনি যমদূত মানুষ ক্যাঁক ক'রে তার গলা টিপে ধরে আবার নৌকো করে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমি ফটিককে ডেকে বললুম আমার জন্যে আজ মাংস হবে না। এমন সময় ব—র পশুপ্রীতি লেখাটা এসে পৌঁছল— আমি পেয়ে কিছু আশ্চর্য হলুম। আমার তো আর মাংস খেতে রুচি হয় না।··· আমার বোধ হয় সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সর্বজীবে দয়া। প্রেম হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূলভিত্তি।"

—ছিন্নপত্র, পতিসর, ২২ মার্চ, ১৮৯৪,

কবির এই জীবে দয়া নিতান্তই হৃদয় হইতে উদ্ভূত— কোনো দার্শনিক মতবাদের ফলাফল নহে। ইহা তাঁহার স্বাভাবিক মানবপ্রেমের পরিণাম। এক জায়গায় পশুপক্ষী-তরুলতা বৃহৎ বিশ্বপ্রকৃতির সহিত অখণ্ড; সেখানে তাহারা বিস্ময় আকর্ষণ করে, করুণা বা সহৃদয়তা নহে, কিন্তু অন্য স্থানে "পাখিরাও যে কতকটা আমাদেরি মত—একটা জায়গা আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই"— সেখানে ইহারা অত্যন্ত অসহায়। এই পশুপ্রীতি কবির হৃদয়ের স্বভাব—

হৃদয় পাষাণভেদী নির্ঝরের প্রায়,
জড়জন্তু সবাপানে নামিবারে চায়।

মানুষ হইতে জড়তম পদার্থটি একসূত্রে গ্রথিত কিন্তু বিবর্তনের ফলে মাঝে মাঝে সেই সূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, বুদ্ধি সেই ছিন্ন সূত্র জোড়া দিতে পারে না— কিন্তু হৃদয়

মাঝে মাঝে ভেদচিহ্ন আছে যত যার
সে চাহে করিতে মগ্ন লুপ্ত একাকার।

এই ভাবটি ধরিতে পারিলে কবির পশুপক্ষী-প্রীতির সম্বন্ধটি সহজ হইয়া ধরা দিবে। পশুশিশু ও নরশিশুর মধ্যে প্রবেশ শুধু ভাষার, শুধু পরিচয়ের—এই সূত্রটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাই

দিদি মাঝে পড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়-ডোরে।

এই প্রীতি হৃদয়ের স্বভাব বলিয়া হৃদয় সহজেই পালিত মহিষকে পুঁটুরানী বলিয়া ডাকিয়া উঠে এবং বেদের মেয়ে কুকুরছানার সহিত নিজের ভাইএর মত খেলা করিতে পারে। বুদ্ধি দিয়া এই যোগ প্রমাণ করা চলে না; যখন অভিমানী ভেদজ্ঞানী বুদ্ধি হাসিতে থাকে তখন সহৃদয় কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া বলিতে হয়—

কোন্ আদি স্বর্গলোকে সৃষ্টির প্রভাতে
হৃদয়ে হৃদয়ে যেন নিত্য যাতায়াতে
পথচিহ্ন পড়ে গেছে, আজো চিরদিনে
লুপ্ত হয় নাই তাহা, তাই দোঁহে চিনে।

চিত্রার 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি' পদটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার। ভূতলের যে স্বর্গ তাহা খণ্ডিত এবং খণ্ডত্বেই তাহার বিশেষ রস। এই খণ্ড মুহূর্তগুলির, খণ্ড আনন্দগুলির জয়গানই চৈতালির অনেক কবিতার প্রাণ। এক শ্রেণীর লোক আছেন, জীবনের এই ক্ষণিকতা ও ভ্রমপ্রমাদে জীবনের প্রতি যাঁহারা বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। রবীন্দ্রনাথ ঠিক তাঁহাদের বিপরীত।

"এ রকম ভেবে দেখলে, [জীবনের অনিত্যতাতে] কোনো কোনো প্রকৃতিতে বৈরাগ্যের উদয় হয়, কিন্তু আমার ঠিক উল্টোই হয়; আমার আরো বেশি করে দেখতে বেশি করে জানতে ইচ্ছা করে।"

—ছিন্নপত্র, সাহাজাদপুর, ১০ জুলাই, ১৮৯৪

যিনি জড়ে জীবে সীমায় অসীমে ভাগ করিয়া রাখিতে পারেন না, তাঁহার কাছে জীবন তুচ্ছ নয়, আর তাহা তুচ্ছ নয় বলিয়াই স্বয়ং জীবনেশ্বরকে জীবনের মধ্যে তিনি দেখিয়াছেন। সব দেশেই একদল লোক আছেন যাঁহারা জীবনকে

অতিক্রম করিয়া সত্যকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, আপাত-তুচ্ছতা যাঁহাদের নিকট অনন্তরহস্যপূর্ণ হইয়া ধরা দেয়।

এই জাতীয় লোকের নিকট জীবন দুর্লভ; বৈরাগ্যপ্রধান ব্যক্তি যখন জীবনটাকে চোখ বুজিয়া পার করিয়া দিবার চেষ্টা করেন, তখন কবি বলিতেছেন—

দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।

এ জীবনের ক্ষুদ্রতম মুহূর্তটিও যেমন ব্যর্থ নয়, তেমনি ইহার দীনতম প্রাণটিও অবহেলার নয়-তাই আজ যে-লোকটার দিকে চাহিয়াও দেখিতেছি না, একদিন তাহার দিকেই সমস্ত জগৎ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া থাকিবে—

আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম,
সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।

এ যেমন ক্ষুদ্র মুহূর্তটি এবং ব্যক্তিটির কথা বলিলাম, তেমনি পৃথিবীর সৌন্দর্যরাশি সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে; জগতের অন্তঃশায়ী তত্ত্বের প্রতি কবির লোভ নাই, তিনি বলিতেছেন—

যে আলোক জ্বলিতেছে উপরে তোমার,
যে রহস্য দুলিতেছে তব বক্ষতলে,...
এ জগতে কভু তার অন্ত যদি জানি,
চিরদিনে কভু তাহে শ্রান্তি যদি মানি
তোমার অতলমাঝে ডুবিব তখন,
যেথায় রতন আছে অথবা মরণ।

যাঁহার কাছে জীবনের কোনো অর্থই তুচ্ছ নহে, তিনি অবশ্যই জীবনেশ্বরকে খুঁজিতে সংসার ত্যাগ করিবেন না। ভক্ত তাঁহাকে খুঁজিতে সংসার ত্যাগ করিলে তিনি বলিয়া থাকেন—

হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়।

কিন্তু সংসারে থাকিয়া কেমন করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইবে? বিশেষ কোনো পন্থা নাই, সংসারের কর্তব্য করিয়া, ইহারই প্রেমে প্রাণে সৌন্দর্যে এমন কি ভ্রমে উদ্বুদ্ধ হইয়া—কারণ জীবনের রহস্য

বড় শক্ত বুঝা।
যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা।

ভগবান তো জীবনের মধ্যেই আছেন—

জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।

কিন্তু একথা তো সকলে বোঝে না—সেই পণ্ডিতম্মন্য বিজ্ঞের দল মায়া বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া সমস্ত মনোযোগ ঐ মৃত্যুটার দিকেই আকর্ষণ করেন, এবং অন্তিমের ভয় দেখাইয়া মানুষের মন ভগবানের দিকে টানিতে চেষ্টা করেন। কবি ঐ শ্রেণীর লোককে মৃদু তিরস্কার করিয়া দুঃখের দিক্ হইতে আনন্দের প্রতি চক্ষু ফিরাইতে বলিতেছেন—

আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।

চৈতালির বিশেষত্ব, ইহাতে পূর্বের ভাবগুলি অনেকটা পরিমাণে দানা বাঁধিয়াছে। পূর্বে যে মানবপ্রীতি দেখিয়াছি, এখানে আসিয়া তাহা বিশেষ একটি দেশরূপ গ্রহণ করিয়াছে—সে দেশ তাঁহার স্বদেশ। এই স্বদেশ আবার প্রাচীন ও বর্তমান দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া আরো স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন ভারতের প্রতি মমত্ববোধ এমন প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহার কাব্যে ইতিপূর্বে দেখা দেয় নাই। বর্তমান ভারতের প্রতি মমত্ববোধ নানা আকারে তাঁহার গদ্যে ও পদ্যে আছে। তাঁহার মানবপ্রীতি যেমন ব্যাপ্ততর হইয়া ইতর প্রাণীর প্রতি ধাবিত হইয়াছে, তেমনি তাঁহার দেশের বর্তমান কালের প্রতি আগ্রহ হইতেই প্রাচীন কালকে জানিবার ঔৎসুক্য জাগিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের দুইটি বিষয় স্বভাবতই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কালিদাস ও তাঁহার কাব্য এবং তৎকালীন সরল সৌম্য জীবনযাত্রা। একটি অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত, অপরটি আধ্যাত্মিকতার সরলতায় সংযত। পরবর্তী কাব্যে দেখিতে পাইব, প্রথম ধারাটি বিস্তৃত হইয়া কল্পনার কল্পরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছে এবং শেষোক্তটি গভীরতর হইয়া নৈবেদ্যে পরিণত। কালিদাসের

প্রতি যে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই— বাল্য হইতেই কালিদাসের কাব্য তিনি জানিতেন। ভারতীয় সাহিত্য-সভ্যতার দিগন্তরে যে-সমস্ত মহাশিখর জাগ্রত, কালিদাস তাহাদের উচ্চতম; বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি যে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিকে অভিবাদন জানাইবেন ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

ঋতুসংহারে কালিদাস যে চরম ভোগের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা যেন দীর্ঘকাল তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই— বিশ্ব-বিস্মৃত ভোগের যে দারুণ পরিণাম তাহাই স্মরণ করিয়া যেন তিনি মেঘদূতের বিরহগাথা লিখিয়াছেন। কালিদাস একদিন বসিয়াছিলেন

প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্য-সিংহাসন 'পরে।

কিন্তু এই চরম সম্ভোগের মধ্যেই যে পরম অতৃপ্তি আছে তাহাই একদিন

ঊর্ধ্ব হতে একদিন দেবতার শাপ
পশিল সে সুখরাজ্যে, বিচ্ছেদের শিখা
করিয়া বহন;

একদিন যে

ছয় সেবাদাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি;

তাহারা সেদিন

ফেলিয়া চামরছত্র, সভাভঙ্গ করি
সহসা তুলিয়া দিল রঙ্গযবনিকা।

মিলনের আনন্দের দিনে সমস্ত বিশ্ব সংকুচিত হইয়া একখানি বাসর-ভবনে পরিণত হইয়াছিল—সেখানে

নাই দুঃখ, নাই দৈন্য, নাই জনপ্রাণী
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রানী।

কিন্তু যেমনি বিরহকালে ভোগীর দৃষ্টি নিজের দিক্ হইতে পৃথিবীর দিকে ফিরিল, অমনি

দেখা দিল চারিদিকে পর্বত কানন
নগর নগরী গ্রাম ; বিশ্বসভামাঝে
তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে।

কালিদাসের কাব্য-সম্বন্ধে কবি পরবর্তী কালে যে সমস্ত অনুপম রচনা লিখিয়াছেন, এই দুইটি কবিতা সংক্ষেপে তাহার বীজ বহন করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে, ঋতুসংহার ও মেঘদূতে যে মিলন ও বিরহের বার্তা আছে শকুন্তলায় যেন তাহা একত্র গ্রথিত।

দেশী বিদেশী সকল কবিদের মধ্যে কালিদাসের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক। ভাব ও ভাষার দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথ উজ্জয়িনীর কবির নিকট নানা ভাবে ঋণী। রবীন্দ্রনাথ ভারতকে উপলব্ধি করিয়াছেন সাধারণতঃ দুইটি উৎস হইতে— উপনিষদ্ ও কালিদাসের কাব্য। কালিদাসের কাব্য রবীন্দ্রনাথকে যেমন রস দান করিয়াছে এমন আর কিছুতেই দেয় নাই এবং এই মহাকবির কাব্য হইতে প্রাচীন কালের সভ্যতার, জীবনযাত্রার প্রকৃত আভাস লাভ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যসমৃদ্ধ জীবনযাত্রার, জনপদ ও নগরের, রাজসভা প্রভৃতির রূপটি কালিদাসের অমর কাব্য হইতে রবীন্দ্রনাথ সত্যভাবে দেখিয়াছেন। মন্দাক্রান্তা-স্রোত-বিধৌত মেঘদূতের সেই ভারত-খণ্ডটির প্রতি কবির কি ঔৎসুক্য !

"আবার সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী-গিরি-নগরীর নামগুলিই বা কি সুন্দর ! অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য, কৈলাস, দেবগিরি, রেবা, সিপ্রা, বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে।...মনে হয়, ঐ রেবা-সিপ্রা-নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে অবন্তী-বিদিশার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।"

—প্রাচীন সাহিত্য, মেঘদূত

সেই পরিণত শ্যামজম্বুকাননগুলির জন্য, সেই যেখানে বর্ষারম্ভে বলিভুক্ পাখিরা কুলায় বাঁধিতে সুরু করে সেই দশার্ণের জন্য, আর সেই শিপ্রাতটবর্তিনী উজ্জয়িনীর জন্য কবির কি গভীর আসক্তি ! প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রার মধ্যে যে সৌন্দর্যের অংশ রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত তীব্রভাবে আন্দোলিত করিয়াছে, কল্পনার আলোচনাকালে তাহা দেখিতে পাইব।

কালিদাস রঘুবংশে আদর্শ রাজচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং অবশেষে অগ্নিবর্ণের মত অচরিতার্থ নৃপতির হাতে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজবংশ কেমন করিয়া বিনষ্ট হইল তাহাও দেখাইয়াছেন। কালিদাসের আদর্শ রাজা রাজ্যকে তপস্যার মত গ্রহণ করেন, এবং গৃহস্থাশ্রম পালন করিয়া অবশেষে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে উপনীত হইয়া বনে প্রবেশ করেন—

ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্ব কেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলীতে আদর্শ রাজ-চরিত্র তপস্বিরাজ। যেখানে ইহার অন্যথা ঘটিয়াছে সেখানেই রাজ-চরিত্র আদর্শভাবে অঙ্কিত হয় নাই— বিশেষ তাঁহার ছোট রাজাগুলি প্রায়ই অত্যাচারী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা কবির কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করিতেছি, সুতরাং বিশদভাবে তাঁহার নাট্যসমূহে প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই।

প্রাচীন ভারতের তপোবনের ভাবটি রবীন্দ্রনাথের উপর অত্যন্ত বেশি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই তপোবনের প্রতি শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের নিকট করিয়াছেন। কালিদাস রাজসভার কবি হইলেও তিনি যেমন রাজসভাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, শ্লেষাঘাত করিয়াছেন তেমন কোনো মুনি-ঋষিও করেন নাই। কালিদাস যেমন তপোবনকে অন্তর দিয়া ভালোবাসিয়াছেন, শ্রদ্ধা করিয়াছেন— এমন অনেক মুনি-ঋষিই করেন নাই। তাঁহার সকল নাট্য ও কাব্যের পটভূমি অরণ্য। একথা রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধেও খাটে। সত্যকথা বলিতে কি, প্রাচীন ভারতের সভ্যতারই পটভূমি হইতেছে মহারণ্য ও তাহার মহাচ্ছায়া।

কালিদাসের রাজারা একটু অবসর পাইলেই বনে ঘুরিয়া আসেন। শকুন্তলায় তপোবন একজন নটের স্থান অধিকার করিয়াছে, বিক্রমোর্বশীতে কবি যতক্ষণ না কোনো-একটা উপলক্ষে পুরূরবাকে বনে আনিতে পারিয়াছেন ততক্ষণ তাঁহার শান্তি নাই। কুমারসম্ভবে তপোবনই ঘটনাস্থল— শুধু একবার রাজসভা মদনের রূপে সেখানে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিল— কবি তাহাকে দগ্ধ করিয়া ছাড়িয়াছেন। চৈতালির এই শ্রেণীর কবিতাগুলির প্রত্যেকটি ছবি কালিদাসের কোনো-না-কোনো কাব্যের আভাসে পূর্ণ।

যখন পড়ি

রাজা রাজ্য-অভিমান রাখি লোকালয়ে
অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নতশিরে
গুরুর মন্ত্রণা লাগি

দিলীপের সন্তানকামনায় গুরুর তপোবন-যাত্রার ছবি মনে পড়ে।

আবার

শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাতবায়ে, ঋষি-কন্যাদলে
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।

এই ছবিখানিতে কণ্বাশ্রমের সেই প্রভাতটির কথা কার না মনে পড়ে যেদিন সম্রাট্ দুষ্মন্ত অতিথিরূপে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রাচীন ভারত কবিতায় নগর ও তপোবনের দুইখানি ছবিতে তিনি তৎকালীন সভ্যতাকে উক্ত দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বাস্তবিক, এই দুই অংশের মধ্যে কোথাও বিরোধ নাই— নগরের পরিণাম তপোবন। যে রাজা একদিন প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করেন, যথাসময়ে তিনিই ভোগস্পৃহাকে ত্যাগে পরিণত করিয়া শান্ত তৃপ্ত মনে তপোবনে প্রবেশ করেন।

"একদিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধনমোচন, এই দুইই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব। সংসারমধ্যে ভারতবর্ষ বহু লোকের সহিত বহু সম্বন্ধে জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না,— তপস্যার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী। দুইয়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব নাই, দুইয়ের মধ্যে যাতায়াতের পথ, আদানপ্রদানের সম্পর্ক আছে, কালিদাস তাঁহার শকুন্তলায় কুমারসম্ভবে তাহা দেখাইয়াছেন।" —প্রাচীন সাহিত্য, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা যে কয়টি উপাদানে সৃষ্ট, তপোবন তন্মধ্যে অন্যতম। কালিদাসের কাব্যে এই তপোবন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা রবীন্দ্রনাথের চক্ষু এড়াইতে পারে নাই। শকুন্তলা-সমালোচনা উপলক্ষে কবি এই ভাবটির উপরে জোর দিয়াছেন।

"অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন তপোবন-প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই।"

—প্রাচীন সাহিত্য, শকুন্তলা

কালিদাসের নিকটে সচেতনভাবে কোনো সমস্যা ছিল কি না জানি না। আমাদের সমস্যা-সন্দিগ্ধ বিংশ শতাব্দীর চক্ষে অনাবিল কাব্যের মধ্যেও জটিল সমস্যা বাহির হইয়া পড়ে। কালিদাসের সকল কাব্যেই নরনারীর মিলনকে নানা ভাবে যাচাই করিয়া লওয়া হইয়াছে। কালিদাস যে তপোবনের মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রচার করিতেছিলেন, তাহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে তৎকালীন সভ্যতা ক্রমে প্রাচীন তপোবনের আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া অত্যন্ত নাগরিক হইয়া উঠিতেছিল। নরনারীর মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কটি কি রকম হওয়া বাঞ্ছনীয় এমন কোনো একটি আদর্শ হয়তো তাহার মনে ছিল। বিক্রমোর্বশীতে দেখি, উর্বশী লতা হইয়া গিয়াছেন। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়— পুরূরবা যে দৈহিকরস ভাবে উর্বশীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, নারীর আত্মাকে বাদ দিয়া কেবল তাহার জড়ত্বকে স্বীকার করিয়াছিলেন— যথার্থভাবে দেখিতে গেলে তাহা উর্বশীর লতাতে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কি? দেহস্তরে উর্বশী লতাপাতার সমান বই কি! বিরহের তপস্যার মধ্য দিয়াই অবশেষে পুরূরবা উর্বশীকে সত্যভাবে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবে তিনি এই সমস্যাটিকে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ঋতুসংহার কবির অল্পবয়সের রচনা— সে-বয়সে তিনি প্রেমের যথার্থ রূপটি ধরিতে পারেন নাই।

"যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয়, তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে, সেই জন্যই সে প্রেম অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না।" —প্রাচীন সাহিত্য, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা

এই ভাবটি চৈতালির ঋতুসংহার কবিতায় আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে কালিদাস সম্ভোগের কবি নহেন, তিনি প্রাক্-বিবাহ অনুরাগকে স্বীকার করিয়াও

তদপেক্ষা মহত্তর সার্থকতা, যাহা বিরহ এবং তপস্যার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া দেখা দেয়— কাব্যকে সেই প্রশান্ত বিরলবর্ণ পরিণামের দিকে লইয়া গিয়াছেন; সেই খানেই তাঁহার কাব্যের চরম কথা। কালিদাস অনাবশ্যক সম্ভোগের চিত্র আঁকেন নাই। কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গে সেই বিশ্বব্যাপী উৎসব। এই বিরহ-উৎসবেই কুমারসম্ভবের উপসংহার। চৈতালিতে দেখি—

তবে অবশেষে
ব্যাকুল সরমখানি নয়ন-নিমেষে
নামিল নীরবে, কবি চাহি দেবীপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।

কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গ অবধি মাত্র যে কালিদাসের লেখা— ইহার অপেক্ষা ভালো কারণ আর তাহার কি থাকিতে পারে!

"কুমারসম্ভব ও শকুন্তলায় কাব্যের বিষয় একই। উভয় কাব্যেই কবি দেখাইয়াছেন, মোহে যাহা অকৃতার্থ, মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত; দেখাইয়াছেন, ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই ধ্রুব এবং প্রেমের শান্ত সংযত কল্যাণ রূপই শ্রেষ্ঠ রূপ; বন্ধনেই যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় সৌন্দর্যের আশু বিকৃতি। ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্যা হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে, কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকন্যা অতিথিপ্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।" —প্রাচীন সাহিত্য, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা

ভারতবর্ষের পুরাতন কবিকে ভারতবর্ষের আধুনিক কবি যথার্থভাবে যে শুধু বুঝিতে পারিয়াছেন তাহা নহে, পুরাতন কবি নিগূঢ় প্রভাবের মত আধুনিক কবির সমস্ত সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বিচিত্র রসের উদ্বোধন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সনাতন যে আদর্শ, যাহা প্রাচীনও নয় নূতনও নয়, সেই বিরাট আদর্শ হইতে রসসংগ্রহ করিয়া দুই বনস্পতিরাজের মত ভারতবর্ষের আলোকোদ্ভাসিত অনন্ত আকাশে উভয়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একদিকে ভাবের যেমন ঐক্য, রচনা-কৌশলের তেমনি গভীর অনৈক্য। কালিদাস ছবির কবি, রবীন্দ্রনাথ সুরের; কিন্তু ইহাতেও আমার বক্তব্য স্পষ্ট হইল না— তবে কি রবীন্দ্রনাথে ছবি নাই; কালিদাসের ধ্বনিসামঞ্জস্য সুরের স্তরে পৌঁছায় নাই? তাহা নহে; রবীন্দ্রনাথেও ছবি আছে, কালিদাসেও সুরের অনুরণন আছে। কালিদাস ছবি আঁকিয়াছেন সংস্কৃত ভাষার নিরেট পাথরের খণ্ডগুলি সাজাইয়া সাজাইয়া— তাহা ছবি অপেক্ষা ভাস্কর্যের নিকটতর আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকিয়াছেন প্রাকৃত ভাষার লঘু শব্দসমন্বয়ে— তাহা ছবির অপেক্ষা গানের নিকটতর আত্মীয়; কালিদাসের ছবিগুলির দৈর্ঘ্য প্রস্থ গভীরতা আছে— রবীন্দ্রনাথে বড় জোর আছে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ। কালিদাস কীট্‌সের সগোত্র, রবীন্দ্রনাথ শেলির। কালিদাসের বিশেষত্ব তাঁহার ভাষার সংহতি, রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব তাঁহার ভাষার ব্যাপ্তি বা চলতা। সংগীত ও কবিতা প্রধানতঃ সময়কে অধিকার করিয়া থাকে— সুরের পর্দাগুলি ধীরে ধীরে খুলিয়া গিয়া আমাদের চিত্তকে স্বভাবতই অনতিদূরবর্তী পরিণামের মুখে সঞ্চালিত করিয়া দেয়, চলতাই তাহার ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের আর্টের ধর্ম ইহাই। ছবি বিরাজ করে প্রধানতঃ স্থানকে অধিকার করিয়া— একটিমাত্র দৃষ্টিনিক্ষেপে ছবির একদিক্ হইতে অন্যদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরাবর্তন করিয়া আমরা সে ছবি দেখিতে পারি—আমাদের চিত্তকে তাহা বর্তমানের কেন্দ্রেই ধরিয়া রাখে, তাহার ধর্ম স্থিতি। কালিদাসের আর্টের ধর্ম এই স্থিতি বা শান্তি।

সংগীত একটি ভাবের আভাস মাত্র দিতে সমর্থ, তাহার বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করিতে পারে না; ইহা আমাদের চিত্তে এক অননুভূত রসকে জাগাইয়া দেয়, কিন্তু সে রসের পরিণাম ও পারিপার্শ্বিক পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যও এই দুই লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত। উহা আভাসধর্মী; উহা রসবোধকে জাগাইয়া দেয়, তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে চিত্র অস্পষ্ট রেখামাত্রে অঙ্কিত, দুই-একটি টানে, ঘটনায় কথায় বৃহতের ইঙ্গিতমাত্র করে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য অতিদূর রহস্যের প্রতি একটি একনিষ্ঠ ব্যঞ্জনা, একটি সুবৃহৎ অঙ্গুলিনির্দেশ মাত্র।

উভয় কবিতে যদি এতই পার্থক্য, তবে কালিদাসের নিকটে এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে ঋণী? কালিদাসের নিকটে ঠিক নহে, সংস্কৃত কাব্যের

নিকটে, আর সংস্কৃত কাব্য বলিতে রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রধানতঃ কালিদাসই বুঝায়— তিনি ভাষার এই সংহতিগুণ পাইয়াছেন। বাংলা সাহিত্য বা বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে পাইয়াছেন ভাষার জড়ত্ব হইতে মুক্তি, ব্যাপ্তি বা চলতা— এক কথায় সেই সুরপ্রধান সাহিত্য হইতে পাইয়াছেন সুরের ধর্ম, আর কালিদাস হইতে লাভ করিয়াছেন ভাষার সংহতি, নিরেটত্ব। সন্ধ্যাসংগীত হইতে প্রধানতঃ মানসীর পূর্ব পর্যন্ত, এই ভাষার জড়ত্বমুক্তির, বৈষ্ণবকবিগণের প্রভাব ও মানসী হইতে কালিদাসের প্রভাব লক্ষিত হয়।

এই দুইটি বিপরীত প্রভাবের পরিণতি ক্ষণিকার ভাষায়। ক্ষণিকার ভাষা একান্ত ভাবে দেশজ— কিন্তু না তাহা সন্ধ্যাসংগীতের, না তাহা সোনার তরীর। সংস্কৃত শব্দ এবং দেশজ ক্রিয়াপদ প্রভৃতি এমন কৌশলে গাঁথা হইয়াছে যে, কোনো ব্যক্তি এই উভয় সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ না করিলে এমনটি সৃষ্টি করিতে পারিত না। আরো একটি উদাহরণ বলাকার ছন্দ ও ভাষা— তাহাতেও এই দুই সাহিত্যের প্রভাব পরমসুন্দর পরিণতি লাভ করিয়া আশ্চর্য কাব্যকলার সৃষ্টি করিয়াছে।

চৈতালিতে বর্তমান ভারত অথবা বঙ্গদেশ সম্বন্ধে পাঁচটি কবিতা আছে— স্নেহগ্রাস, বঙ্গমাতা, দুই উপমা, অভিমান ও পরবেশ; দুইটি বঙ্গমাতার প্রতি, তিনটি বঙ্গবাসীর পরনির্ভরতা, অনুকরণ-লালসা ও মানসিক জড়ত্বকে ব্যঙ্গ করিয়া। প্রথম দুইটিতে বাঙালী যে নিতান্তই নাবালক থাকিয়া গৃহকোণে জীবনযাপন করিতেছে এবং স্নেহশীলা বঙ্গমাতা তাহাতে প্রশ্রয় দিয়া সাতকোটি প্রাণীকে মানুষ করিয়া না তুলিয়া একান্তভাবে বাঙালী করিয়া রাখিতেছেন— এই বিষয়ে বঙ্গমাতার প্রতি কবির সাভিমান অনুযোগ। অপর তিনটিতে একদিকে এই সাতকোটি বাঙালী কেমন ভাবে আপন জড়ত্বে ও তন্ত্রমন্ত্র-সংহিতায় আবদ্ধ, অন্যদিকে বৃথা আস্ফালনে ও পরবেশে নিজের সেই আভ্যন্তরিক দৈন্য কিরকম করিয়া ঢাকিতে চাহিতেছে— এই বিষয়ে কবি তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়াছেন।

সব-শেষের জন্য যে কবিতাগুলি রাখিয়া দিয়াছি, তাহাতে দেখি অবসাদ ও বিষাদের সুর। চৈতালিতে কবিজীবনের একটি পর্ব যে অবসানের অভিমুখে আসিতেছিল, এই কবিতাগুলিতে তাহারই আভাস। এতদিন কবি পদ্মার বক্ষে থাকিয়াও পদ্মাকে ব্যক্তিগতভাবে দেখিতে পান নাই— চৈতালিতে আসিয়াই পদ্মা বিশিষ্ট একটি মূর্তি লইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

হে পদ্মা আমার

তোমায় আমায় দেখা শত শতবার।

পদ্মা যেমন বিশিষ্ট, ব্যক্তিগত হইয়া উঠিল, অমনি

তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরান।

কবি ও পদ্মার নিভৃত সম্বন্ধটি প্রণয়ীযুগলের— সে নির্জনতায় আর-কাহারো প্রবেশের সাধ্য নাই। তার পরেই কবির প্রিয় বিবর্তনবাদের কথা। যদি তিনি পরজন্মে এই পৃথিবীতে, এই পদ্মাতীরে ফিরিয়া আসেন, তখন কি জন্ম-পূর্বের এই স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিবে না! এই বিবর্তনের স্মৃতি মধ্যাহ্ন কবিতাটিতেও আছে— মধ্যাহ্নের নদীতীরের সৌন্দর্য দেখিয়া কবি বলিতেছেন—

ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে— জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে— মাতৃস্তনে শিশুর মতন—
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

এই মধ্যাহ্ন কবিতাটির বিশেষত্ব— ইহাতে এমন নিখুঁত খুঁটিনাটি বর্ণনা আছে যাহা চৈতালির বিশেষত্ব, হয়তো সংস্কৃতসাহিত্যের, কালিদাসের প্রভাবেও বটে; কিন্তু এমন নিখুঁত বর্ণনা করা কবির স্বভাব নহে— তিনি আভাসে ইঙ্গিতে ছবি আঁকিতেই ভালোবাসেন।

এই যে নদীর ব্যক্তিত্বের কথা বলিলাম— এই নদীপ্রকৃতির শান্তিময়ী প্রেয়সী ও শ্রেয়সী মূর্তির নিকট হইতে কবি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন; চৈতালিতে আসিয়া কবির জীবনের নদীমাতৃক পর্ব শেষ হইয়াছে।

যেমন সহজে সোনার তরী হইতে চিত্রা ও চিত্রা হইতে চৈতালিতে আসিয়াছি, কোথাও বড় রকম ছেদ নাই— চৈতালি হইতে বিদায় তেমন সহজ নহে। চৈতালিতে কবির নিভৃত অন্তরের মানসসুন্দরী পর্ব সমাপ্ত। ইহার পরবর্তী গ্রন্থে কবি ভারতবর্ষের বৃহত্তর এবং প্রাচীন জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এই সত্যটি, এই পরিবর্তনটি আভাসের মত কবির নিকটেও অনুভূত হইতেছিল— তাই এত বিদায়ের কাতরতা, তাই এই নির্জন লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিয়া লোকালয়ে

প্রবেশের বেদনা—এ লোকালয় ঠিক কলিকাতা বা বর্তমান ভারতবর্ষ নহে, ক্ষুদ্র নির্জন-নিবাস ও বর্তমানকে পশ্চাতে ফেলিয়া এইবার কবির প্রবেশ মহৎ কর্মের দ্বারা মহান ভাবের দ্বারা উদ্বোধিত বিরাট্ ভারতবর্ষের অতিপ্রাচীন, সভ্যতার ধ্যানসৌম্য জীবনযাত্রার মধ্যে।

কল্পনা

চৈতালির প্রসঙ্গে দেখিয়াছি কবি কি ভাবে সোনার তরী হইতে সুরু করিয়া পদ্মার প্রবাহে দেশের নাড়িটিকে এবং অবশেষে শাখা-উপশাখা নদ-নদীর মধ্যে দেশের শিরা-উপশিরাকে অনুধাবন করিয়া আসিতেছিলেন। সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, এই তিনখানি কাব্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনের সহিত দেশের লোকজীবন, পল্লীজীবনের মিলনের পরিচয় আছে। আবার অন্যপক্ষে, তাঁহার গদ্যপ্রবন্ধাবলীতে দেশের কর্মময় জীবনের প্রচেষ্টার ইতিহাস নিবদ্ধ। কিন্তু উভয়ত্র কবির দৃষ্টি বর্তমানের প্রত্যক্ষতায় সংকীর্ণ। এখন যে কাব্যগুলির কথা বলিব তাহাদের মধ্যে কবি বতমানকে অতিক্রম করিয়া গেলেন।

কথা, কল্পনা ও নৈবেদ্য ১৩০৪ হইতে ১৩০৮এর মধ্যে অর্থাৎ কবির ছত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসর বয়সে লিখিত।

এই কাব্যগুলিতে প্রত্যক্ষতঃ কোথাও পদ্মার চিহ্ন বা প্রভাব নাই বলিয়া মনে হয়, কবির পূর্বজীবনের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহারা স্বতন্ত্র এক পদার্থ। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। পদ্মা ও তাহার শাখানদী কবিকে বর্তমানের সহিত মুখোমুখী পরিচয় করাইয়া দিয়াছে। এখানে তাঁহার বিচিত্র জীবনের সুরু, শেষ নহে। স্বভাবতই এই বর্তমান হইতে তাঁহার দৃষ্টি অতীতের দিকে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। এই অতীত ভারতবর্ষকে জানিবার ইচ্ছা হইতেই কথা, কল্পনা ও নৈবেদ্যের জন্ম। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রত্যক্ষতঃ পদ্মার প্রভাব না থাকিলেও কবির চিত্তকে অতীতের দিকে প্রসারিত করিয়া দিবার পক্ষে পদ্মার প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে।

উপরি-উক্ত তিনখানি কাব্যকে এক পর্যায়ে ফেলা যায়— ইহাতে কবির অতীত ভারতে মানসভ্রমণের ইতিহাস লিখিত।

কল্পনাতে প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য-বিচিত্র কাব্য, পুরাণ ও জীবনের কথা, কথায় প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের বিশাল পটভূমিতে কর্মময় জীবনের, ও নৈবেদ্যে প্রাচীন ভারতের ধ্যানস্তম্ভিত গভীর অধ্যাত্ম-জীবনের কথা।

চৈতালিতে আসিয়া কবির জীবনের একটা পর্ব যে সমাপ্ত হইয়াছে তাহা এই কারণেই। পূর্ব-পর্যায়ের তিনখানি কাব্য প্রধানতঃ বর্তমানের প্রত্যক্ষ ভিত্তি ও ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরের উপর স্থাপিত। কল্পনা প্রভৃতি কাব্য তিনখানি পরোক্ষ কল্পনার অসীম ও বৃহত্তর অতীত জীবনের বিরাট্ পাদপীঠের উপরে দণ্ডায়মান। কিন্তু তাই বলিয়া বিচ্ছেদ আছে বলা চলে না; বর্তমান ও অতীতে যেটুকু প্রভেদ— অর্থাৎ সাধারণ লোকের চক্ষে— সেইটুকু মাত্র। কবির চক্ষে কালপ্রবাহ অখণ্ড; তাঁহার নিকটে ভারতের অতীত ও বর্তমানে যেমন বিচ্ছেদ নাই, তেমনি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে গ্রথিত এই দুই কাব্য-পর্যায়— ইহা সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক। মানুষ বিশ্বলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় শক্তিদ্বারা এই বিশ্বলোকের পার্শ্বে আর একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে— শিল্পলোক। এই শিল্পলোকের অন্তর্গত সাহিত্যলোক। ইহা তাহার কাছে বিশ্বের অপেক্ষা খাটো নহে— অনেক সময়েই বিরাট্তর ব্যঞ্জনায় পূর্ণ। শিল্পিগণ নূতন সৃষ্টির সময়ে কখনো এই বিশ্বলোক হইতে, কখনো এই শিল্পলোক হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকে। সাহিত্যরচনায় যেমন প্রকৃতির বর্ণ গন্ধ শব্দ গ্রহণ করিলে তাহাকে চুরি বলা চলে না— তেমনি কালিদাস-ব্যাস-বাল্মীকির শিল্পজগৎ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিলে তাহা চুরি বলিয়া না ধরাই কর্তব্য। কল্পনা এই শিল্পলোকের উপাদানে বহুল পরিমাণে গঠিত।

সোনার তরী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে কবি বর্তমানের কথা, ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলিয়াছেন—তিনি একেবারে জীবনের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া বিশ্বলোক হইতে হাতে হাতে মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহার চক্ষু অতীতের দিকে— দূরবর্তী দেশে ও কালের দিকে— যে জীবন আজিকায় ভারতবর্ষ হইতে নিঃশেষে অপসৃত হইয়াছে সেই জীবনের কাহিনী কবির বক্তব্য। কাজেই কবিকে সেই পুরাতন

জীবনের সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসু হইয়া এই শিল্পজগতের সাহায্য লইতে হইয়াছে। এই সৌন্দর্যব্রতে কালিদাস তাঁহার প্রধান সহায়। কল্পনার বহু কবিতায় এই শিল্পজগতের পরিচয় আছে; বর্তমানের মহাকবি প্রাচীন কবিদের শিল্পজগতের চশমা চোখে দিয়া অতীত জীবনকে দেখিয়াছেন, কাজেই তাহার রংটা শিল্পলোকের; কিন্তু এই দৃষ্টি তো পুরাতন নহে, অপরের নহে, তাহা আধুনিক এবং রবীন্দ্রনাথের একান্তভাবে নিজস্ব।

আরো দুই-একটি আবশ্যক কথা মনে রাখিয়া কল্পনা পাঠ করা উচিত। আধুনিক মানবমন অত্যন্ত উৎকটভাবে তত্ত্বপরায়ণ, কেবলমাত্র নিছক সৌন্দর্য, গল্প তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। সে বলিয়া ওঠে— সৌন্দর্য, চিত্র, গল্প, এ সবই উত্তম; কিন্তু এই যে সুন্দর বস্তু, চিত্র, গল্প, এ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি সেইটাই আমার লক্ষ্য; সৌন্দর্য ও গল্পটা উপরি-পাওনা। এই আধুনিক মন যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুর সহিত নিজের আপেক্ষিক সম্বন্ধটি উপলব্ধি করিতে না পারে ততক্ষণ যেন তাহার স্বস্তি নাই। কিন্তু প্রাচীন কালের মন এমন একান্তভাবে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিল না, তাহার একটি অতি সরল বিবিক্ত নিরাসক্ত ভাব ছিল। সুন্দর বস্তু দেখিয়া, সুন্দর গল্প শুনিয়াই সে খুসি, তত্ত্বের কথা তাহাকে উৎপীড়িত করিয়া তুলিত না।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বের কাব্যগুলি আধুনিক মনের সৃষ্টি। তাহাতে কেবল সৌন্দর্যসৃষ্টি করিয়া তৃপ্তি নাই, সঙ্গে কবির ব্যক্তিত্বটিও মন্তব্য আকারে সৃষ্টিকে অনুধাবন করিয়াছে। কিন্তু কবি যখন প্রাচীন জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন যেন তিনি তাঁহার এই আধুনিক মুখর মনটাকে কথঞ্চিৎ শান্ত সংযত বিবিক্ত করিয়া নিছক শিল্পীর মত সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা বিশেষ শক্তির পরিচায়ক। প্রাচীন জীবনের মর্মের সহিত এমন নিবিড়ভাবে তিনি একাত্মকতা অনুভব করিয়াছেন যে, দৃষ্টিকে পর্যন্ত সেই অতীত জীবনের অবিমিশ্র সৌন্দর্য-দর্শনের উপযোগী করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের বিচিত্র জীবনের, অভিনব শিল্পজগতের যে খণ্ড ছিন্ন অংশগুলি ইতস্ততঃ কাব্যে পুরাণে পড়িয়া আছে, তাহা কবির চিত্তে যে সুর, যে চিত্র জাগ্রত করিয়া দিয়াছে কল্পনার কবিতাগুলি তাহারই সহিত কবির মানব-ভাষায় উত্তর-প্রত্যুত্তর। লক্ষ্যকে উপলক্ষ্যে পরিণত করিয়া ইহাতে তত্ত্বের কোঠায় পৌঁছিবার প্রয়াস নাই।

ভাষা ও ভঙ্গীর প্রসাধনকলা কল্পনার বৈশিষ্ট্য। পূর্ব পর্যায়ে কাব্যের মূলে ছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ; ইহা সজীব, প্রতিনিয়ত নব নব অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে আহত হইতে চলন্ত জীবনের সঙ্গে তাল রাখিয়া ইহা বর্ধমান, ইহার প্রধান লক্ষণ গতিবেগ। এই চলমান অভিজ্ঞতাকে সার্থকভাবে রূপ দিতে গেলে কাব্য স্বভাবতই গতিপরায়ণ হইয়া ওঠে ; তাই পূর্ব পর্যায়ের কাব্যলক্ষণ সাধনবেগ।

কল্পনার ভিত্তি প্রধানতঃ অপরের অভিজ্ঞতা, তাহা পূর্ব পর্যায়ের কাব্যের অভিজ্ঞতার ন্যায় সজীব, ক্রিয়াশীল, গতিমান নহে। চলন্ত নদীতে কমলবন সম্ভব নহে, কিন্তু সেই নদী যদি কালক্রমে মজিয়া গিয়া বদ্ধস্রোত সরোবর সৃষ্টি করে, তখন তাহার চতুর্দিকে শৈবাল ও কমলে যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তাহা উহার প্রসাধনকলা। কল্পনার অভিজ্ঞতা সেই অতীত জীবনের স্রোতশ্চ্যুত বদ্ধ জলাশয়, স্থিতি ইহার বিশেষত্ব, গতি নহে। এইজাতীয় অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে গেলে ভাষা, ছন্দ ও বাগ্‌ভঙ্গীর কারু-সুললিত প্রসাধনকলার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। পূর্ব পর্যায়ের কবিতার গতি বা সাধনবেগ স্বাভাবিক বলিয়াই তাহার পরিণাম কাব্যের বহিরঙ্গের সৌন্দর্যকে উত্তীর্ণ হইয়া তত্ত্বে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু কল্পনায় এই বেগ না থাকায় কাব্যের সৌন্দর্যেই অবসান। যেখানে পূর্বের সাধনবেগ আসিয়া পড়িয়াছে, যেমন বর্ষশেষ কবিতায়, সেখানে তাহা প্রচুর প্রসাধনের উপকরণে আপনার তীব্রতা হারাইয়া ফেলিয়া খানিকটা মন্দবেগ হইয়া পড়িয়াছে।

আরো একটা কথা। মানুষের চিত্তবৃত্তিকে যদি দুই ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব হয়, তবে একদিকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, অপরদিকে মন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব কাব্যে দেখিতে পাই, কাব্যের আরম্ভ ইন্দ্রিয়ের দৌত্যে, রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শব্দে ; তাহার পরিণাম তত্ত্বরূপে। কল্পনার কাব্য ইন্দ্রিয়ের দৌত্যেই আরব্ধ ও সমাপ্ত। ইহার কবিতাগুলি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দে একেবারে নিটোল নিখুঁত ; মন ইহাতে খোদার উপরে খোদকারি করিবার অবকাশ একেবারে পায় নাই। এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথ কালিদাস-কীট্‌সের সগোত্র।

স্বতোবিরুদ্ধতা কবিদের ধর্ম। মানুষের চৈতন্যপ্রবাহ অখণ্ড ও একাভিমুখী হইলেও, তাহার মোহানা সাত সমুদ্রের নাড়ির সঙ্গে। সেই সাত সমুদ্রের কখন কোন্‌টা হইতে যে কোটালের বান উচ্ছ্বসিত হইয়া আসে, দশদিকের কখন

কোন্‌টা হইতে যে কি বাতাস জাগিয়া ওঠে, এই অখণ্ড চৈতন্যপ্রবাহে অমনি জোয়ারের জল ছুটিতে থাকে, বাত্যাতাড়িত তরঙ্গমালা পূর্বতন গতিপথকে মুহূর্তে অস্বীকার করিয়া অকস্মাৎ অভাবিত অপ্রত্যাশিত অননুভূত অভূতপূর্ব পথের সন্ধানে কল্লোলিত হইয়া ওঠে। মানুষের সকলেরই আভ্যন্তরিক দশা এই রকম—কবিরা বিধাতাপুরুষের অতিসূক্ষ্ম তুলাদণ্ড, তাহাদের নিক্তিতে এই পরিবর্তন যেমন অনায়াসে ও অল্পে ধরা পড়ে, এমন অন্যদের মধ্যে হয় না।

এই স্বতোবিরুদ্ধতা কবিদের মধ্যে সমধিক, আবার কবিদের মধ্যে যাঁহার শ্রেষ্ঠ, চিত্তবৃত্তি যাঁহাদের সূক্ষ্মতর, এই স্বতোবিরুদ্ধতাও তাঁহাদের মধ্যে প্রবলতর। রবীন্দ্রনাথে স্বভাবতই এমনতর অনেক স্বতোবিরুদ্ধতার আভাস আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে একটি অখণ্ড প্রবাহ তাঁহার সমগ্র কাব্যে বর্তমান, তাহাই আমাদের অনুধাবনের বিষয়। এই স্বতোবিরুদ্ধতা তাঁহার আন্তরিকতার ও হৃদয়ের অতি সূক্ষ্ম ছায়াময় ভাবগ্রহণের শক্তির পরিচায়ক; আর এই অখণ্ডতা মহান্ এক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার ও ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতার নিদর্শন।

কল্পনায় বর্তমানের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ লোকে যাত্রা; কল্পনায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া প্রধানতঃ পরোক্ষ অভিজ্ঞতার রাজ্যে যাত্রা। এতদুভয়ের সন্ধিক্ষণের সন্ধ্যার সংশয়ের সুরে কল্পনার আরম্ভ। দুঃসময় ও অসময় কবিতা দুটি সন্ধ্যার শঙ্কা-সঙ্কুল বিষাদে পূর্ণ। সন্ধ্যার লগ্নটি সন্দেহের মূহূর্ত; একদিকে দিবসের স্পষ্ট প্রখর আলো নিবিয়া আসিতেছে, অন্যদিকে নক্ষত্র-ভাস্বর শান্ত নিবিড়তা এখনো প্রকটিত হয় নাই, এমন একটি দ্বিধার ক্ষণ সন্ধ্যা। যে দুইটি ভাবের কথা বলিলাম, তাহার সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া কবি কেমন যেন উদ্বিগ্ন সন্দিগ্ধ অন্যমনস্ক।

> যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
> সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
> যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
> যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,...
> তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
> এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

এই দ্বিধার মুহূর্তে কবির অপেক্ষাকৃত জড় অংশ ভীত ও সন্দিগ্ধ, কিন্তু তবু তাঁহার অগাধ বিশ্বাস নিজের অন্তরতম কবিপ্রকৃতির প্রতি।

সম্মুখে অজাগর-গর্জন সাগর এবং সুদীর্ঘ রাত্রি, বিশ্বজগৎও ধ্যানে মগ্ন, তবু উহারই মধ্যে একটুখানি আশার আভাস বহিয়া দেখা দিল "দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা।" কবির যেন মনে হইল, সূর্যের প্রত্যক্ষ আলো না পাইলেও, সেই আলোতে উদ্ভাসিত চন্দ্রের কিরণে অন্ধকার রাত্রিতে পথ চিনিয়া লওয়া অসম্ভব হইবে না। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন

বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
এস এস সুরে করুণ মিনতি মাথা।

যে তীরে এতদিন তাঁহার তরী নানা সুখদুঃখে, নানা পরিচিত অভিজ্ঞতার মধ্যে আসক্ত ছিল, আজ যে তীর দিগন্তে লুপ্যমান, সেই তীরের, সেই পরিচিত কণ্ঠের এই কাতর আহ্বান। কিন্তু যেখান হইতে একবার তাঁহার তরী সরিয়া আসিয়াছে, সেখানে আর নহে! এখন "আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন," এবং তাঁহার অন্তরস্থ সেই বিহঙ্গের প্রতি বিশ্বাস।

দুঃসময় কবিতাটি কল্পনার প্রথম কবিতা, অসময় প্রায় শেষের দিকে। দুটিই সন্দেহরস-প্রধান; তবু একটু পার্থক্য আছে। প্রথমটিতে কবি সবে মাত্র পথে বাহির হইয়াছেন, সম্মুখে দীর্ঘ রাত্রি ও দীর্ঘতর সমুদ্র, অজ্ঞাত ভবিষ্যতের প্রতীক। শেষের দিকের কবিতাটিতে, তিনি প্রায় গন্তব্য স্থানের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, এবং চন্দ্রতারাহীন বন্ধ্যা সন্ধ্যা অকস্মাৎ নামিয়া আসিয়া বাকি পথ অন্ধকারে ও আশঙ্কায় আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

দূরে কলরব ধ্বনিছে মন্দ মন্দ রে,
ফুরাল কি পথ, এসেছি পুরীর কাছে কি?
মনে হয় সেই সুদূর মধুর গন্ধ রে,
রহি রহি যেন ভাসিয়া আসিছে বাতাসে।

এত নিকটে আসিয়া শেষে "হয়েছে কি তবে সিংহ-দুয়ার বন্ধ রে!

মাঝে মাঝে প্রদীপের আলো ও নূপুর-নিক্কণ তাহা কি ঐ পুরীর! না শুধু সন্ধ্যার তারা ও ঝিল্লির ধ্বনি! সেই পুরীর বিচিত্র জীবনের নানা সুখদুঃখের ছবি তাঁহার কল্পনায় জাগিতেছে, সেখানে এতক্ষণ "নব বসন্তে এসেছে নবীন ভূপতি," "নব আনন্দে ফিরিছে যুবক যুবতী," "আজিকে সবাই সাজিয়াছে ফুলচন্দনে," "দলে দলে চলে বাঁধাবাঁধি বাহু-বন্ধনে।"

একদিন এই পুরীতে প্রবেশ তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল, কিন্তু

এখন কি আর পারিব প্রাচীর লঙ্ঘিতে,
দাঁড়ায়ে বাহিরে ডাকিব কাহারে বৃথা সে।

কবির আশা আছে, এই সৌন্দর্যময় রহস্যপুরীর অভ্যন্তরে যদি-বা তাঁহার প্রবেশ অসম্ভব হয়, তবে

দুয়ার-প্রান্তে দাঁড়ায়ে বাহির প্রান্তরে
ভেরী বাজাইব মোর প্রাণপণ প্রয়াসে।

প্রাচীন জীবনের বিচিত্র কারুকার্যময় সৌন্দর্যের রহস্যপুরীতে প্রবেশের জন্য তিনি প্রত্যক্ষ জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাত্রা করিয়াছেন। যদি এমন হয় যে, যে-জীবন তাঁহার আয়ত্ত ছিল তাহাও গেল, এবং অনধিগম্য জীবনটাও পরিচিত হইল না, তবে তাঁহার মত হতভাগ্য আর কে? আরো অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইব, তিনি অপরিচিতের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া ভেরী বাজাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সেই পুরীতে প্রবেশ করিয়া বহুজনবাঞ্ছিত পৌর-অধিকার-প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সন্ধ্যার দ্বিধা ও আশঙ্কা কাটিয়া গিয়া রাত্রির নক্ষত্র-ভাস্বর ধ্যানলভ্য আলোকে কবির অন্তর পরিপূর্ণ। কবি নির্ভয়ে রহস্যময়ী মহীয়সী রাত্রি-রানীর সিংহাসনসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সভাকবি হইবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

মোরে করো সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা!
তোমায় আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা।

এই রাত্রি বিস্মৃতির, অতীত কালের; কবি রহস্যগভীর এই অতল অন্ধকারের বৈতরণী পার হইয়া প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। বর্তমান ও অতীতের মধ্যে যে অনধিগম্য দূরত্ব তাহা অতিক্রম করিতে না পারিলে যে সব

...নিদ্রাহীন চক্ষু যুগে যুগে তোমার আঁধারে
খুঁজেছিল প্রশ্নের উত্তর

যাহারা

তোমার নির্বাক্ মুখে একদৃষ্টে চেয়েছিল বসি
...জুড়ি দুই কর—

তাহাদের সহিত কবির পরিচয় হইবে কেমন করিয়া? আর, পূর্বেই বলিয়াছি কল্পনা, কথা ও নৈবেদ্যে কবি সেই সব মহাপ্রাণদের ইতিহাস-রচনায় ব্যস্ত, যাঁহারা সারাজীবন সৌন্দর্যের ধ্যানের ও কর্মের আদর্শে নিযুক্ত ছিলেন এবং অবশেষে 'মহান্ মৃত্যুর সাথে বজ্রের আলোতে' মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছিলেন। ধরাতল হইতে সেই সব মহাপ্রাণ আজ অপসারিত, কিন্তু তাহারা সম্রাজ্ঞী রাত্রির সিংহাসন-ছায়ায়

আপনার স্বতন্ত্র আসনে
আসীন স্বাধীন স্তব্ধচ্ছবি।

কবির একান্ত অনুরোধ

হে শর্বরী, সেই তব বাক্যহীন জাগ্রত সভায়
মোরে করি দাও সভাকবি।

কবি এই সম্রাজ্ঞীর সভাকবিরূপে যে-সমস্ত গান করিয়াছেন, তাহার কয়েকটি কল্পনায় আছে, এক্ষণে আমরা তাহাদের বিষয়ে আলোচনা করিব।

২

কবিকে অনুসরণ করিয়া আমরা প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যের চিররহস্যময় পুরীতে প্রবেশ করি। এ পুরী সামান্যতঃ সমস্ত ভারতবর্ষ হইলেও বিশিষ্টভাবে ইহা উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবির রাজধানী; উজ্জয়িনী কালিদাসের কল্পনায় অত্যুজ্জ্বল হইয়া তাঁহার কাব্যে এবং তৎপরে সমগ্র

কাব্যামোদীর কল্পলোকে অমর হইয়া আছে। প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু ধারণা, তাহার অধিকাংশই উজ্জয়িনীকে আশ্রয় করিয়া প্রস্ফুটিত। রবীন্দ্রনাথের নিকটে সংস্কৃত সাহিত্য বলিতে প্রধানতঃ কালিদাসকেই এবং প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা বলিতে প্রধানতঃ উজ্জয়িনীর জীবনযাত্রাকেই বোঝায়।

কবিতাটি 'স্বপ্ন'। স্বপ্ন ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? আজ সেখানে স্বপ্নের গুপ্ত দ্বার ছাড়া প্রবেশের আর পথ কোথায়?

> দূরে বহুদূরে
> স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
> খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
> মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।

এখন দেখা যাক, সেই প্রিয়ার বর্ণনা কেমন?

> মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
> কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
> তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
> চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।

এ বর্ণনার উপাদান কালিদাসের, ইহার অভিজ্ঞতা কালিদাসের; কালিদাসের উপাদান ও অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব করিয়া, নিজের রসে সিক্ত করিয়া, প্রকাশ করিয়াছেন। দুই মহাকবির হাতের কারুকার্য ইহাতে বর্তমান, ইহাই কল্পনার ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যের কারণ। আবার দেখি, প্রিয়ার

> দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, তারি দুই ধারে
> দুটি শিশু-নীপতরু পুত্রস্নেহে রাজে।

এমন সময়ে

> ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।

কবিকে দেখিয়া হাতে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল

> হে বন্ধু আছ তো ভালো?

কিন্তু—

"মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু— কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি— নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত, মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত— চাহি দোঁহাপানে
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

এইখানেই জীবনের ট্রাজেডি। উজ্জয়িনী তো দূরের কথা! জীবনে একদা যাহারা সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল, মৃত্যুর পরপার হইতে আজ তাহারা যদি ফিরিয়া আসে, তবে কি পুনরায় পূর্বের সেই আসনখানি তাহারা ফিরিয়া পাইবে? মৃতদের পক্ষে এ দাবি স্বাভাবিক, তাহারা বৃহৎ জীবনের একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু জীবিতের নিকটে জীবনের আকর্ষণ বেশি, নূতন ব্যক্তি ও ভাব আসিয়া তাহার শূন্য আসন দখল করিয়া বসিতে থাকে। মালবিকা আজও উজ্জয়িনীর সেই জীবনে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহার পক্ষে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা অসম্ভব নয়; কিন্তু যে-কবি তাহার পরে বহু শতাব্দীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার জীবন উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন, তিনি স্বপ্নদ্বার অতিক্রম করিয়া সেখানে পৌঁছিতে পারিলেও, ভাষা মনে রাখিবেন কেমন করিয়া? এই প্রণয়ীযুগলের বিস্মৃতবাক্‌ বেদনাতেই কবিতাটির প্রাণ। মালবিকা সেই প্রাচীন জীবনের প্রতীক। আজ কি আর সেই একদা-প্রিয় জীবন-যাত্রার মধ্যে ফিরিয়া গিয়া তেমনি স্বাভাবিকভাবে পুরাতন স্থানটি অধিকার করা স্বাভাবিক! দূর হইতে ইহা অসম্ভব মনে হয় না, কিন্তু কোনোক্রমে একবার সেখানে ফিরিতে পারিলে বুঝিতে পারিতাম— "হায়, স্বর্গ আর স্বর্গ নহে।" এই অতীত স্বর্গের উপভোগ একমাত্র কল্পনার দ্বারাই সম্ভব। কল্পনার সাহায্যে এই কাব্যগ্রন্থে সেই প্রাচীন জীবনকে উপভোগ করিবার চেষ্টা কবির তরফ হইতে হইয়াছে।

কবির উত্তরীয়প্রান্ত অবলম্বন করিয়া বহুযুগ উত্তীর্ণ হইয়া উজ্জয়িনীর নববর্ষা-সমাগম-উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারি 'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটিতে। সেই যে একদিন আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে অকস্মাৎ শিপ্রাপরপারবর্তী দিগন্তরালের নীল বনরেখাকে গাঢ়তর করিয়া মেঘ জমিয়া উঠিত এবং স্ফুরিত বিদ্যুতের

আভাস দিয়া ধাবমান জল-যবনিকা পথঘাট গিরিশিখর এবং ক্রমে উজ্জয়িনীর প্রাসাদচূড়াগুলি আচ্ছন্ন করিয়া দিত, কবির যাদুমন্ত্রে আমরা সেই জীবনের কেন্দ্রে গিয়া উপস্থিত হই। সেই যে ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ জনপদবধূগণ এবং তাহাদের সিক্ত অঞ্চলের সৌরভ; সেই যে হর্ম্ম্য-বিলাসিনীগণ এবং তাহাদের বীণাধ্বনিমিশ্র নৃত্য-উত্তাল রশনাদামের ঝঙ্কার; কুটীরাঙ্গনাদের উৎসবমুখর হুলুধ্বনি এবং কুঞ্জকুটীরে ভাবাকুললোচনার মুগ্ধদৃষ্টি; শয্যাসুগন্ধি কদম্ব ও কেতকীর স্নিগ্ধ গন্ধ, এবং সেই যে মালবিকা 'তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া, ভবনশিখীরে গনিয়া গনিয়া' নাচাইতেছে, মণিমাণিক্যজড়িত তাহার কঙ্কণযুগলের রিনি রিনি যুগপৎ শব্দে স্পর্শে গন্ধে গানে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অধিকার করিয়া, আয়ত্ত করিয়া, মুগ্ধ করিয়া অন্ততঃ মুহূর্তের জন্যও সেই প্রাচীন জীবনের পৌর অধিকার আমাদিগকে দান করে।

আমাদের সাধ্য কি বহুপুরাতন বর্ষাকে এমন অভিনব ভাবে একাকী সম্ভোগ করিতে পারি!

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।

এই কবিতাটিতে নানা কবি-কণ্ঠের মূর্ছনা, বহু মালবিকার অশ্রু-সিঞ্চনের আভাস, বহু অভিসারিকার অবাধ্য নূপুরের রহস্য-ভাষণ এবং বহু বনান্তের আনন্দমর্মর ধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে, মুহূর্তের জন্য আমাদের কণ্ঠ বিশাল বিরাট্ বহুতান অগাধ ঐশ্বর্যশালী হইয়া বিশ্বকণ্ঠে পরিণত হয়।

বসন্তসখা মদন অনুচর-পরিচর লইয়া স্বর্গে যে-সব কাণ্ড করিয়া বেড়াইত, একবার শক্ত হাতে পড়িয়া তজ্জন্য চরম দণ্ড লাভ করিয়াছিল। কিন্তু হায়, তাহাতে দুর্দৈব বাড়িল বই কমিল না! যে একদিন স্বর্গরাজ্যে উৎপাত করিত, সেইদিন হইতে তাহার পরম অরাজকতায় স্বর্গ মর্ত্য সপ্ত ভুবন ভরিয়া উঠিল। মদন-সম্বন্ধীয় কবিতাযুগলে রবীন্দ্রনাথ মানবের ধরাতলে মানবের কাজে মদনকে নামাইয়া আনিয়াছেন। প্রাচীন কাব্য ও পুরাণ হইতে আমরা মদনসম্বন্ধে কতটুকুই বা জানি! কবি নানা মনোহর তথ্যের সমাবেশে পাঠকের কল্পনায় মদনকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছেন।

কবি মদনকে দেবতার উচ্চ আসনে বসাইয়া না রাখিয়া তাহাকে মানবের সকল কাজের সঙ্গীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। একদিন সে তরুণতরুণীর যেমন প্রিয় সঙ্গী ছিল, আজও তেমনি সে চিরার্জিত স্থানটি অধিকার করুক, কবির এই মিনতি—

এস গো আজি অঙ্গ ধরি সঙ্গে করি সখারে
বন্যমালা জড়ায়ে অলকে

এবং

নবীন করো মানবঘর ধরণী করো বিবশা
দেবতা-পদ-সরস-পরশে।

দেবতা আর দেবতা নহে, স্বর্গে মর্ত্যে কোনো ছেদ নাই; দেবতা মানব স্বর্গ মর্ত্য অবিমিশ্র হইয়া এক আনন্দলোক গড়িয়া উঠিয়াছে।

মদনভস্মের পরে কবিতাটির আলুলায়িত ছন্দ আকুলমূর্ধজা ধূসরস্তনী রতির মত লুটাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।

ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সংগীতে
সকল দিক্ কাঁদিয়া উঠে আপনি।

ভস্মাবশেষ ধূলিশয্যা ত্যাগ করিয়া মদনের আত্মা বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া গেল, বাতাসে তাহার নিশ্বাস, আকাশে তাহার অশ্রু, এবং ফাল্গুনের মূর্ছিতা ধরণীতে তাহারই ইঙ্গিত। আজ বিশ্বের সকল সৌন্দর্যই যে মদনের হাতছানিতে উন্মাদনায় ভরা, তাহারও বুঝি কারণ ইহাই।

প্রাচীন জীবনকে অতিক্রম করিয়া আমরা আদিম জীবনের মধ্যে চলিয়া যাই বসন্ত কবিতায়, সেই যখন

অযুত বৎসর আগে, হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে,
মত্ত কুতূহলী
প্রথম যেদিন খুলি নন্দনের দক্ষিণ-দুয়ার
মর্ত্যে এলে চলি।

পূর্বে অনেকবার বলিয়াছি, 'কল্পনা'য় কবির মুখ অতীতের দিকে, যে-অতীতের মধ্যে আর কোনোক্রমেই ফিরিবার উপায় নাই, যে মধুময় জীবন "ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে" সেই অতীতের প্রতি ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 'কল্পনা'য় কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ।

এতদিন বসন্তের বর্তমান রূপটি তাঁহার চোখে পড়িয়াছে, আজ সহসা অযুত যুগের পরপারবর্তী তাহার আদিমতম প্রথমতম উন্মত্ত অভিসার কবির চোখে পড়িয়া গেল। সেই প্রাচীন দিনের প্রথম পুষ্পই আজ নবীন রূপে আসিয়াছে,

> তাই সেই পুষ্পে লিখা জগতের প্রাচীন দিনের
> বিস্মৃত বারতা,
> তাই তার গন্ধে ভাসে ক্লান্ত লুপ্ত লোকলোকান্তের
> কান্ত মধুরতা।

শুধু তাহা নহে, আজ কবি যে-মালা গাঁথিয়াছেন, তাহাতে, না জানি কত

> নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষাকাহিনী
> আঁকা অশ্রুজলে!

বসন্তের যে পুষ্পরাজি প্রাচীন জীবনের সুখদুঃখের ইতিহাস বহন করিতেছে, তাহারা কবির স্বল্পস্থায়ী বসন্তের গুপ্ত সংবাদ বহন করিয়া গেল। এই সূত্রে কবির ব্যক্তিগত জীবন বিচিত্র বৃহৎ জীবনমালার মধ্যে গ্রথিত হইয়াছে। আবার অনাগত বসন্তে যখন এই সনাতন পুষ্পমালা বিকশিত হইয়া উঠিবে, তৎসহ কবিজীবনের এই কথাখানি পরম অধ্যায় কুঞ্জে কুঞ্জে পুষ্পিত, কুহুস্বরে ধ্বনিত, মর্মর-নিশ্বাসে শ্বসিত ও রক্তরৌদ্রে রঞ্জিত হইয়া উঠিতে থাকিবে।

বসন্ত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যতগুলি কবিতা আছে, তন্মধ্যে এই কবিতার অতি উচ্চ স্থান। ইহাতে অযথা তত্ত্বের বাহুল্য বা অকারণ বর্ণনার আতিশয্য নাই। বসন্তের তপ্ত অপরাহ্ণে উপবনপ্রান্তে যে একটি মধুর ক্লান্তি অনুভূত হইতে থাকে, সেই রকম আতপ্ত মোহময় এই কবিতাটি কবির গভীর মর্মবেদনার একটিমাত্র সুদীর্ঘ নিশ্বাস; ইহা অতিকথন ও সামান্যকথন উভয় দোষ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত।

প্রথমেই বলিয়াছি, কল্পনা কাব্যে বিশ্বলোক ও শিল্পলোক পাশাপাশি বর্তমান, অনেক স্থলে উভয়ে মিশ্রিত হইয়া আশ্চর্য সৌন্দর্যের কারণ হইয়াছে। প্রকাশ কবিতায় বিশ্বলোকের তত্ত্ব শিল্পলোকে প্রকাশ হইয়া পড়িবার ইতিহাস। ভ্রমর ও মাধবীফুলে, তরু ও লতায়, চাঁদে ও চকোরে, তড়িতে ও মেঘে "এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে", সে কথা কেহ তো জানিত না, কিংবা জানিলেও তাহা উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া না-জানারই সামিল ছিল। একদিন হঠাৎ বিশ্বাসঘাতক কবি উপযুক্ত সুরে ছন্দে সেই অতি গুপ্ত কাহিনী প্রকাশ করিয়া ফেলিল, শিল্পীর হাতে পড়িয়া বিশ্বলোকের সত্য শিল্পলোকের সত্য হইয়া উঠিল। এই গুপ্ত সংবাদের প্রকাশে প্রকৃতি সাবধান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মানুষের দুঃসাহস বাড়িয়াছে বই কমে নাই। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে দশদিকে যদি মিলনের স্রোত অবিরল, তবে মানুষ কেন লজ্জায় দূরে দূরে থাকিবে! তাহারা

> কহিল হাসিয়া মালা হাতে লয়ে পাশাপাশি কাছাকাছি,
> "ত্রিভুবন যদি ধরা পড়ে গেল, তুমি আমি কোথা আছি।"

আজ বিশ্ব ও শিল্প গায়ে গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন কি অনেক সময়ে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝিবার উপায় থাকে না; শিল্পলোক আজ আমাদিগকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া আছে যে, মেঘের দিকে তাকাইলে প্রকৃত মেঘ আর চোখে পড়ে না, কালিদাস একদিন যে সত্য দেখিয়াছিলেন শিল্পের অপূর্ব মায়াকৌশলে সেই সত্য আমরা দেখিতে বাধ্য হই। একথা প্রকৃতির অনেক দৃশ্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু একদিন ছিল, যখন এই দুই সত্য, এই দুই জগৎ একান্ত পৃথক্ ছিল, কেহ কাহারও রহস্য জানিত না। প্রকাশ কবিতার আরম্ভ জগতের সেই অবস্থায়, এবং যেদিন যেভাবে এই দুই জগৎ মুখোমুখী হইয়া পরস্পরসম্বন্ধে সচেতন হইয়া পড়িল, জগতের সেই অবস্থায় ইহার শেষ।

অতীতটা যতই মধুময় হউক, অবসরক্ষণে সেদিকে ফিরিয়া মানুষ যতই-না দীর্ঘশ্বাস ফেলুক, নূতনের ক্ষুধার অন্ন অতীতের ভাণ্ডারে নাই। অতীতের ভাঙা মন্দিরে, একদা-সম্পূজিত জীবনের পরম আদর্শ, পূজাহীন পড়িয়া থাকে। ভগ্নমন্দির কবিতাটিতে এই ভাব। আজ সে মন্দিরে শঙ্খ ও বীণা নীরব,

আজ তাহা পরিত্যক্ত। তাহা জীর্ণ ও নির্জন বটে, কিন্তু চতুর্দিকে যে নবজীবন প্রসারিত, তাহার আভাস রহিয়া রহিয়া সেই মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিতে থাকে,

তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ
নব-বসন্ত-পবনে।

এই দেবতার পূজারী, যে একদিন বহুসম্মানাস্পদ ছিল, আজ সে ভিক্ষুক ও উপবাসী। আজ সে আদর্শচ্যুত হইয়া কোন্ বিদেশে কোন্ অপরিজ্ঞাত জীবনে, কার প্রসাদের ভিখারী। চারিদিকে নব নব জীবনের আদর্শ, সেই আদর্শ-অনুসারে কত প্রতিমা গঠিত, পূজিত ও পুনরায় বিস্মৃত হইতেছে; এই চিরনবায়মান জীবনতরঙ্গ হইতে দূরে সেই প্রাচীন দেবতা পড়িয়া আছে, একদিন যে ভক্তির পাত্র ছিল, আজ সে অবিমিশ্র কৃপাপ্রার্থী।

প্রাচীন জীবনকে যত ভাবে দেখা যায়, কবি দেখিয়াছেন। একদিকে তাহা দুরধিগম্য, আবার সে কল্পনার পরম আশ্রয় এবং বর্তমানের রূঢ়তা হইতে পলায়নের অপরূপ নন্দন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাকে একান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। জীবনের দাবিকে অতীত আর কিছুতেই তৃপ্তি দিতে পারে না, ভাঙা মন্দিরে গান রচনা করিয়া কবির সান্ত্বনা নাই। জীবনের যে নবীন বেদীর উপরে নূতন প্রতিমার পূজা, কবির আসন সেখানে; শুধু মাঝে মাঝে তাঁহার সকাতর দৃষ্টিনিক্ষেপ, বিস্মৃত বিগত-পূজা বিভগ্ন সেই ভাঙা দেউলের নির্জন দেবতার প্রতি।

সোনার তরী পর্যায়ের ভাবকেন্দ্র জীবনদেবতা, কল্পনাতে বিশ্বদেবতার আভাস। অনেকের ধারণা জীবনদেবতার আইডিয়া হইতে বিশ্বদেবতার বিকাশ; ইহা সত্য নহে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রারম্ভ হইতেই এই দুই ভাব, জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতা, বর্তমান; তবে সোনার তরীর পূর্বে যেমন জীবনদেবতার আইডিয়া গভীরতা ও বিশিষ্টতা লাভ করে নাই, কল্পনার পূর্বেও বিশ্বদেবতার ভাব অপরিণত। এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতা যেমন, দেশাত্মবোধ ও বিশ্ববোধ এই দুইটি ভাবও তেমনি তাঁহার গদ্যে পদ্যে প্রথম হইতে বর্তমান। দেশাত্মবোধের পরিণাম বিশ্ববোধ নহে। জীবনের পরিণতির সহিত ও অভিজ্ঞতার

প্রাচুর্যের সঙ্গে এই দুই আইডিয়া পুষ্ট ও বিকশিত হইয়াছে মাত্র। যদি একটার পরিণাম আর-একটা না হয় তবে দুটির আপেক্ষিক সম্বন্ধ কি রকম? একটি আর-একটির পটভূমি। দেশকে কবি বিশ্বের অন্তর্গত করিয়া, তাহাকেই একান্তভাবে নয়, তাহার যথার্থ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দেখিতে চাহিয়াছেন; এই দুটির সামঞ্জস্য-বিধানেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব, এবং তাঁহার রাষ্ট্রনীতির চিন্তার মধ্যে যদি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে তবে তাহা দেশ ও বিশ্বের আপেক্ষিক সামঞ্জস্য বিধানের এই চিন্তা-প্রয়াসে।

বর্ষশেষ কবিতাটিতে বিশ্বদেবতার আভাস। এই কবিতাটি শেলির 'ওড টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড' কবিতার সহিত তুলনীয়। একটি আর-একটির কথা মনে করাইয়া দেয়; কবি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন ইহা লিখিবার সময়ে শেলির কবিতাটির সংস্কার তাঁহার মনে সচেতনভাবে ছিল। পূর্বের কতকগুলি কবিতাপ্রসঙ্গে যেমন দেখিয়াছি তাহাদের অস্তিত্বের প্রাথমিক ভিত্তি কালিদাসের অভিজ্ঞতা, এটিতে তেমনি শেলির। দুটি কবিতারই উপলক্ষ্য অনুরূপ, বর্ষশেষ ও অকস্মাৎ প্রবল ঝটিকা। শেলির কবিতাটিতে দুটি মাত্র ভাব; 'জীর্ণ জীবন ধ্বংস হউক, নবীন উদ্ভূত হউক, আমি সেই সদ্যোজাত নবীনের কবি হইয়া বিশ্বময় তাহার বাণী প্রচার করি।' প্রচুর বর্ণনা ও অনুগত ভাবধারার মধ্য দিয়া এই মূল সুরটি অখণ্ডভাবে ধ্বনিত হইয়া চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলে। রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ, মূল ভাবের অনুষঙ্গী আরও দু-তিনটি ভাবের চাপে কিঞ্চিৎ শিথিলগতি; শেলির কবিতায় রসানুভূতির যে তীব্রতা, এখানে তাহার কিছু যেন অভাব। আরও একটি কথা; কল্পনার কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য ইহাদের নিছক চিত্ররসে; চিত্রকে অতিক্রম করিয়া তত্ত্বে পৌছিবার প্রয়াস এখানে নাই; কল্পনার প্রধান সৌন্দর্য প্রসাধনকলা, সাধনবেগ নহে। বর্ষশেষে ইহার ব্যতিক্রম। ইহা চিত্রকে উত্তীর্ণ হইয়া তত্ত্বে পরিণত হইয়াছে; ইহার প্রচণ্ড সাধনবেগ প্রসাধনকলার সূক্ষ্মতাকে দীর্ণ করিয়া বাত্যাতাড়িত তরঙ্গমালার ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। এই কবিতাটির সম্বন্ধে কবি সতীশচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, "একি weird বুকভাঙা বৈদিক কবির মত ক্রন্দন! এ যে রুদ্র ইন্দ্রের দিকে উত্থিত গান!" এ রকম উদাত্ত হাহাকার অন্য কোন্ সাহিত্যে আছে জানি না।

কালবৈশাখী ঝড় যেমন অকস্মাৎ একনিশ্বাসে একান্ত প্রবলভাবে আসিয়া পড়ে, সেই সুরটি ধরা পড়ে প্রথম চারি ছত্রের ছন্দঃস্পন্দের আকস্মিকতায়—

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া,
হানি দীর্ঘধারা।

যাঁহারা বৃষ্টিসনাথ ধাবমান আসন্ন কালবৈশাখী ঝড় দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন 'নীলাঞ্জন ছায়া' ও 'হানি দীর্ঘধারা' ছবি দুইটি কত সত্য! কালবৈশাখীর প্রথম একটা ঝাপটা চলিয়া গেলে, বায়ুমণ্ডল যেমন মৌন, নির্জীব ও বায়ুলেশরিক্ত মনে হয়, ঠিক সেই ক্লান্ত নির্জীবতা বাকি চারিটি ছত্রের সহজ সরল ছোট ছোট কয়েকটি বাক্যে—

বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন
চৈত্র অবসান,
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান।

প্রথমোক্ত চারি ছত্রের প্রচণ্ড আঘাতে সময় নিজের মনের কথা আর ভাবিবার অবকাশ ছিল না, এবার নিজের দিকে চোখ পড়িল; বর্ষশেষের ঝড়ের অর্থ বুঝিতে পারিয়াই যেন কবি বলিতেছেন—

গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান।

দ্বিতীয় শ্লোকে দেখি, আবার ধীরে ধীরে আসন্ন আর একটা বাত্যাতরঙ্গের পূর্বাভাস পাওয়া যাইতেছে। সংযুক্তবর্ণের বাহুল্যে এবং ছন্দঃস্পন্দের স্থানবৈচিত্র্যে ইহা সম্ভব হইয়াছে। 'ধূসর-পাংশুল মাঠ', 'ধেনুগণ ধায় ঊর্ধ্বমুখে' ও 'ছুটে চলে চাষী'। তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রে কোনো ছেদ নাই— হু হু করিয়া একটা দীর্ঘ সংঘাত আসিয়া পড়িয়াছে—

ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্রে ছেদ নাই; শেষ দুইটি ছত্রে এতক্ষণ যে-আভাস ও আয়োজন স্তরে স্তরে জমিয়া উঠিতেছিল, তাহা পুনরায় দ্বিগুণিত বেগে পাঠকের উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়—

বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখি।

শুধু ঝড় নয়, এবারে তীক্ষ্ণ একটা মেঘের গর্জনও আছে—বর্ষার মেঘের ন্যায় গম্ভীর নয়. বৈশাখী মেঘের সুতীক্ষ্ণ বজ্রোদ্গারী ধ্বনি 'বিদ্যুৎবিদীর্ণ' শব্দটিতে শ্রুত হয়. তারপরে ছয়টি শব্দ, ছোট ছোট দুটি দুটি অক্ষরের। প্রথমে বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জনে আলো; চোখে পড়িল, দলে দলে হাঁস পাখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কম্পন তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; পাখার ক্ষুদ্র কম্পন ঐ ছোট ছোট শব্দগুলিতে; অবশেষে আবার একটা কর্কশ মেঘগর্জন, 'উৎকণ্ঠিত পাখি', তারপরে সব অন্ধকার। বৈশাখী ঝঞ্ঝার এমন সত্য ও আশ্চর্য চিত্র বাংলা ভাষায় আর নাই। এই সফলতার কারণ, ঝঞ্ঝার রসকে ভাষা, চিত্র ও প্রাকৃতিক তথ্য দ্বারা কবিকে প্রকাশ করিতে হয় নাই, তিনি ছন্দঃসংগীতের দ্বারা তাহা সাধন করিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, ভাষা অপেক্ষা সংগীত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অধিকতর অনুকূল।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকের মূলভাব—

উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে ভাব-কেন্দ্র— 'আমার মনে এমন কঠিন সন্তোষ জাগ্রত হউক, যাহা পুরাতনের লজ্জাভয়বিমুক্ত, কেবল নূতনের জয়ধ্বনিতে পূর্ণ।' সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্লোকে নূতনের আগমনী ও অভ্যর্থনা। একাদশ শ্লোকে বলা হইতেছে, 'হে সদ্যোজাত মহাবীর, তুমি কি বাণী যে আনিয়াছ, তাহা তুমিও সম্পূর্ণভাবে জান না, আমিও তাহা না বুঝিতে পারিয়া মুগ্ধভাবে চাহিয়া আছি।' এতক্ষণ কবি কেবল নিজের কথাই বলিতেছিলেন, দ্বাদশ শ্লোকে সমগ্র মানবজাতির কথা আসিয়াছে—হে কিশোর তোমার উদার জয়ভেরীর আহ্বানে

আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব
অর্পিব পরান।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শ্লোকে ক্ষুদ্র জীবনের দুঃসহ পঙ্কিলতাকে ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চদশ শ্লোকে, মানবজাতি হইতে কবি পুনরায় নিজের মধ্যে ফিরিয়া বলিতেছেন, একবার জীবনের বিরাট স্বরূপ ও মহান্ মৃত্যুকে স্পষ্টরূপে যেন তিনি দেখিতে নাই। ষোড়শ শ্লোকে কবি কতকটা অকর্মক হইয়া পড়িয়াছেন। এতক্ষণ তাঁহার যে ক্রিয়াশীলতা, সজীবতা ছিল, তৎপরিবর্তে তিনি যেন কেবল এই বিরাট সত্তার ক্ষণিক খেলনা মাত্র হইয়া পড়িলেন; একবার উত্তমরূপে জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে পরিচিত হইয়া চিরবিস্মৃতির গর্ভে কবি ডুবিয়া যাইতে রাজি আছেন। সপ্তদশ শ্লোকে অন্তরের তুমুল দ্বন্দ্ব হইতে বাহিরের দিকে চক্ষু ফিরাইতেই কবি দেখিলেন—

নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রামবিহীন;

কালবৈশাখীর তীব্রতা, আবেগ আর নাই; নবাঙ্কুর শব্দটি নূতন জীবনের বাণী বহন করিতেছে; এই প্রলয়-ঝড়ে অনেক কিছু ঝরিয়া পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে, তবু যাহা রহিল তাহাই সত্য, তাহাই রহিবার মত।

এই দীর্ঘ কবিতাটিতে অনেকগুলি ভাবের সমাবেশ হইয়াছে; অবশ্য ইহার মধ্যে কোনোটিই অপ্রাসঙ্গিক নহে, তবু এই সুদীর্ঘ ভাবশৃঙ্খলপরম্পরার গ্রন্থিগুলি কতকটা শিথিল বলিয়া মনে হয়; ইহাতে ঝড়ের কবিতার প্রধান লক্ষণ তীব্রতা ও আবেগের অভাব কিয়ৎপরিমাণে অনুভূত হইতে থাকে।

বর্ষশেষ কবিতাটিকে প্রধানতঃ দুই ভাগ করা চলে, পুরাতনের বিদায় ও নূতনের আগমন। বৈশাখ কবিতায় কেবল ইহার অর্ধেক মাত্র। বর্ষশেষ সন্ধ্যার কবিতা; 'বৈশাখ' মধ্যাহ্নের— আকাশ যখন তাম্রাভ, বাতাস যখন নিস্পন্দ এবং বনে যখন পাতাটিও কাঁপিতেছে না। বৈশাখের মধ্যাহ্নে রৌদ্রমুগ্ধ নির্জন আকাশ ও প্রান্তর ভালো করিয়া দেখিয়া না লইলে ইহার ভীষণ-মাধুর্য বুঝিতে পারা যাইবে না। ইহাতে নিরাসক্ত চিত্ররস; সচেতনভাবে কোনো তত্ত্ব দিবার চেষ্টা নাই।

বৈশাখের ধ্বংস-করাল মূর্তি, তাহার বাহিরের রূপ; কিন্তু তাহার অন্তরে আর একটি রূপ আছে, তাহা শান্তির—

হে বৈরাগী করো শান্তিপাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে

এবং সেই

সকরুণ তব মন্ত্রসাথে
মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব'পরে,
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্ত স্বরে,
অশ্বত্থ-ছায়াতে।

অবশেষে, হে সন্ন্যাসী, জরামৃত্যু, ক্ষুধাতৃষ্ণা এবং চিন্তায় বিকল লক্ষ কোটি নরনারীকে বিশাল বৈরাগ্যময় গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া দাও।

তাপস বৈশাখের বাহিরের ও অন্তরের দুটি রূপকেই কবি দেখাইয়াছেন; বাহিরে পুরাতনকে সে দগ্ধ করিয়া ফেলে, অন্তরে তাহার পরম সন্তোষ বিরাজমান। ইহাতে স্পষ্টতঃ নূতনের আগমনী না থাকিলেও, এই সন্তোষ তাহার সূচনা করে। কবির পরবর্তী ধহু কবিতায় বৈশাখের এই যুগলরূপকে আরও স্পষ্টভাবে দেখানো হইয়াছে।

বৈশাখের ঝড়ে যাঁহার প্রচণ্ড প্রকাশ, বৈশাখের মধ্যাহ্নে যাঁহার রুদ্র প্রকাশ, সেই মূল সত্তাই বিশ্বদেবতা। ভ্রষ্টলগ্ন কবিতায় এই সত্তা মধুরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এতক্ষণ দেখিলাম কবি আগ্রহের সহিত সেই সত্তার নিকটে নিজেকে সমর্পণ করিতে উৎসুক। কিন্তু সেই সত্তাও মানুষের নিকটে নিজেকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু হায়, উভয় পক্ষের ইচ্ছার শুভলগ্ন একমুহূর্তে আসে না, তাহাতে আবার অপরিচয়ের অর্ধ-অজ্ঞতা এবং অর্ধ-পরিচয়ের লজ্জা! সকালবেলা যখন তরুণ পথিক আমার দুয়ারে আসিয়া আমার সন্ধান করে, তখন কেন যে

সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।

আবার সন্ধ্যাবেলা সেই ক্লান্ত পথিক যখন আমাকে সন্ধান করে, তখনো

সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়
শ্রান্ত পথিক সে যে আমি, সেই আমি।

লজ্জা যখন ভাঙিল, বিলাসিনী প্রস্তুত হইয়া যখন বসিয়া, তখন আর তাঁহার দেখা পাই না, তখন হতাশ হইয়া কেবল

ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি
হতাশ পথিক সে যে আমি, সেই আমি।

সোনার তরীতে কয়েকটি রূপকথা-জাতীয় কবিতা আছে, এটিও মূলতঃ সেই শ্রেণীর ; তবে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে ইহার রস নিবিড়তর।

অশেষ কবিতায় কবিকে অসমাপ্ত কর্তব্যের মধ্যে আহ্বান। কবির বিশ্বাস ছিল জীবনের কঠোর কর্তব্য তাঁহার শেষ হইয়াছে, এখন তাঁহার বিশ্রামের অবকাশ। কিন্তু জীবনদেবতার লীলা বুঝিয়া উঠিবার উপায় নাই ; কবি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে থাকেন,

কেন আসে মর্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ ?

এই মোহিনী নিষ্ঠুরা কঠোর স্বামিনী আর কেহই নহেন, কবির জীবনদেবতা। তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার শক্তি কবিরও নাই, কাজেই,

আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নতশিরে
তোমার আহ্বান।

বাংলাদেশের সন্ধ্যাকে এমন একটিমাত্র রেখায় বন্দী করিতে আর কে পারিয়াছে জানি না ; কাজের বিরাম, নিদ্রার আরাম, এবং গৃহের অভ্যন্তরে সমস্ত দিনের পরিণাম, এই তিনটি ছত্রে কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে—

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচলখসা
হাতে দীপশিখা।

বিদায় নামে দুটি কবিতা আছে। একটিতে কবি পূর্বতন আরামদায়ক জীবন হইতে বৃহৎ কর্তব্যকঠিন জীবনে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন,

বর্তমানের সহিত বন্ধনছেদনের বেদনাই ইহার প্রাণ। অশেষ কবিতার আহ্বানই হয়তো তাঁহাকে সেই কর্তব্যের পথে টানিয়াছে।

দ্বিতীয় বিদায় কবিতাটিতে মৃত্যুর বিচ্ছেদ। চিত্রার মৃত্যুর পরে কবিতার সহিত ইহার বিষয়বস্তু এবং তবু দুটিতে কত প্রভেদ! বিদায় কবিতার অভিজ্ঞতা পূর্বেরটি হইতে গভীরতর পরিণাম লাভ করিয়াছে। যে অতিকথন-দোষে মৃত্যুর পরে কবিতাটির রস জমে নাই, সেই অতিকথন-দোষশূন্য এই কবিতাটিতে কেমন একপ্রকার কোমল মধুরতা অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম।

কল্পনার দেশাত্মবোধক কবিতাগুলির মূল প্রাচীন ভারতের জীবনে। ইহাতে যে-ভারত কবির লক্ষ্য তাহা ঐতিহাসিক ধারাবিচ্যুত বর্তমান ভারতবর্ষ নহে, তাহা প্রধানতঃ "জনক-জননী" জননী। কবি ভারতবর্ষকে প্রাচীন কালের জীবনের ভিতর দিয়া, কাব্যপুরাণের ইতিহাসের মহিমার ভিতর দিয়া দেখিতেছেন; ভারতবর্ষ জন্মভূমি বলিয়াই প্রিয়, কিন্তু তাহা প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছে ইতিহাসের এই সমস্ত মণিমাণিক্যের অঙ্গভূষণের উজ্জ্বলতায়। এই ভারতবর্ষ যেমন "জনক-জননী-জননী" তেমনি ইহা "ভুবন-মনোমোহিনী"; রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রীতির প্রথম উৎস, দেশের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য— প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হইতে উৎসারিত দেশপ্রেম অগ্রসর হইতে হইতে দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও কাব্যপুরাণ দ্বারা বর্ধিতস্রোত হইয়া পূর্ণতর হইয়াছে। দেশপ্রীতির এই মৌলিক দৃষ্টি প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক সত্যের দ্বারা রঞ্জিত হইয়া কল্পনার দেশাত্মবোধক কবিতার সৃষ্টি করিয়াছে, ভারতলক্ষ্মী ইহার চরম।

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী।
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননী-জননী।

দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঐতিহাসিক সত্যের দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে—

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।

দেশের সৌন্দর্যপ্রধান রূপের বর্ণনা তিনি অনেক কবিতায় করিয়াছেন; শরৎ কবিতাটি তাহাদের অন্যতম। বঙ্গলক্ষ্মী কবিতায় এই সৌন্দর্যের সহিত রাজনীতির ও অর্থনীতির সত্যকে কেমন কৌশলে কেমন অনায়াসে তিনি মিলাইয়া দিয়াছেন—

তোমার শ্রীঅঙ্গ হ'তে একে একে খুলি'
সৌভাগ্যভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার ললাটশোভা সীমন্তরতন,
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে।

এই কবিতাগুলিতে আর-একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইহাতে দেশের বর্তমান মূর্তি অত্যন্ত দীনা হীনা কাতরা। মাতার আহ্বান ও সে আমার জননী রে কবিতায় ইহা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

উন্নতিলক্ষণ ও জুতা আবিষ্কার নামে কল্পনায় দুটি শ্লেষাত্মক কবিতা আছে। এ দুটি কবির ব্যক্তিত্বের আর-একদিক প্রকাশ করিতেছে, কবি যে বলিয়াছেন একদিকে দেশের প্রতি প্রীতি, অন্যদিকে দেশ-হিতৈষিতার প্রতি উপহাস, এ দুটিতে সেই উপহাসের ভাব।

এই কাব্যে অনেকগুলি প্রেমের সংগীত আছে। এগুলির ভাষার সংহতি, কল্পনার ঐশ্বর্য ও সকরুণ মিনতির ভাব লক্ষণীয়।

এক্ষণে দুটি কবিতা রহিল, পিয়াসী ও পসারিণী। ভাবের দিক্ দিয়া ইহারা ক্ষণিকার আত্মীয়, ক্ষণিকার অগ্রদূত। কিন্তু ভাষা ও ভঙ্গীর দিক্ হইতে ইহাদিগকে কল্পনার পর্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। পিয়াসী প্রভাতবেলার কবিতা। প্রভাতের শান্তি ও স্নিগ্ধতা ইহার ছন্দে ও ভাবে। পসারিণী কবিতাটি মধ্যাহ্নের। দুপুরের ক্লান্তি ইহার ভাবে ও ছন্দে; ছন্দ যেন অবসন্ন হইয়া আর পা তুলিতে পারিতেছে না। নিরন্তর নব নব রচনাক্লান্ত কবির চিত্তে বিরামের ঘণ্টা বাজিতেছে। এই কবিতা দুটি পাঠককে ক্ষণিকার সেই বিশ্রাম-নিভৃত অন্তঃপুরের জন্য প্রস্তুত করিতে থাকে।

ক্ষণিকা

"রবীন্দ্রকাব্য লিরিক-প্রধান— ক্ষণিকা আবার সেই লিরিকের চূড়ান্ত। হিন্দু পঞ্জিকায় এক-এক বৎসরের অধিপতি এক-এক গ্রহ। ক্ষণিকার অধিদেবতা প্রধানতঃ শরৎকাল, কিংবা অন্যান্য ঋতুর কোমল রূপ। আমাদের ঋতুপর্যায়ে শরৎ সর্বাপেক্ষা সুকুমার। বর্ষা বসন্ত গ্রীষ্ম ক্ষণিকায় অত্যন্ত সংকোচে সম্ভ্রমে প্রবেশ করিয়াছে; অনধিকার-প্রবেশের ভয়ে তাহাদের উগ্রতা অনেকটা পরিমাণে পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছে। আবহাওয়ার এই শারদীয় সৌকুমার্যের মূলে কবির একটি বিশেষ মনোভাব। কি এই মনোভাবটি যাহা অন্যান্য কাব্য হইতে ইহাকে পৃথক আসন দিয়াছে, একবার দেখা যাক। ক্ষণিকার ভাব, ভাষা ও ছন্দের ত্রিস্রোতার মূলে এই অখণ্ড একটি মনোভাব বর্তমান।

২

ক্ষণিকায় কবি একেবারে লোকালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা জীবন-দেবতার আদর্শলোক নহে, দুঃখের খাদ নিঃশেষে গলিয়া গিয়া জীবন যেখানে নিকষিত সুবর্ণের দিব্যমূর্তি গ্রহণ করে। ইহা প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যলোকও নহে, বর্তমানের দিকৃচক্রের কালো মেঘখানা যেখানে অস্তমিত তপনের সুধা-সেচনে অতীতের নন্দনচ্ছায়া বিস্তার করে। না আছে ইহাতে জীবনরূপকে অতীতের সৌন্দর্যলোক হইতে দেখিবার চেষ্টা, না আছে ইহাতে জীবনদেবতাধিষ্ঠিত ভাবীকালের আদর্শরূপের মধ্যে তাহাকে সঞ্চারিত করিয়া দিবার প্রয়াস। বর্তমানের বাতায়ন হইতে কিয়ৎপরিমাণে নিরাসক্তভাবে জীবনের মুহূর্তগুলিকে দেখা হইয়াছে, এবং অবশেষে শেষ-যৌবনের সন্ধ্যাপ্রহরে সেগুলি একটি মালিকায় পরিণত হইয়াছে। জীবনের বিচিত্র ক্ষণের এই মালিকাই ক্ষণিকা। ইহার কোনোটি বা সুখে উজ্জ্বল, দুঃখে ম্লান; কোনোটি বা আনন্দের ভারে ছিন্নপ্রায়, কোনোটি বেদনায় টন্‌টন্ করিতেছে; সুখ দুঃখ, আশা নৈরাশ্য, গভীর নিষ্ফলতা ও পরম পরিতৃপ্তি, দীর্ঘ বিরহ ও ক্ষণিক মিলন একত্র বিরাজিত, একই শাখায় নীড় রচনা করিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে এমন অভিজ্ঞতা বিস্ময়জনক! কিন্তু পথের বাঁকে বাঁকে শক্তির নব নব বিস্ময়ের দ্বারা মুগ্ধ করাতেই তো প্রতিভার অভ্রান্ত পরিচয়।

৩

জীবনকে সহজভাবে দেখিবার এই দৃষ্টি, বলা বাহুল্য, কবি একদিনে লাভ করেন নাই; চৈতালিতে ইহার পূর্বাভাস। ক্ষণিকায় কবির প্রতিভা ও জীবন একবারের জন্য নিকটতম সংস্পর্শে আসিয়াছে— ব্যোমপথবিহারী অনেক ধূমকেতু যেমন একবারমাত্র পৃথিবীর কাছে আসিয়া আবার অনন্ত আকাশে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়— পুনরায় স্বাভাবিক অন্তরীক্ষ-মণ্ডলে ফিরিয়া গিয়াছে।

জীবনের ঘটনা যতক্ষণ ভাবরূপ না পায় ততক্ষণ তাহা কবিকে কাব্য-প্রেরণা দেয় না— এই ভাবরূপাশ্রয়ী জীবনই রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে "বস্তুতন্ত্র" নাই বলিয়া যে অনেকে মনে করেন, তাহার কারণ ইহাই। বস্তুতন্ত্র কি জিনিস এবং কাব্যে তাহা ঠিক কেমন ভাবে থাকে— সে ধারণা আমার নাই। মাটি একটা বস্তু— কিন্তু তৎনির্মিত পুতুল দেখিয়াও যদি দর্শকের কেবল মাটির কথাই মনে জাগে তবে বুঝিতে হইবে বস্তুতন্ত্র আছে, কিন্তু তাহা দর্শকের মনে, কারণ শিল্পীর সকল চেষ্টাই এখানে মাটি। যাহা হোক, আশা করা যায় এই বস্তুতন্ত্রবাদী পাঠক ক্ষণিকাতে অবিকৃত জীবনের গন্ধ কিছু কিছু পাইবেন— কারণ, কবি জীবনকে যতদূর সম্ভব অবিকৃত রাখিয়া কাব্যবস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। 'যেমন আছ তেমনি এস' ইহাই ক্ষণিকার শিল্পরহস্যের মূলমন্ত্র। ইহার মূলে নিরাসক্ত যৌবনের প্রৌঢ় কবিচিত্ত। সোনার তরী ও চিত্রার কবিদৃষ্টি সম্পূর্ণ নয়, কাজেই সহজও নয়। সেখানে কবি জীবনকে আদর্শায়িত করিয়া তুলিয়াছেন, আর আদর্শায়িত করা মানেই জীবনের উপর ছাঁটকাট করা। দুঃখ-ছাঁটা জীবন আনন্দে আদর্শায়িত; মলিনতা-ছাঁটা জীবন সৌন্দর্যে আদর্শায়িত; ইহারা আর যাহাই হোক সম্পূর্ণ নয়, কাজেই সহজ নয়। পূর্বোক্ত দুই কাব্যে জীবনকে আদর্শায়িত করিয়া কবির সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা; কিন্তু ক্ষণিকায় সুরের পরিবর্তন হইয়াছে— "সত্যেরে লও সহজে।" এই সহজভাবে সত্য অর্থাৎ জীবনকে গ্রহণ করিবার চেষ্টায় ক্ষণিকার বিকাশ। কাব্য হিসাবে ইহার কি মূল্য জানি না, এবং বস্তুতন্ত্র হিসাবে কি পরিমাণে বাস্তবতা লাভ করিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না, কিন্তু এই দৃষ্টিতে জীবনের দিকে তাকাইয়া কবি তাহার একটা নূতন রূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছেন— অন্যান্য কাব্যের তুলনায় ইহাতেই ক্ষণিকার বিশেষত্ব।

ইহা ক্ষণিকার মূল কথা। মূল তো মাটির মধ্যে গুপ্ত থাকে— তাহার বিকাশ দেখিতে পাই ফুলে ফলে লতায় পাতায়, যাহা চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত। ক্ষণিকার এই মৌলিক তত্ত্ব প্রধান কি রূপ গ্রহণ করিয়া পাঠকের সম্মুখে আবির্ভূত এখন তাহা দেখিব। প্রথমেই লক্ষ্য হয় ইহার ভাবাও স্মিতরস। স্মিতরস বলিয়া কোনো রস অলংকারশাস্ত্রে নাই, কিন্তু জীবনে আছে। হাসি ওষ্ঠাধরে বিকসিত হইয়া আপনার পরিচয় দেয়— কিন্তু এই বাহ্য কায়িক লক্ষণের তলে মনের একটি প্রসন্ন ভাব আছে। এই প্রসন্ন ভাবের প্রবলতা যখন এই পরিমাণে হয় যে তাহা ওষ্ঠাধরের কূল ছাপাইয়া যায়, আলংকারিকদের কাছে তাহাই হাস্যরস। কিন্তু এই প্রসন্নতার বেগ যদি অপেক্ষাকৃত মন্দ হয়, যাহাতে মনটা শুধু কৌতুকের আবেগে ভিজিয়া উঠিল মাত্র, কিংবা ওষ্ঠাধরের প্রান্তে একটি শুভ্র রেখা টানিয়া গেল, তাহাকে কি বলিব? ইহাই আমাদের স্মিতরস। জীবনশাস্ত্রের আলংকারিকেরা ইহার সহিত সুপরিচিত, জীবনের ইহা শ্রেষ্ঠ অলংকার। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। দুষ্মন্ত যখন মারীচের তপোবনে ক্ষুদ্র একটি মানবকে বলপূর্বক পশুরাজের মুখব্যাদান করিয়া দাঁত গুণিতে দেখিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার অধরপ্রান্তে বিস্ময়-কৌতুকে একটি শুভ্র রেখা তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছিল— ইহাই স্মিতরস। ইহাকে হাস্যরস বলিলে ভুল হইবে। আবার যেদিন কবি কালিদাস, জোর করিয়া সিংহের মুখ খুলিয়া দন্ত-গণনারত শিশুর ছবিখানি কল্পনায় দেখিতে পাইলেন, সেদিন তাঁহারও অধরপ্রান্তে একটি রজতরেখা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। একদিকে একটা বৃহৎ পশুর মুখ খুলিয়া বিশেষ করিয়া দাঁত গুণিতে শিশুর কৌতূহল, অন্য দিকে এই চিত্র কল্পনায় দেখিয়া কবির কৌতুক। এই কৌতূহল ও কৌতুকের সমমনোভাবে দুইজনের একাত্মকতার বোধ। স্মিতরসের মূলে পরস্পরের সহিত এই একাত্মকতার অনুভূতি।

ক্ষণিকায় এই স্মিতরসের মূলে 'কবির একাত্মকতার বোধ'—একাত্মকতার বোধ, ভাল মন্দ, ছোট বড়, সত্য মিথ্যা, এক কথায় অবিকৃত সমস্ত জীবনের সঙ্গে। ইহা ঘটিয়াছে বলিয়াই কথায় কুথায় যেখানে-সেখানে যে-কোনো প্রসঙ্গে, এমন কি দুঃখের আবেগেও কবির ওষ্ঠাধরে ক্ষণে ক্ষণে কৌতুক-কণার বিস্ফুরণ হইয়াছে।

তার পর ইহার ভাষা। ইহাও এই সহজ দৃষ্টির ফল। ইহাতে কবি প্রথম ধারাবাহিকভাবে বাংলা দেশজ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এতদিন যে সব শব্দ সাহিত্যের নিম্নস্তরে অন্ত্যজের মত দিনপাত করিত, তাহারা প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে আশ্চর্য নিপুণতার সহিত যথাস্থান অধিকার করিয়া লইল। এই দেশজ অসংস্কৃত ভাষা সহজ প্রাণের উচ্ছ্বসিত আনন্দ-নৃত্যের তালে তালে এমন বাজিয়া উঠিল যে, কোনো সংস্কৃত ভাষার দ্বারা তেমনটি ঘটিত না। ক্ষণিকাতে শুধু যে আমরা দেশের পল্লীগুলির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই তাহা নয়, শব্দগুলিরও বিশেষত্ব বুঝিতে পারি। মলিয়ারের সেই হঠাৎ-নবাবের মত বলিয়া উঠিতে ইচ্ছা করে, কি আশ্চর্য, এই শব্দগুলি এতদিন ব্যবহার করিতেছি, ইহাদের মধ্যে এত সংগীত ছিল তাহা কে জানিত! দেশী শব্দ ব্যবহারের মস্ত একটা সুবিধা, তাহাতে যথেচ্ছ হসন্ত ব্যবহার করা চলে - এই হসন্তের প্রাচুর্যে ছন্দের ক্ষিপ্রতা ও লঘুতা বাড়ে। আমরা যখন সাধারণভাবে হাঁটিয়া চলি তখন পা সমতল ভাবে মাটিতে পড়ে কিন্তু নাচের সময়ে পা কখনো পুরা পড়ে, কখনো অর্ধ কখনো সিকি, কখনো বা একেবারে তাল ফাঁক পড়িয়া যায়। হসন্ত এই নাচের সময়ে হাল্কা ভাবে পা ফেলা। সংস্কৃত শব্দগুলি গম্ভীর— তাহারা নাচিতে জানে, কিন্তু সে এমন যেমন-তেমন-খুশির অকারণে অসময়ে অত্যন্ত সহজ নৃত্য নয়; তাহাদের সাজসরঞ্জাম আসর-আসবাব অনেক।

এই সহজ দৃষ্টির প্রেরণায় কবি জীবনের ভঙ্গুর ক্ষণগুলির যে পুতুল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার উপকরণ সংস্কৃতবহুল বাংলাও নয়, আর সোনার তরী চিত্রার মেঘনির্ঘোষ ছন্দও নয়। ইহার স্বাভাবিক উপকরণ ক্ষণিকার ভাষা ও ছন্দ. কবির যে সহজ দৃষ্টি লাভ ঘটিয়াছে তাহার আর যদি কোনো প্রমাণ না-ও থাকে ইহার ভাষা ও ছন্দই যথেষ্ট; কারণ ভাব ও ভাষার মধ্যে যে শুধু সংগতি থাকে তাহা নয়; ভাষাই ভাব।

যে সহজ দৃষ্টির ফলে ক্ষণিকায় স্মিতরস ও ভাষার এই নবমূর্তির আবির্ভাব, তাহাই জগতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটাইয়াছে; প্রকৃতি, নরনারী ও কাল— এই তিন ক্ষেত্রেই দেখিতে পাইব কবির দৃষ্টি পূর্বোক্ত কাব্য হইতে স্বতন্ত্র, এবং সে স্বাতন্ত্র্যের মূলে কবির এই সহজ দৃষ্টি।

পূর্ববর্তী কাব্যের কবি প্রকৃতিকে বৃহৎ পটের উপর মোটা তুলিতে উজ্জ্বল রঙে আঁকিয়াছেন— ইহা শিল্পীর মনের আবেগ ও ভাবাতিশয্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু এখানে

দেখি, ছবিগুলি ছোট, দৃশ্যগুলি অতি পরিচিত, আর রঙের মধ্যে উগ্রতা মোটেই নাই। অন্যান্য দৃশ্যের মধ্যে সন্ধ্যা-আকাশটি কবির বড়ই প্রিয় দেখিতেছি, তাহাও আবার শরৎকালের। অনেকগুলি ফুলের উল্লেখ আছে, কিন্তু দু-একটি স্থান ব্যতীত কোথাও রক্তবর্ণের ফুলের উল্লেখ নাই— সমস্তই চাঁপা, যূথী, বকুল, শিরীষ, হেনা, কদম, কাশ এবং শস্যশূন্য মাঠ। প্রকৃতির সভায় ইহারা নিতান্ত নরমপন্থী।

মানুষকে এখানে বৃহৎ পটে অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির সহিত একাঙ্গ করিয়া উল্লেখ করা হয় নাই; মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে, অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন করিয়া ছোট করিয়া আঁকা হইয়াছে, এবং সে-ব্যক্তিও এমন, কোনো ইতিহাসে যাহার উল্লেখের কোনো সম্ভাবনা নাই। ইহা প্রেমের ক্ষেত্রে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। চিত্রায় কবি প্রিয়ার প্রেমে প্রেমের সম্রাট্ হইয়া চিরন্তন প্রেমিকযুগ্মসমূহের স্বর্গ-সুখের অমরাবতীতে বিচরণে রত। কিন্তু ক্ষণিকায় "তোমার আমার এই যে মিলন, নিতান্তই এ সোজাসুজি।" ছোটখাটো সুখদুঃখ ও সহজ সরল প্রেমের কাহিনীর কাব্য এই ক্ষণিকা।

ক্ষণিকা পলায়নপর বর্তমান মুহূর্তের কাব্য। অতীত ও ভবিষ্যৎ এখানে কবির চিন্তার বাহিরে। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান কাল প্রত্যক্ষ সত্য, অন্য দুইটা কল্পনার ও যুক্তির সার্থকতাস্বরূপ। যাহা প্রত্যক্ষ সত্য, তাহাই সহজ— এই সহজ রসের বলেই কবি বর্তমান কালটিকে প্রধান উপজীব্য করিয়াছেন। 'সেকাল' কবিতাটিতে বর্ণনা-অংশ সেকালের, কিন্তু সান্ত্বনার অংশ একালের,— কাজেই এখানেও বর্তমানের জয়। পূর্বেই বলিয়াছি ক্ষণিকার কালাধিপতি শরৎ। ইহার মূলেও এই একই সহজ রস। ঋতুর মধ্যে শরৎ শিশু— শিশুর সরলতা, নির্মলতা, বন্ধনবিমুক্তি, আসক্তিহীনতা, লঘুতা ও যথেচ্ছকারিতা শরতেরও বিশেষত্ব। যেখানে অন্যান্য ঋতুর উল্লেখ, সেখানেও তাহাদের মূর্তি তেমন উগ্র নয়। বর্ষা-বসন্তও শরতের স্বচ্ছ উত্তরীয়খানা পরিয়া আসিয়াছে। 'নববর্ষা'তে ইহার ব্যতিক্রম, ভাবে ভাষায় কিছুতেই ইহাকে ক্ষণিকা-পর্যায়ে ফেলা চলে না— ইহা কবির অন্য মনোভাবের প্রক্ষেপ। উদাহরণের ব্যত্যয় নিয়মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপন করে মাত্র।

ক্ষণিকার মনোভাব সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলিলাম, কবিতাগুলি সম্বন্ধে বিশিষ্টভাবে তাহা প্রযোজ্য। কবিতাগুলিতে মোটামুটি নিম্নলিখিত

ভাবে ভাগ করা চলে— মানুষ-প্রধান, প্রকৃতি-প্রধান, ক্ষণিকার ব্যতিক্রম ও জীবনদেবতা।

মানুষ-প্রধান ভাগে কবির নিজের কথাও আছে। ইহা ছাড়া প্রথম কবিতা 'উদ্বোধন' ইহাতে 'ক্ষণিকার মূল সুরটি ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্বকথিত সহজ রস সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
আজিকার মত যাক্ যাক্ চুকে
যত অসাধ্য-সাধনি।
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি,
ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি!

এই ক্ষণিক সুখের উৎসবে সকলের প্রতি কবির আহ্বান, সকলেই আসিয়াছে; তবে জীবন-উত্তরীয়ের যে-দিক্‌টাতে সহজ মনের স্বচ্ছতা সকলের গায়েই সেই দিক্‌টা দৃশ্যমান। মানুষের সঙ্গে মানুষের সকল সম্বন্ধকেই কবি স্মিতরসের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন— প্রথমে কবির নিজের কথাই দেখা যাক্।

ক্ষণিকার কবি বারো আনা মানুষ, তাঁহাকে কবি হিসাবে বুঝিতে গেলে সিকিও বোঝা যাইবে না, মানুষ হিসাবে দেখিলে কবি ও কাব্য একসঙ্গে ধরা দিবে।

কাব্য পড়ে যেমন ভাব
কবি তেমন নয় গো।
আঁধার ক'রে রাখেনি মুখ,
দিবারাত্র ভাঙছে না বুক
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
হাস্যমুখেই বয় গো।

আর-দশ জনের সহিত, তাঁহার বিশেষ অমিল নাই, ভক্ত পাঠক ইহাতে ভগ্নোৎসাহ হইতে পারে, কিন্তু কবিই নিজে সাবধান করিয়া দিতেছেন—

কাব্য দেখে যেমন ভাব
কবি তেমন নয় গো।

সে—

চাঁদের পানে চক্ষু তুলে
রয় না পড়ে নদীর কূলে,

এবং কবির প্রার্থনা বোধ হয় কবির প্রতিই—

কাব্য যেমন, কবি যেন
তেমন নাহি হয় গো।
বুদ্ধি যেন একটু থাকে,
স্নানাহারের নিয়ম রাখে।
সহজ লোকের মতই যেন
সরল গদ্য কয় গো।

কবি অন্যত্র কবির যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে কবিকে বাহিরে খুঁজিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেখানে কবি-অংশের প্রতিই জোর। কিন্তু এখানে মানুষ-অংশটাই প্রধান— যে-মানুষ আর দশজনের মত গদ্য-মানুষ। এই মানুষ-অংশ-প্রধান কবির মোটেই খেয়াল নাই যে তাহার চুলে পাক ধরিয়াছে, এবং শাস্ত্র-অনুসারে এটা পরকালের ডাক শুনিবার বয়স। তিনি পরকালের ডাক শুনিতে বসিলে ইহকালের সুখদুঃখ-আশাভরসার সংগীতের রসদ জোগাইবে কে ?

কবির চেয়ে তাঁহার কাব্যও কম যান না, কবিরই কাব্য তো! তিনি যে যথাস্থানটি বাছিয়া লইয়াছেন, তাহাতে কবির অসন্তোষের কোনো লক্ষণ নাই, এবং বোধ করি ক্ষণিকার পাঠকেরাও সেই স্থানে অনধিকার-প্রবেশে দ্বিধা না করিতে পারেন। মানুষ-অংশটা আজ কবির মধ্যে এত উগ্রভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, কবিতার প্রতি আসক্তিও আজ একান্ত মন্দ! আজ কবিতা লেখার লগ্ন নয়। কবিতা সেইদিনের

ভাগ্য যবে কৃপণ হয়ে আসে—

তখন যেন হতভাগ্য কবি ঘরে খিল আঁটিয়া মিল খুঁজিয়া মরে। কিন্তু আজ যখন সৌভাগ্যক্রমে

অরুণ ঠোঁটে তরুণ ফোটে হাসি,
কাজল চোখে করুণ আঁখিজল,

তখন যেন ক্ষ্যাপা কবি থাতা পুড়াইয়া হঠাৎ-পাওয়া জীবনটাকে উপভোগ করিয়া লয়।

কাব্যের সিংহদ্বারে কবির সঙ্গে পরিচয় হইল— ভালোই; নতুবা অনেক কথাই ভুল বুঝিবার আশঙ্কা ছিল।

সোনার তরীতে কবি মানসসুন্দরীর অনুসন্ধানে জীবমের এবং পূর্বজীবনের কোন্ রহস্যগভীর অতলতার মধ্যে তলাইয়া গিয়াছেন; চিত্রায় প্রেমের অমরাবতীতে দময়ন্তী-মহাশ্বেতা-উমা-সুভদ্রার সান্নিধ্যে আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু ক্ষণিকায় তাহার কোনো চিহ্ন নাই। এখানে ভালোবাসার সময়ও যেমন অল্প, স্থানও তেমনি সংকীর্ণ।

আজকে শুধু একবেলারই তরে,
　　আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর...
ক্ষুদ্র আমার এই অমরাবতী
　　আমরা দুটি অমর, দুটি অমর।

ইহাতে কোনো ক্ষোভ নাই— সামান্য একটু বিরলতা পাইলেই তিনি খুশি। আর সে বিরলতা যদি সংসারে না জোটে, কাহারো সহিত দ্বন্দ্ব নাই, তিনি নীরবে বিনা অভিযোগে যৌবনের বানপ্রস্থে বনে প্রস্থান করিতে রাজি।

হঠাৎ এই পরিবর্তনের কারণ কি? ইতিপূর্বে প্রেমকে পুরাপুরি কবির দৃষ্টিতে দেখিতেন; সে প্রেম এতই অপার্থিব যে, সমস্ত জীবন এবং ধরিত্রী তাহার পাদপীঠের পক্ষে অত্যন্ত সংকীর্ণ মনে হইত। আজ মানুষ-অংশ-প্রধান কবির দৃষ্টিতে প্রেমকে জীবনের মধ্যে নিহিত দেখিলেন; শুধু তাহাই নহে, জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ রূপে দৃষ্ট হইয়া বিশ্বব্যাপী প্রেম আর-দশটা জিনিসের সহিত সমান আসন লাভ করিয়া অনেকটা সুস্থ ও সহজ।

হৃদয়পানে হৃদয় টানে,
　　নয়নপানে নয়ন ছোটে,
দুটি প্রাণীর কাহিনীটা
　　এইটুকু বই নয়কো মোটে।...
তোমার আমার এই যে প্রণয়
　　নিতান্তই এ সোজাসুজি।

এ প্রেমের দৃষ্টি সোনার তরী চিত্রার কবির নয়।

মধুমাসের মিলন মাঝে
মহান্ কোনো রহস্য নেই...
ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে
খুঁজিনে ভাই ভাষাতীত,
আকাশপানে বাহু তুলে
চাহিনে ভাই আশাতীত,
যেটুকু দিই, যেটুকু পাই,
তাহার বেশি আর কিছু নাই,
সুখের বক্ষ চেপে ধরে,
করিনে ভাই যোঝাযুঝি।

এ কথা কবির মুখে নূতন বটে, নূতন কিন্তু একান্তভাবে স্বাভাবিক; প্রেম যতই মহান্ হোক, জীবনে তাহারও একটা সীমা আছে, তাহাকে একাধিপতিত্ব দিলে চলে না, অন্যান্য কাজকেও কিছু স্থান ছাড়িয়া দিতে হয়—এ সেই পরিণত প্রেমের বর্ণনা।

প্রেমে যেমন আর অগস্ত্যতৃষ্ণা নাই, বিরহও তেমনি বুকফাটা-ক্রন্দনহীন। মিলন যেমন স্বাভাবিক, বিরহও তেমনি। বিচ্ছেদের দীর্ঘদিনে প্রিয়তমের জন্য শোক করিতে ইচ্ছা যে না করে এমন নয়, কিন্তু মস্ত এক অসুবিধা,-অবসর নাই, জীবনে আর দশটা কাজ আছে, আর পাঁচজন লোক আছে, আবার পথের বাঁকে বাঁকে, নব নব দিগন্তের ধারে নূতন নূতন মুখচ্ছবি জাগিয়া উঠিয়া চিত্তাকাশে নবতর ছায়া সঞ্চার করে।

এমন সময় নতুন আঁখি
তাকায় আমার গৃহদ্বারে—
চক্ষু মুছে দুয়ার খুলি
তারেই শুধু আপন জেনেই ;—
কখন তবে বিলাপ করি ?
সময় যে নেই, সময় যে নেই !

জীবন এমনই অদ্ভুত, যে বিরহের সময়েও দীর্ঘকালব্যাপী শোকের উপায় নাই, তবে কি আছে? না একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার মত সময়!

জীবনে বারো আনা দুঃখের মূলে ভুল-বোঝা; আবার বারো আনা ভুল-বোঝার মূলে মনের ভুল পরিচয়। এই মন পদার্থটা মনুবংশীয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কিন্তু এটা আবার তাহার শ্রেষ্ঠ বিপদেরও হেতু বটে। সারাজীবন ইহার সহিত ঘর করিয়া গেলাম, কিন্তু এখনও দেখা মিলিল না; যখন দেখা মিলিল ভাবিয়া নিশ্চিন্ত, তখন কি ঘটিয়াছে, না, শিশু-কাহিনীর সেই কুমীরটার মত, শিয়ালের পাখানা মনে করিয়া, বটগাছের শিকড়টা ধরিয়া বসিয়া আছি। এই অন্তঃশায়ী গোপন পদার্থটার প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ নাই; ভাবে ভঙ্গীতে, আকারে ইঙ্গিতে, কথাবার্তায়, অর্থাৎ বাহ্য প্রকাশে তাহাকে বুঝিয়া লইতে হইবে। অথচ বহু যুগ একত্র বাস করিয়াও মন ও দেহে সম্পূর্ণরূপে বোঝাপড়া হয় নাই, একে অন্যের ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ইহাতেও যে কাজ চলে তাহাই আশ্চর্য। কাজ চলে, কিন্তু জীবনের বারো আনা দুঃখ-কষ্টেরও সৃষ্টি করে। মন বলিয়া আমরা যাহাকে নিশ্চিন্ত জানিয়া রাখি, একদা কোন্ বিপদের মুহূর্তে বুঝিতে পারি, মোটেই তাহা মন নয়— অকস্মাৎ অসময়ে মেকি বাহির হইয়া পড়ে।

মন নিয়ে কেউ বাঁচে না কো
মন বলে যা পায় রে
কোনো জন্মে মন সেটা নয়
জানে না কেউ হায় রে!
ওটা কেবল কথার কথা,
মন কি কেহ চিনিস?
আছে কারো আপন হাতে
মন বলে এক জিনিস?
চলেন তিনি গোপন চালে
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে।
কেই বা তারে দিচ্ছে, এবং
কেই বা তারে নিচ্ছে।

চাই নে রে, মন চাইনে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই—
যে হাসি আর যে কথাটাই
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নে রে, মন, তাই নে।

মন তো এইরকম পদার্থ; তাহাকে উপেক্ষা করিয়াও সংসারের স্থূল কাজগুলি একরকম চলিয়া যায় বটে, কিন্তু আবশ্যক হইলেই যে তাহাকে মিলিবে, এমন কথা নাই। আর দিই বা মেলে হয়তো দেখিব কীটের সন্ধানে হৃদয়-গহ্বরে হাত দিয়া কেউটে সাপ টানিয়া বাহির করিতে হইল, অতএব গভীরভাবে তল্লাস না করিয়া "মুখের মধ্যে যেটুকু পাই"—ইত্যাদি। আরো মজা, সংসারের রাজপথে বুদ্ধি যে-পথে চলে, মনের চাল অনেক সময়েই তাহার বিপরীত। গভীর কথা বলিলে ঠাট্টা মনে করে, ঠাট্টাকে অকাট্য সত্য বলিয়া ধরিয়া লয়— পরিহাস ও সত্যের 'কমেডি অব্ এররস্' তো সংসার-রঙ্গমঞ্চে এ জন্য লাগিয়াই আছে। কাজেই হৃদয়ে যখন গভীর ব্যথা, তাহাকে লঘু করিয়া কথা কহিতে হয়। আর বিদ্রূপের উচ্চহাস্যকে অশ্রুজলের উজান ঠেলিয়া ছাড়া পাঠাইবার উপায় নাই। সুখের দিনে ব্যথা দেওয়া, ব্যথার দিনে সুখের ভান— এ করিতেই হয়, কারণ মন মহাশয়ের চাল যে উল্টা। অশ্রুজলের সরোবরে নভঃশায়ী মাছটা দেখিতেছি অধোবদনে, কিন্তু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বাণটা নিক্ষেপ করিতে হয় ঊর্ধ্ব দিকে।

এমন অদ্ভুত যাহার স্বভাব, তাহার উপর জুলুম চলে না। দৈবাৎ যদি মন পাওয়া যায় ভালো, আবার দৈবাৎ যদি মন দিয়া ফেলি ভালো; ইহার অধিক আর মানুষে কি করিতে পারে? কারণ—

চলেন তিনি গোপন চালে
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে।
কেই-বা তাঁরে দিচ্ছে এবং
কেই-বা তাঁরে নিচ্ছে।

এই হাস্যকর ও প্রাণান্তকর সত্যটা বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই মন-দেওয়া-

নেওয়া সম্বন্ধে কবির এই প্রকার অনির্দিষ্ট শৈথিল্য। তুমি যদি মন না দাও তবু দুঃখ নাই—

তুমি যদি আমায় ভালো না বাসো
রাগ করি যে এমন আমার সাধ্য নাই :

আসল কারণ, তোমার মনের মালিক তুমি নিজেও নও। আবার, আমাকে মন দিলেও ভাবনার অন্ত নাই—

আমায় যদি মনটি দেবে,
দিয়ো, দিয়ো মন।
মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু
রেখো সারাক্ষণ।

ইহার সরল টীকা এই যে, মনের বদলে মন না পাইলে দুঃখ করিয়ো না, কারণ আমার মনের মালিক আমি নিজে নই।

এমন অবস্থায় বুদ্ধিমানের লক্ষণ, হাতে হাতে যাহা পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করা। ইহাতে অল্প হইলেও কিছু পাওয়া যাইবে, নতুবা, এমন অদ্ভুত জিনিসের বাজারে পাইকারি কারবার করিতে গেলে ঠকিবার আশঙ্কাই ষোল আনা। হাতে হাতে পাইয়াও বেহাত হইয়াছে এমন নজিরের অভাব নাই। 'মরু-পাহাড়ের দেশে পথ চলিতে একটি আঙুর ফল পাইয়াছিলাম। দারুণ তৃষ্ণাতেও তাহা ব্যবহার করি নাই; মুঠার মধ্যে চাপিয়া পথ চলিয়াছি।' তৃষ্ণা-দীর্ঘ সংসার-পথে এমনি করিয়া কত না দুর্লভ আঙুর ফল আমরা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি; কেননা, বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের কাছে বাঁধা দিয়া 'আরো-চাই'র ভাণ্ডার দ্বারে মাথা ঠুকিয়া মরার লোভ সংবরণ করিতে পারি না। মনের এই যে নূতন পরিচয় ইহাও কবির সহজরসজাত।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি এই সহজরসের প্রকাশ কবির জীবনের যৌবন-বিদায়-প্রসঙ্গে। ক্ষণিকা-কাব্য যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সীমান্ত; 'কিন্তু দুই রাজ্যের সীমান্তে শত্রুতার চিহ্ন বড় বড় দুর্গে কণ্টকিত হইয়া বিরোধ প্রচার করিতেছে না। দুই মিত্ররাজ্যের সন্ধিস্থল অমনোযোগী দর্শকের চোখেই পড়ে না, কেবল সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিলে একটা পরিবর্তন ধরা পড়ে। এ যৌবন-বিদায় অনিচ্ছুক যযাতির ক্ষুব্ধ ক্রন্দনে ধ্বনিত নহে; দিবস-সন্ধ্যায়

যেমন, নদী-সমুদ্রে যেমন, ফুল-ফলে যেমন, অতি অনায়াসে, অতি অলক্ষ্যে, একটির আর-একটিতে পরিণতি।

হায় রে মিছে প্রবোধ দেওয়া,
অবোধ তরী মম
আবার যাবে ভেসে।
কর্ণ ধ'রে বসেছে তার
যমদূতের সম
স্বভাব'সর্বনেশে।

যে শান্তি ও নির্বেদে কবি যৌবনকে বিদায় দিলেন, তাহা কবির জীবনের শেষ কথা নয়; পরবর্তী জীবনে নানা প্রবলতর স্রোতে শান্ত এই নদীকে পুনরায় স্ফীত করিয়া তুলিবে।

যাহা হোক, এই রকম বিষাদপূর্ণ বিরতির সহিত কবি চল্লিশের ঘাট হইতে যৌবন-তরীকে বিদায় দিয়াছেন। এই তরীর বাণিজ্যে তাঁহার কত লাভ হইয়াছে, সে হিসাব তিনি করিলেন না, শুধু মনে একটা ক্ষীণ আশার মত রহিল যে, এতবারের আনাগোনায় যদি কোনো সোনা-করা চরণ ইহাতে পড়িয়া থাকে, তবে ইহার অস্তিত্ব সার্থক!

একে একে আমরা কবির ব্যক্তিত্বকে নানা দিক্ হইতে দেখিলাম, এখন সেই ব্যক্তি আমাদিগকে কি ভাবে দেখিয়াছে, তাহার আলোচনা আবশ্যক। সংসারের প্রতিও কবির এই রকম একটা নিরভিমান বিরতির সুর।

সংসারের সুদীর্ঘ যাত্রায় অনেক সুখ ও ব্যথা কবি পাইয়াছেন, কিন্তু আজ পথের শেষে কি বাকি রহিল! সংসারের গোলাপ ঝরিয়া গেল, কাঁটার আঘাত শুধু রহিল। ভবিষ্যতের শাখায় সংসারের আরো অনেক ফুল ফুটিবে, কিন্তু তাহা সম্ভোগের সুযোগ কবির হইবে না। কিন্তু তবু কবির ইহাতে ক্ষোভ নাই, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস মাত্র। 'স্থায়ী-অস্থায়ী' কবিতাটিতে যে সুর, সংসারের প্রতি মনোভাবের তাহা প্রতীক।

কোথায় দুই বোন জল আনিতে গিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া একবার সকৌতুক হাস্য বিনিময় করিল; ব্যস এইটুকু, তাহাতেই কবির সন্তোষ! আর সেই যে মেয়েটি খেয়া-নৌকায় ধানের আঁটি বহিয়া পার হইয়া গেল, কিন্তু ঠিকানা

বলিয়া গেল না! চিত্তপটে কবি তাহাকে বার বার আঁকিতে ও মুছিতে লাগিলেন, কিন্তু বস্তুজগৎ-গত ঐ মেয়েটিকে একবারও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

তাঁহারা দুইজন এক গাঁয়ে থাকেন— এই তো যথেষ্ট! তাঁহার নামটা গাঁয়ের পাঁচ জনে জানে। ইহাতেই কবির সন্তোষ! বাস্তবিক জীবনে কি ইহার অধিক আর কিছু সত্যই পাওয়া যায়! আর সেই যে ময়নাপাড়ার মাঠে আসন্ন বাদলের আনতচ্ছায়ায় বালিকাটি! গাঁয়ের লোক যাহাকে কালো বলে, কবি যাহাকে নাম দিয়াছেন কৃষ্ণকলি! আষাঢ়ের অঞ্জনাভ কালো মেঘের সহিত মিলিয়া গিয়া তাহার কালো দৃষ্টি কবির প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল কি না আজ তাহা কেবল অনুমানের বিষয়!

আজ সব জিনিসকেই, শুধু সেই অজ্ঞাতনাম্নী নারীটিকে নয়, তিনি বলিতে পারেন—

যেমন আছ তেমনি এস
আর কোরো না সাজ!...
এসো হেসে সহজ বেশে
নাই বা হল সাজ।

সুখ-দুঃখ কিছুই সংসারের একান্ত নয়। সুখটাই তো একক নয়। রথের মেলায় তালপাতার বাঁশি হাতে মেয়েটির পাশেই, সেই রোরুদ্যমান বালকটি, একখানি রঙিন লাঠি কিনিতে যাহার একটি পয়সা নাই। দুই-ই আছে, দুই-ই সমান সত্য। সুখদুঃখের সাম্যে সংসারের তুলাদণ্ডে ভারসাম্য ঘটিয়াছে। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় দুর্দিনের ঝাপটায় যখন মন উদ্‌ব্যস্ত, তখন ছেলেবেলার তুফানে নালার জলে নৌকাডুবির কথা মনে পড়িয়া যায়! তোমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোনোটাই আসে নাই। তাহার নিয়মে সে আসিল, নৌকার নিয়মে নৌকা ডুবিল। অনেক সুখ তো পাইয়াছ, দুঃখও কিছু পাইবে, এই তো সত্য!

তোমার মাপে হয়নি সবাই,
তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়,
কেউ বা মরে তোমার চাপে;—

তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমনি কিসের টানাটানি ?
তেমন ক'রে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।...
মান্ধাতারি আমল থেকে
চলে আসছে এমনি রকম ;
তোমারি কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম ?

সংসারের হাটে বেচাকেনায় কবি অনেক ঠকিয়াছেন ; তবু নিরবচ্ছিন্ন ফাঁকি তাঁহার ভাগ্যে নয়। ক্ষতি যতই হোক-না কেন, প্রহরীর পণ, পারানীর কড়ি, দোকানীর মূল্য, ভিক্ষার দান, এমন কি দস্যুর লোভ মিটাইয়াও গৃহের জন্য সর্বদাই কিছু থাকে। তবে ইহা নির্ভর করে নিজের দৃষ্টির প্রতি।

তেমন ক'রে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।

'উদাসীন' ও 'শেষ' নামে কবিতা দুইটিতে কবি এই ভাবটিকে বিশদ ও গভীরতর ভাবে পরিণতির মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্বলিখিত অংশের সহিত এ দুইটি জুড়িয়া পড়িলে কবির বক্তব্য ও তৎপ্রসঙ্গে এই আলোচনা সর্বাঙ্গীণতা লাভ করিবে। এতক্ষণ যে সংসারের কথা বলিলাম, কবির ব্যক্তিত্ব হইতে তাহা স্বতন্ত্র। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আর দুই পর্যায়ের কবিতা আছে, প্রকৃতি ও কাল-বিষয়ক, যাহার আলোচনা এই প্রসঙ্গে কর্তব্য।

মানব ও প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতায় বস্তুতঃ ভাগ করা চলে না, তবে যাহাতে প্রকৃতির সহিত একাত্মকতা অধিকতর, তাহাকে আলোচনার সুবিধার জন্য স্বতন্ত্র ধরিয়া লইয়াছি। কবিচিত্তের সহজ রসবোধ, প্রকৃতির সরল ও আপাততুচ্ছ দৃশ্যগুলিতে প্রতীক খুঁজিয়া লইয়াছে। পল্লীগ্রামের পথ ; বর্ষার গত-উদ্বেলতা নদীর পার ; শারদীয় স্বচ্ছ আনন্দের মধ্যে শুভ্রকাশহিল্লোলিত নদীর চর ; মেঘমুক্ত বর্ষা-প্রভাত ; আসন্ন আষাঢ়ের ছায়া-গভীর অপরাহ্ণে দুইটি করুণ চক্ষু— ইহাই প্রধানতঃ কবির উপজীব্য। বর্ষার দুইটি কবিতা আছে, 'আষাঢ়'-ও 'নববর্ষা'। 'আষাঢ়' কবিতাটিতে বর্ষার গম্ভীর রূপের প্রতি তত লক্ষ্য নাই,

যতটা তাহার মানুষ-ঘেঁসা মূর্তিটিতে। 'নববর্ষা'তে মনুষ্যলোকাতীত বর্ষার নিজস্ব গম্ভীর মূর্তি। নানা কারণে ইহা ক্ষণিকা পর্যায়ের নহে।

গাঁয়ের পথে চলেছিলেম
অকারণে;
বাতাস বহে বিকাল বেলা
বেণুবনে!

কোকিল-ডাকা পথ দিয়া কবি নিজ মনে চলিয়াছেন। মানুষের কথা প্রত্যক্ষতঃ তাঁহার মনে নাই, কেবল আভাসতঃ বার-দুই গৃহকর্মরত কলস ও কিঙ্কিণী ধ্বনিত হইয়া, সরল এই পল্লীদৃশ্যের অন্তরালে ব্যস্ত যে মানব-জীবন আছে, তাহা কবির কল্পনায় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। প্রকৃতিরস এখানে লক্ষ্য, মানবরস উপলক্ষ্য মাত্র।

এখানে আভাসতঃ যে মানবরসের পরিচয় পাইলাম, 'কূলে' কবিতায় সে রস আরো সুদূর। যদিও নদীর ঘাটটি স্নানের, কিন্তু ঐ পর্যন্ত, তার পরে কেবল

ভাঙা পাড়ির গায়ে শুধু
শালিখ লাখে লাখে
খোপের মধ্যে থাকে।

এবং এ ভাঙা পাড়ে ধেনু জলপানে আসে না, শুধু দূর গ্রামের দু-চারিটি ছাগ চরিয়া বেড়ায়, আর থাকিয়া থাকিয়া

জলের পরে বেঁকে-পড়া
খেজুর শাখা হ'তে
ক্ষণে ক্ষণে মাছরাঙাটি
ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতে।

রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুতন্ত্রতা নাই যাঁহারা বলেন, তাঁহারা বাংলাদেশকে এমন সহৃদয়তা ও নিপুণতার সহিত দেখিয়াছেন বলিয়া জানি না।

'দুই তীরে' যাঁহারা আছেন, তাঁহারা মানুষ হইলেও উপলক্ষ্য; লক্ষ্য এপারের শরৎকালের চর, ওপারের ঘনচ্ছায়া বন, আর মাঝখানকার অর্থবহুল নদীর কলধ্বনি। দুপারের মানুষ দুটির অস্তিত্বের মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধানো প্রকৃতির

এই চিত্রটিই প্রধান উপভোগ্য। 'আষাঢ়' ও 'অবিনয়' বর্ষার কবিতা। কিন্তু এ বর্ষা আত্মসম্পূর্ণ মনুষ্যলোক হইতে স্বতন্ত্র, চিরন্তন কালের বর্ষা নহে। ইহা মানুষের বর্ষা; মানুষের দিগ্‌বলয়ে আপনার বৃহৎ রূপকে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া ইহা প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র। বস্তুতঃ 'অবিনয়ে' বর্ষা ও নিরুপমার মধ্যে কে যে লক্ষ্য তাহার নির্ণয় দুরূহ। বর্ষার প্রত্যেকটি চিত্রের সহিত নিরুপমাকে সংযুক্ত করিয়া দিয়া উভয়কে সমান আসন দেওয়া হইয়াছে। আর 'আষাঢ়' কবিতায় বিশাল আকাশ গৃহপ্রাঙ্গণের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে দিগ্‌বলয়িত।

প্রথম শ্লোকে, পাঠকের চিত্তকে গোড়াতেই প্রকৃতির উদ্বেলতা হইতে গৃহে আনিবার চেষ্টা। গৃহে থাকিয়াও যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তাহা মানুষের হাতের কাজ,

> বাদলের ধারা ঝরে ঝর-ঝর
> আউষের ক্ষেত জলে ভর-ভর।

দ্বিতীয় শ্লোকে প্রকৃতির কোনো সংগীত নাই—

> ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন,
> ধবলীরে আনো গোহালে।

ইহা সংসারাতীত সংগীত নয়।

তারপরে

> দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি
> মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি?
> রাখাল বালক কী জানি কোথায়
> সারাদিন আজি খোয়ালে।

তৃতীয় শ্লোকে বর্ষানদীর তরল কলধ্বনি সুন্দর ফুটিয়াছে, কিন্তু সে নদী সে ঘাট একান্তভাবে প্রকৃতির নয়; তাহা খেয়া-পারাপারের ঘাট, এবং বর্ষার সংগীতে যে-ধ্বনি মিশ্রিত তাহা মানুষের খেয়া-মাঝিকে আহ্বানের কণ্ঠস্বর। চতুর্থ শ্লোকে আবার সেই পূর্বোক্ত নিষেধ। এ প্রকৃতি বিশেষ করিয়া ক্ষণিকার প্রকৃতি, মানুষ-ঘেঁষা এবং স্বল্প; আপনার বৃহৎ গম্ভীর রূপ ক্ষণিকার সহজ মনের স্বচ্ছ চাদরে আবৃত করিয়া আসিয়াছে। 'নববর্ষা' হইতে ইহার পার্থক্য কোথায়, তাহা আলোচনা করিলে আমার বক্তব্য আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

কবি 'সেকাল' কবিতাটিতে কালিদাসের কালে জন্মগ্রহণ করিলে কি করিয়া জীবনযাপন করিতেন, তাহার একখানি চিত্র দিয়াছেন। কাব্য ও জীবন তখন শিশুর মত একই দোলায় দিনযাপন করিত; সেই মানসলোকের ছবিখানি আমাদের মত নীরস পাঠকেরও চিত্ত আকর্ষণ করে। কিন্তু তাহা চিরদিনের জন্য আয়ত্তাতীত বলিয়া কবির বিশেষ দুঃখ নাই। তাঁহার এই সান্ত্বনার মূলে বর্তমান কালের প্রতি গভীর আসক্তি। তিনটা কালের মধ্যে বর্তমানটাই সহজ ও প্রত্যক্ষ ও সত্য। অন্য দুইটা কালকে বর্তমানের কঙ্কাল দিয়া রচনা করিয়া কল্পনায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। যদিও কালিদাসের কালের বরাঙ্গনাগণ অন্তর্হিত, জীবনের সেই অংশের অভিনেতৃগণ অনুপস্থিত, কিন্তু সেই রঙ্গমঞ্চ তো পড়িয়াই আছে— বকুল তেমনি করিয়াই ফুটিতেছে, এবং ফাল্গুনে অশোক-তরুচ্ছায়ায় দক্ষিণ-সমীরণ তেমনি করিয়াই প্রাণে অহৈতুক আনন্দ জাগাইয়া দিতেছে।

কিন্তু কালিদাসের কালের তাঁহারা কি সত্যই নাই! বর্তমানের ইঁহাদের মধ্যেই অতীতের তাঁহারা বিরাজ করিতেছেন।

মরব না ভাই নিপুণিকা
চতুরিকার শোকে,
তাঁরা সবাই অন্য নামে
আছেন মর্ত্যলোকে।

কালমাহাত্ম্যে অবশ্য কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, তাঁহারা এখন

পরেন বটে জুতা-মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্তা
অন্য দেশীর চালে;

কিন্তু তাঁহাদের চক্ষের চাহনি প্রকাশ করিয়া দিতেছে যে, ইঁহারাই নামান্তরে সেকালেও ছিলেন। ক্ষণিকা ব্যতীত অন্য কোনো কাব্যে এমন ক্লাসিকাল চিত্রময় কবিতায় জুতা-মোজার আমদানি নিশ্চয়ই হাস্যকর হইত। স্মিতরসোজ্জ্বল ক্ষণিকার পারিপার্শ্বিকে জুতা-মোজাও দিব্য মানাইয়া গিয়াছে। এ পর্যন্ত একরকম হইল। কিন্তু এবারে বর্তমানের কবি কালিদাসের উপরেও একহাত লইয়াছেন।

আপাতত এই আনন্দে
গর্বে বেড়াই নেচে,
কালিদাস তো নামেই আছেন
আমি আছি বেঁচে।

নামে থাকার চেয়ে বাঁচিয়া থাকা অনেক বেশি মূল্যবান্; এখানে বর্তমানকে পুরা দাম দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানের স্বাদ-গন্ধ উজান বহিয়া অতীতে আর যাইবে না, কিন্তু অতীতের আস্বাদ কবি বাঁচিয়া থাকিয়াই পাইবেন। আর কালিদাসের নারীদের আভাস তো বর্তমানে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু

আমার কালের বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে
ছিল না তাঁর ছবি।

অত্যন্ত কৌশলে বর্তমানের বিনোদিনীকে কালিদাসের রমণীগণের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়া তাঁহার জয়ঘোষণা করা হইয়াছে; ইহাতে অতীতের উপরে বর্তমানেরই জয়, কাব্যের উপরে জীবনের জয়।

এ যেমন অতীতের কথা, 'কর্মফলে' তেমনি ভবিষ্যতের কাহিনী। পরজন্ম সত্য হইলে কবিকে আবার বাংলাদেশের রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, যে জীবন একদিন যাপন করিয়াছিলেন তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। অতীত-ভবিষ্যতের দুই পাখা গুটাইয়া কবি বর্তমানের আকাশে মুগ্ধ ও নিস্তব্ধ হইয়া আছেন। প্রাক্‌বর্তী ও পরবর্তী কাব্য হইতে ক্ষণিকার ইহাও একটা বিশেষত্ব। এই বর্তমানের প্রতি আসক্তিতে বোঝা যায়, কাব্য ও জীবনকে ক্ষণিকার কবি একবৃন্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

'আবির্ভাব' 'কল্যাণী', 'অন্তরতম', 'সমাপ্তি' এই চারিটি কবিতা ক্ষণিকা-পর্যায় হইতে একটু স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে জীবনদেবতা ছাড়া অন্য সুরও লাগিয়াছে। 'আবির্ভাবে' জীবনদেবতার সহিত প্রকৃতির সৌন্দর্যলক্ষ্মীর মিলন; এই দুয়ে মিলিয়া সমস্ত কবিতাটির রসোদ্বোধন করিয়াছে। 'কল্যাণী'তে জীবনদেবতা ও আদর্শায়িত গৃহলক্ষ্মীর মিলন। শেষের দুটিতে জীবনদেবতা, কাব্যলক্ষ্মী, গৃহলক্ষ্মী মিলিয়া বিচিত্র রসের প্রেরণা দিয়াছে। 'সমাপ্তি' কবিতাটির নামে মনে হয় গ্রন্থশেষের জন্য হয়তো বিশেষ করিয়া

ইহা লিখিত। 'আবির্ভাব' ছাড়া, অন্য তিনটিতে ক্ষণিকার সুর যে একেবারে নাই, তাহা বলা চলে না। সহজসরলতা ও ক্ষোভহীন অবসানের মাধুর্যে ইহারা পূর্ণ। এমন কি, 'আবির্ভাবে'র ছন্দ ও ভাষার পূর্ণতা, যদিচ ঠিক ক্ষণিকার সর্বাঙ্গীণ সরলতাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে না, তবু এই বিচিত্র লক্ষ্মীকে, কবি যে-গৃহে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা ক্ষণিকার পাতার কুটির এবং যে-বাঁশিতে তাহার প্রসাদ যাচ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সেই বেতসের যাহাতে ক্ষণিকার সরল গানগুলি এতক্ষণ ধ্বনিত হইয়াছে।

'নববর্ষা' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। কিন্তু ইহা ক্ষণিকা-পর্যায়ের নহে। সোনার তরী চিত্রায় ইহার যথার্থ স্থান, এমন কি কল্পনাতেও ইহা বেমানান হইত না। কেন যে ইহা ক্ষণিকা-পর্যায়ের নহে সেই প্রসঙ্গে কবিতাটি আলোচনা করা যাক। আরো দুইটি বর্ষার কবিতা লওয়া যাক, 'আষাঢ়' ও 'মেঘমুক্ত'। পরবর্তী দুইটিতে যে রসপ্রবাহ স্বচ্ছ সরল স্রোতে হৃদয়ের উপরিতলে আঘাতমাত্র করিয়া লঘুভাবে প্রবহমান, 'নববর্ষা'য় আসিয়া তাহা যেন গভীর ও উদ্বেল হইয়া হৃদয়ের তীর ছাপাইয়া উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সংগীত ক্ষণিকার স্মিতরসকে উপেক্ষা করিয়া, জীবনের লঘুভাবটিকে অস্বীকার করিয়া যে-রাগিণী ধ্বনিত করিয়াছে, তাহা বর্তমানের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ত্রিকালব্যাপী সমগ্র অস্তিত্বের ভিত্তি কাঁপাইয়া তোলে। পরবর্তী কবিতা দুটিতে হৃদয়ের সেই লঘুভাব; ইহারা বর্তমানের বৃন্তে মানুষ-ঘেঁষা বর্ষা। 'নববর্ষা' বর্ষাকালের দিক্‌চক্রের দ্বারা আবদ্ধ নয়; মানবজীবনের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই এমন হইতে পারে না, তাহা হইলে ইহা কবিতাই হইত না; যে মানব-জীবনের সহিত ইহার সম্পর্ক তাহা আদর্শায়িত মানবজীবন; প্রত্যক্ষ সংসারের সহিত ইহার কোনো যোগ নাই। ইহার পটভূমিতে কালিদাসের নায়িকাদের ও বৈষ্ণবের রাধিকার নানা আভাসে ইঙ্গিতে ইহার আকাশ পরিপূর্ণ। এক কথায় জীবনকে এখানে কাব্যের অন্তর্বর্তী করিয়া দেখা হইয়াছে।

আবার 'মেঘমুক্ত' কবিতায় ক্ষান্তবর্ষণ যে বর্ষাদিনের বর্ণনা, তাহা বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের একখানি ছবি। সে ছবি কোনো আদর্শায়িত চিত্র নহে,— "তোমাদের সেই ছায়া-ঘেরা দীঘি",—ইহা বিশিষ্ট একখানি ছবি, 'তোমাদের' বলিয়া তাহাকে একেবারে আঙিনার গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলা হইয়াছে।

ঘাটে ঘাটে তাহার স্নানরত মানুষ; তাহাদের সুখ-দুঃখের কথায় জলতল শব্দিত। আবার 'আষাঢ়ে' যেমন

ওরে আজ তোরা যাসনে ঘরের
বাহিরে

বলিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন, এখানে তেমনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন—

মেঘ ছুটে গেল নাই গো বাদল,
আয় গো আয়

বলিয়া সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। উভয় স্থানেই বর্ষার সহিত সংসারের যোগ স্থাপিত হইয়াছে। 'নববর্ষা'য় এ রকম কোনো আহ্বান বা উল্লেখের দ্বারা বর্ষার সহিত সংসারের অর্থাৎ বর্তমানের যোগ স্থাপন করিয়া দেওয়া হয় নাই। বর্তমানের যোগবিরহিত এই বর্ষা অনাদিকালের মেঘরাশি হইতে চিরন্তনকালের ধরণীতলে ঝরিয়া পড়িতেছে। যাহারা এই উৎসবে যোগ দিয়াছে, তাহারা কাব্যরাজ্যের ব্যক্তি, আদর্শায়িত তাহাদের জীবন; তাহারা চিরন্তনের অধিবাসী।

কল্পনার 'বর্ষামঙ্গলে'র সহিত ইহা তুলনীয়। তবে প্রভেদ এই যে, 'নববর্ষা'র প্রারম্ভে ও অন্তে কবির ব্যক্তিগত ভাবরসের উল্লেখ করিয়া চিরন্তন কালের এই বর্ষাকে বর্তমান কালের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে ইহা আরো বেশি করিয়া চিরন্তনের সংগীত হইয়া উঠিয়াছে, কারণ বর্তমানও চিরন্তনের অন্তর্গত। এই আলোচনার উদ্দেশ্য-কবিতাটিকে ক্ষণিকা-পর্যায় হইতে পৃথক্ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ করা, ইহার উৎকর্ষ বিচার নহে। আপন মাহাত্ম্যে ইহা বঙ্গসাহিত্যের একটি অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা।

নৈবেদ্য

নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থখানি ১৩০৮ সালে কবির চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত হয়। ইহার কবিতাগুলি আকৃতিভেদে দুই ভাগে বিভাজ্য; এই আকৃতিভেদের সহিত প্রকৃতির বিভিন্নতাও ঘটিয়াছে। প্রথম হইতে একুশটি এবং শেষতম, এই বাইশটি কবিতা সংগীতের আকার লাভ করিয়াছে; বাকি আটাত্তরটি সনেট।

নৈবেদ্য 'আইডিয়া'-প্রধান কাব্য ; ধী ইহাতে কল্পনার বল্গা ধারণ করিয়া সাংগীতিক উদ্দামকে পদে পদে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নৃত্যচারী ছন্দকে পদচারী তীর্থযাত্রীর মত ধীর স্থির সংযত করিয়া তুলিয়াছে। স্বভাবতই সনেট ইহার ভাবের বাহন— কাজেই অন্য আকারে লিখিত কবিতাগুলি নৈবেদ্যের বিশেষত্ব হইতে বঞ্চিত। বিশেষ, এই বাইশটি কবিতায় এমন কোনো ভাব নাই যাহা সনেটগুলিতে অধিকতর নিপুণতায় প্রকাশিত হয় নাই। পূর্বে বলিয়াছি, নৈবেদ্যের মূল সুরটি প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি কবির ঔৎসুক্য। কবি এখানে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্বটি হৃদয়ংগম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সেই ভিত্তি হইতে বর্তমান ভারতকে, ভারতীয় সমাজকে, পাশ্চাত্য আদর্শকে, মনুষ্যত্বের আদর্শকে দেখিয়াছেন। এখন বোঝা আবশ্যক, প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলটি কি, অন্ততঃ কবির নিকট তাহা কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিশ্বের খণ্ডতা, বৈচিত্র্য ও বহুত্বের মধ্যে ভারতবর্ষের সাধনা একটি পরম সমন্বয় দেখিতে পাইয়াছিল এবং সেই ঐক্যের উপর ধর্মকে স্থাপন করিয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিবার সময়ে এই তত্ত্বটি মনে রাখা আবশ্যক এবং এই তত্ত্বের উপরে চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিলে ইহার সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আধ্যাত্মিক সকল সমস্যার জটিলতার মূলে গিয়া পৌছানো যায়। প্রাচীন ভারতের সুদুর্গম দেবমন্দিরের পথে তীর্থযাত্রী কবির চিত্ত, এই মূলকে, এই নিগূঢ়তম চরমতত্ত্বকে আয়ত্ত করিয়াছে— তাই তাঁহার নিকট প্রাচীন কাল তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। এই ভাবটি তিনি নৈবেদ্যের অধিকাংশ কবিতায় এবং সমসাময়িক অনেক গদ্য রচনায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সময়কার একই ভাবধারা বহন করিয়া কবির গদ্য ও পদ্য দুইটি সমান্তরাল তটরেখার মত পাশাপাশি চলিয়াছে ; ফলতঃ কবির জীবনের অন্য কোনো পর্বে তাঁহার গদ্যে ও পদ্যে এত বেশি ঐক্য নাই। আমরা তাঁহার "প্রাচীন-ভারতের একঃ" প্রবন্ধ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, কবির ভাষাতেই তাঁহার বক্তব্য বলিবার চেষ্টা করিব।

"মনুষ্যের চিত্ত সেইরূপ গম্যস্থান না জানিয়াও অসীম বিশ্ববৈচিত্র্যে কেবলই এক হইতে আর একের দিকে কোথায় চলিয়াছিল? কুতূহলী বিজ্ঞান খণ্ড খণ্ড পদার্থের দ্বারে দ্বারে অণুপরমাণুর মধ্যে কাহার সন্ধান করিতেছিল? স্নেহপ্রীতি

পদে পদে বিরহ-বিস্মৃতি-মৃত্যু-বিচ্ছেদের দ্বারা পীড়িত হইয়া অন্তহীন তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত হইয়া পথে পথে কাহাকে প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছিল ?...

"সেই যে এক, তিনি সকল হইতে অন্তরতর পরমাত্মা, তিনিই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়।' মুহূর্তেই বিশ্বের বহুত্ববিরোধের মধ্যে একের ধ্রুবশান্তি পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিল—একের সত্য, একের অভয়, একের আনন্দ, বিচ্ছিন্ন জগৎকে এক করিয়া অপ্রমেয় সৌন্দর্যে গাঁথিয়া তুলিল।"

—"প্রাচীন ভারতের একঃ", ধর্ম

এই একই ভাব কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে—

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবনে-তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্র স্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে জলেতে এই বিশ্বচরাচরে
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি।

এই অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য ভারতের সেই ঋষি পিতামহেরা দেখিয়াছেন বলিয়াই

বিশ্ব চরাচর
ঝরিছে আনন্দ হতে আনন্দ-নির্ঝর ;
অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে,
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে,
তোমারি আদেশে বহি মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্মরিয়া করে যাতায়াত।

এই সত্যটি না বুঝিতে পারিলে জীবন কি দুর্বিষহ !

"নহিলে এই জগৎ, যাহা বিচিত্র, যাহা অগণ্য, যাহার প্রত্যেক কণা-কণিকাটিও কম্পিত-ঘূর্ণিত, তাহা কি ভয়ংকর ! বৈচিত্র্য যদি একবিরহিত হয়, অগণ্যতা যদি একসূত্রে গ্রথিত না হয়, উদ্যত শক্তিসকল যদি স্তব্ধ একের দ্বারা ধৃত না হইয়া থাকে, তবে তাহা কি করাল, তবে বিশ্বসংসার কি অনির্বচনীয় বিভীষিকা।"

—"প্রাচীন ভারতের একঃ", ধর্ম

এখন প্রশ্ন এই, বহুত্বের মধ্যে এই পরম একককে একমনে করিয়া লাভ করা হইল—

"মন আপনার স্বাভাবিক ধর্মবশতই কখনো জানিয়া কখনো না-জানিয়া, কখনো বক্রপথে কখনো সরল পথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে। যখন পায় তখন একমুহূর্তেই বলিয়া উঠে— আমি অমৃতকে পাইয়াছি—বলিয়া উঠে

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

'অন্ধকারের পারে আমি এই জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমর হন।'"

—"প্রাচীন ভারতের একঃ", ধর্ম

একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান প্রাণ, কী আনন্দ-বলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে— "শোনো বিশ্বজন
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।"...
রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

প্রাচীন ভারত সভ্যতা ও সম্পদের উচ্চতম শিখরে উঠিয়াও, উপকরণ-বিরলতার জন্য জগৎপ্রসিদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্যসভ্যতামুগ্ধ আমাদের নিকট সম্পদ ও উপকরণ-বিরলতা স্বতোবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষ কি সত্যই ইহার সমন্বয় সাধন করিতে পারিয়াছিল— পারিলে কোন্ সত্যের বলে?

"খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে; তেমনি

খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে। সেই একেকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে, সহস্রের হাত হইতে আপনাকে আর রক্ষা করিতে পারি না। তবে বিষয় প্রবল হইয়া উঠে, ধন-জন-মান বড় আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে ঘুরাইতে থাকে, অশ্ব-রথ-ইষ্টক-কাষ্ঠ মর্যাদা লাভ করে, দ্রব্যসামগ্রী-সংগ্রহচেষ্টার অন্ত থাকে না, প্রতিবেশীর সহিত নিরন্তর প্রতিযোগিতা জাগিয়া উঠে ..

"পত্নী মৈত্রেয়ীকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য যখন বনে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন— এ সমস্ত লইয়া আমি কি অমর হইব ? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন— না, যাহারা উপকরণ লইয়া থাকে, তাহাদের যেরূপ, তোমারও সেইরূপ জীবন হইবে। তখন মৈত্রেয়ী কহিলেন— যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্, যাহার দ্বারা আমি অমৃতা না হইব তাহা লইয়া আমি কি করিব ?

"যাহা বহু, যাহা বিচ্ছিন্ন, যাহা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রেয়ী অখণ্ড অমৃত একের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন।"

—"প্রাচীন ভারতের একঃ", ধর্ম

ভারতবর্ষ অন্তর্লোকের সন্ধান, অখণ্ডত্বের সন্ধান লাভ করিয়াছিল বলিয়াই বাহিরের বহুত্বে, উপকরণের বাহুল্যে তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই— সে-সমস্তকেই অতি অনায়াসে অতিক্রম করা তাহার পক্ষে সুসাধ্য হইয়াছিল।

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য যত।

কিন্তু সেজন্য আমাদের লজ্জার কিছু আছে কি ?

"আমাদের বেশভূষা দীন হউক, আমাদের উপকরণসামগ্রী বিরল হউক, তাহাতে যেন লেশমাত্র লজ্জা না পাই— কিন্তু চিত্তে যেন ভয় না থাকে, ক্ষুদ্রতা না থাকে, বন্ধন না থাকে, আত্মার মর্যাদা সকল মর্যাদার ঊর্ধ্বে থাকে, তোমারই দীপ্তিতে ব্রহ্মপরায়ণ ভারতবর্ষের মুকুটবিহীন উন্নত ললাট যেন যেন জ্যোতিষ্মৎ হইয়া উঠে।"

—"প্রাচীন ভারতের এক", ধর্ম

ভারতবর্ষের এই যে আদর্শ, ইহা জীবনের কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য প্রভৃতি চারি আশ্রম, রাজার রাজত্ব, তপস্বীর তপস্যা সকলই এক সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত ছিল— এক কথায় সমগ্র জীবনকেই, কোনো এক বিশেষ অবস্থামাত্রকে নয়, ভারতবর্ষ তপস্যার মত গ্রহণ করিয়াছিল।

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে...
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল...

জীবনযাত্রা-সম্বন্ধেও ভারতবর্ষের উপদেশ এইরূপ সরল। মূলগামী ভারতবর্ষ বলে—

"সন্তোষং হৃদি সংস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ— সুখার্থী সন্তোষকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া সংযত হইবেন।...একথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, সুখের উপায় বাহিরে নাই, তাহা অন্তরেই আছে— তাহা উপকরণজালের বিপুল জটিলতার মধ্যে নাই, তাহা সংযত চিত্তের নির্মল সরলতার মধ্যে বিরাজমান।"

—"ধর্মের সরল আদর্শ," ধর্ম

শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

"নদীর তটবন্ধনের ন্যায় সমাজবন্ধন তাহাকে বেগবান্ করিবে, বন্দী করিবে না, এই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্য ভারতবর্ষের সমস্ত ক্রিয়াকর্মের মধ্যে, সুখ-শান্তি-সন্তোষের মধ্যে মুক্তির আহ্বান আছে— আত্মাকে ভূমানন্দে ব্রহ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্যই যে সমাজের মধ্যে আপন শিকড় বাঁধিয়াছিল।"

—"চীনেম্যানের চিঠি", ভারতবর্ষ

এই তো দেখিলাম প্রাচীন ভারতের সনাতন আদর্শ কবির চিত্তে আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু ইহা তো অতীতের কথা। বর্তমান ভারতে কি সেই উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হইতেছে? কবি বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নৈরাশ্যে ও ক্ষুব্ধ অভিমানে বারংবার ভারতবর্ষকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

ভারতবর্ষ কেন সেই উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইল? ইতিহাসের গতিই এইরূপ। কোনো একটা সুবৃহৎ সমাজ অত্যুচ্চ আদর্শে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে না— মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসের জড়ত্ব কিছুকাল পরেই শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলে এবং আন্তরিকতাকে সংস্কারে পরিণত করিয়া ফেলে। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষের আর একটা নিদারুণ অভিশাপের কারণ হইয়াছে পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যর্থ মোহ।

প্রথমতঃ দেখিতে পাই যে-পরম ঐক্য ভারতীয় সভ্যতার প্রাণধারা, ভারতবর্ষ সেইখানে আঘাত করিয়া একেবারে নিজের অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে।

তব আদর্শ মহান
আপনার পরিমাপে করি খান খান
রেখেছে ধূলিতে।…
যে এক তরণী লক্ষ লোকের নির্ভর
খণ্ড খণ্ড করি তারে তরিবে সাগর?

আবার দেখিতে পাই

তোমারে শতধা করি ক্ষুদ্র করি দিয়া
মাটিতে লুটায় যারা তৃপ্ত সুপ্ত হিয়া
সমস্ত ধরণী আজি অবহেলাভরে
পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে।

যাহারা তোমাকে খেলার পুতুল করিয়া তুলিয়াছে, তাহারা আজ জগতের খেলার পুতুলে পরিণত। যাহারা তোমাকে নিজেদের সমান কল্পনা করে তাহারা অন্যের নিকট কি সম্মান পাইবে!

নিজ মন্ত্রস্বরে
তোমারেই প্রাণ দিতে যারা স্পর্ধা করে

কে তাদের দিবে প্রাণ ? তোমারেও যারা
ভাগ করে, কে তাদের দিবে ঐক্যধারা ?

কবির মতে ভারতবর্ষের দুর্গতির ইহাই মূল কারণ। এই পরম ঐক্যকে খণ্ডিত করায় মানুষের যাহা মেরুদণ্ডস্বরূপ সেই ধর্ম আহত হইয়াছে। এই ধর্ম কি ?

"সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না— সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভূত— তাহাই মনুষ্যত্বের ছোটবড়, অন্তরবাহির সর্বাংশে পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।"

—"ধর্মপ্রচার", ধর্ম

কিন্তু ধর্মে আঘাত পড়িলে সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত কেন হইবে ? অন্য দেশে তো ধর্মই যুদ্ধবিগ্রহের লক্ষ্য হইয়া আছে— কিন্তু তাহারা তো দিব্য টি কিয়া আছে। কবির উত্তর এইরূপ—

"প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে 'রিলিজন' নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র— তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে 'রিলিজন', 'পলিটিক্স' সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে, কারণ সমাজেই তাহার মর্মস্থান, তাহার জীবনীশক্তির অন্য কোনো আশ্রয় নাই।"

—"সমাজভেদ", স্বদেশ

এই ধর্ম ব্যাহত হইয়াছে বলিয়াই সমস্ত সমাজ কলুষিত অন্তঃসারশূন্য হইয়াছে— তাই ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ নহে, ক্ষত্রিয় আর ত্রাণকর্তা নহে, বৈশ্য নিজের ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট নহে— সকলেই রিক্ত কাঠামোটার চারিপাশে ভূতের মত ঘুরিয়া মরিতেছে।

আমাদের এই সমাজপ্রধান দেশে ব্রাহ্মণের আবশ্যক আছে—

"যদি প্রাচ্য ভাবেই আমাদের দেশে সমাজ রক্ষা করিতে হয়, যদি য়ুরোপীয় প্রণালীতে এই বহুদিনের বৃহৎ সমাজকে আমূল পরিবর্তন করা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে যথার্থ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন, সর্বপ্রকার আশ্রমধর্মের আদর্শ ও আশ্রয়স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন।...

"এই ব্রাহ্মণেরাই যথার্থ স্বাধীন। ইঁহারাই যথার্থ স্বাধীনতার আদর্শকে নিষ্ঠার সহিত কাঠিন্যের সহিত সমাজে রক্ষা করেন। সমাজ ইঁহাদিগকে সেই অবসর সেই সামর্থ্য সেই সম্মান দেয়। ইহাদের এই মুক্তি, ইহা সমাজেরই মুক্তি।" —"ব্রাহ্মণ", ভারতবর্ষ

কিন্তু ইহা তো হইল অতীতের অবস্থা— এখন তো আর সেই ব্রাহ্মণ নাই, উপবীতমাত্র আছে। এখনকার ব্রাহ্মণ কি রকম—

"কিন্তু যে-ব্রাহ্মণ সাহেবের আপিসে নতমস্তকে চাকরি করে, যে-ব্রাহ্মণ আপনার অবকাশ বিক্রয় করে, আপনার মহান অধিকারকে বিসর্জন দেয়, যে ব্রাহ্মণ বিদ্যালয়ে বিদ্যাবণিক, বিচারালয়ে বিচার-ব্যবসায়ী, যে-ব্রাহ্মণ পয়সার পরিবর্তে আপনার ব্রাহ্মণ্যকে ধিক্কৃত করিয়াছে, সে আপন আদর্শ রক্ষা করিবে কি করিয়া, সমাজ রক্ষা করিবে কি করিয়া, শ্রদ্ধার সহিত তাহার নিকট ধর্মের বিধান লইতে যাইব কি বলিয়া? সে তো সর্বসাধারণের সহিত সমানভাবে মিশিয়া ঘর্মাক্তকলেবরে কাড়াকাড়ি-ঠেলাঠেলির কাজে ভিড়িয়া গিয়াছে। ভক্তি দ্বারা সে-ব্রাহ্মণ তো সমাজকে ঊর্ধ্বে আকৃষ্ট করে না, নিম্নেই লইয়া যায়।"

—"ব্রাহ্মণ", ভারতবর্ষ

এই ব্রাহ্মণের নিকট আর পুরাতন উচ্চ আদর্শ আশা করা যায় না— সেই মানসিক ঐশ্বর্য হারাইয়াছি বলিয়াই আর আমরা বলিতে পারি না—

না গণি মনের ক্ষতি ধনের ক্ষতিতে
হে বরেণ্য, এই বর দেহ মোর চিতে।

বলিতে পারি না

ধনীর সমাজে
না হয় না হোক স্থান, জগতের মাঝে
আমার আসন যেন রহে সর্ব ঠাঁই,
হে দেব একান্তচিত্তে এই বর চাই।

তাই আর বলিতে পারি না

বাসনারে খর্ব করি' দাও, হে প্রাণেশ।
সে শুধু সংগ্রাম করে ল'য়ে এক লেশ,
বৃহতের সাথে।...

বাসনার ক্ষুদ্র রাজ্য করি একাকার
দাও মোরে সন্তোষের মহা অধিকার।

'যে সবল সরল সন্তোষমহার্ঘ আদর্শ চিত্তে সজীব থাকিলে উপকরণের অভাব অনুভূত হয় না' তাহা তো আর নাই, কাজেই এখন প্রাণের দৈন্য উপকরণের বাহুল্যে পূর্ণ কবিবার প্রয়াস।

অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারায়ে।
তাই মোরা লজ্জানত; তাই সর্ব গায়ে
ক্ষুধার্ত দুর্ভর দৈন্য কবিছে দংশন;
তাই আজি ব্রাহ্মণের বিরল বসন
সম্মান বহে না আর; নাহি ধ্যানবল
শুধু জপমাত্র আছে; শুচিত্ব কেবল,
চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচাব;...
তাই আজি দলে দলে চাই ছুটিবারে
পশ্চিমেব পবিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে
লুকাতে প্রাচীন দৈন্য।...

"দীন ভাবতবর্ষ যেদিন ইংলণ্ডের পরিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্রে ভূষিত হইয়া দাঁড়াইবে তখন তাহার দৈন্য কি বীভৎস বিজাতীয় মূর্তি ধারণ করিবে!......আজ যাহা বিরল বসনের সরল নম্রতার দ্বারা সম্বৃত, সেদিন তাহা জীর্ণ কোর্তার ছিদ্রপথে অর্ধ-আবরণের ইতরতার কি নির্লজ্জভাবে দৃশ্যমান হইয়া উঠিবে।"

—"নকলের নাকাল", সমাজ

আমরা যে শুধু পশ্চিমের উপকরণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছি তাহা নহে, কেবল তাহাই হইলে ভয় তত ছিল না। পশ্চিমের আদর্শ দ্বারা আমরা আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ সেই মোহের অভিমুখে চলিয়াছি। ইহাই চরম সর্বনাশের কথা। পশ্চিমের আদর্শ পশ্চিমের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে—যদিও সে সম্বন্ধে এখন চারিদিক্ হইতে প্রশ্ন উঠিতেছে। আদর্শ, যাহা জীবন-ব্যাপারের মর্মের সহিত অবিচ্ছেদ্য, তাহাকে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া—অপরের আদর্শ, অপরের পক্ষে তাহা যতই ফলপ্রদ হউক—তাহাকে বরণ করিয়া লইলে আত্মহত্যার পথে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হওয়া ব্যতীত আর কি! কর্ণের যে অক্ষয় কবচ সহজ

ছিল, তাহার জীবনের সহিত অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া তাহার মর্মদেশকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল— তাহা বিসর্জন করাতেই তাঁহার মৃত্যু।

"আমরা বলি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চে রাখিয়া পোলিটিকাল দৃঢ়তাসাধন ভালো কি না, সেও তর্কের বিষয়। দেশের অন্য সমস্ত প্রয়োজনকে উত্তরোত্তর খর্ব করিয়া সৈনিকগঠনে য়ুরোপ প্রতিদিন পীড়িত হইয়া উঠিতেছে— সৈন্যসম্প্রদায়ের অতিভারে তাহার সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হইতেছে। ইহার সমাপ্তি কোথায়? নিহিলিষ্টদের অগ্ন্যুৎপাতে, না পরস্পরের প্রলয়সংঘর্ষে? আমরা স্বার্থ ও স্বেচ্ছাচারকে সহস্র বন্ধনে বদ্ধ করিয়া মরিতেছি, ইহাই যদি সত্য হয়, য়ুরোপ স্বার্থ ও স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া চিরজীবী হইবে কি না তাহারও পরীক্ষা বাকি আছে।"

—"সমাজভেদ", স্বদেশ

পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং কবির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি ১৩০৮ সালে লিখিত; গত মহাযুদ্ধে এবং রুশীয় বিপ্লবে কবির দুই আশঙ্কাই সফল হইয়াছে। ইহার পর কবি বহুবার য়ুরোপ এবং একবার রাশিয়া গিয়া স্বচক্ষে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য দেখিয়া আসিয়াছেন।

"সম্প্রতি য়ুরোপে এই অন্ধবিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। রাবণ যখন স্বার্থান্ধ হইয়া অধর্মে প্রবৃত্ত হইল, তখন লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। আধুনিক য়ুরোপের দেবমণ্ডপ হইতে লক্ষ্মী যেন বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সেই জন্যই বোয়ারপল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্মপ্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।"

—"সমাজভেদ", স্বদেশ

য়ুরোপ নেশনতন্ত্রী— এই নেশনত্বের উগ্র সাধনায় সে মনুষ্যত্বের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে— কিন্তু ধর্ম তাহার ন্যায়দণ্ড লইয়া ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।...
একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।
ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।

আবার

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল...
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত— লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম...
লজ্জা সরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।

এবং সর্বাপেক্ষা দুঃখের, কবি যখন নিজের সগোত্রকে দেখেন—

কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি,
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

এক-একবার এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখাকে মনে হয় বুঝিবা ইহা "সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা তব নব প্রভাতের।" কিন্তু ইহা "সন্ধ্যার প্রলয়-দীপ্তি" মাত্র। ইহা কেবল—

চিতার আগুন
পশ্চিম-সমুদ্রতটে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ— স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।

এই সান্ধ্যদীপ্তিকে প্রাতঃকালীন আলোক বলিয়া পাছে ভ্রম হয় তাই কবি সাবধান করিয়া দিতেছেন—

"আমাদের চতুর্দিকে সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞানমদমত্ত বাহুবলগর্বিত স্বার্থনিষ্ঠুর জাতিরা যাহা লইয়া অহরহ নখদন্ত শানিত করিতেছে, পরস্পরের প্রতি সতর্ক-রুষ্ট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবীকে আতঙ্কে কম্পান্বিত ও ভ্রাতৃশোণিতপাতে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, সেই সকল কাম্যবস্তু এবং সেই পরিস্ফীত আত্মাভিমানের দ্বারা তাহারা কখনো অমর হইবে না, তাহাদের যন্ত্রতন্ত্র, তাহাদের বিজ্ঞান, তাহাদের পর্বতপ্রমাণ উপকরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহাদের সেই বলমত্ততা ধনমত্ততা সেই উপকরণবহুলতার প্রতি ভারতবর্ষের যেন লোভ না জন্মে।",
—"প্রাচীন ভারতের একঃ", ধর্ম—

কিন্তু ইহাও তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, য়ুরোপ ন্যাশনাল মহত্ত্বের সাধনায় শক্তিমান ধনবান্‌, বিদ্বান হইয়াছে তবে আমরাই বা কেন সে পথ অবলম্বন করিব না।

"নেশন শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর করিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশন-গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। য়ুরোপ স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না। রিপুর বন্ধনই প্রধান বন্ধন— তাহা ছেদন করিতে পারিলে রাজা মহারাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করি।"

—"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা", স্বদেশ

তাহা ছাড়া—

"পনেরো ষোলো শতাব্দী খুব দীর্ঘকাল নহে। নেশন-ই যে সভ্যতার অভিব্যক্তি, তাহার চরম পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি তাহার চারিত্র আদর্শ উচ্চতম নহে। তাহা অন্যায় অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ এবং তাহার মজ্জার মধ্যে একটি ভীষণ নিষ্ঠুরতা আছে।

—"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা", স্বদেশ

এই ন্যাশনাল মাহাত্ম্যের প্রভাবে—

শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।
দেহ হতে দেহান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার।

ইহা তো গেল সমস্তই অতীতের কথা, তবে ভারতবর্ষের জাগরণের আদর্শ কি? সেই প্রাচীন জীবনেই কি ফিরিয়া যাইতে হইবে? কিন্তু তাহা তো অসম্ভব— ইচ্ছা থাকিলেও হইবার নয়। যে আদর্শ পুরাতন হয়, তাহা অনুসরণ করিবার যোগ্য নয়; আবার কোনো নূতন আদর্শকেও নানা কারণে গ্রহণ করা চলে না। যাহা সনাতন, অর্থাৎ প্রাচীন হইয়াও পুরাতন হয় না, আবার নবীন হইয়াও চিরস্থায়ী, এক কথায় যাহা চিরন্তন তাহাই জগতে বিশ্বাসযোগ্য।

ভারতবর্ষের সেই ঋষিদের তপস্যাকে পুনরায় আমাদের জীবনে লাভ করিতে হইবে; সেই আলোকে পথের অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়া আমাদের সম্মুখে চিরন্তন পথ ফুটিয়া উঠিবে।

যে পরম ঐক্য বা বিশ্বচৈতন্য ঋষি পিতামহগণ অনুভব করিয়াছিলেন, যে ঐক্যসূত্র ভারতবর্ষের সমস্ত খণ্ডতা-বিচ্ছিন্নতাকে, দৈন্যদুঃখপরাভবজালকে একটি মাল্যাকারে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই পুনরায় সাধনার দ্বারা লাভ করা ব্যতীত উপায় নাই। এই ঐক্যে উপস্থিত হইতে পারিলে আর সমস্তই সহজ হইয়া যাইবে।

এই পরম ঐক্যের সাধনা ভারতবর্ষের ছিল বলিয়াই কোনো খণ্ড সার্থকতা তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই— না সমাজে, বা না রাষ্ট্রে, না ব্যবসায়-বাণিজ্যে। সমগ্র জীবনের সাধনাই তাহার। তাই ভারতবর্ষকে কোনো একাঙ্গীন সাফল্য লাভের কথা কবি উপদেশ করেন নাই।

তিনি বলিয়াছেন—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

তিনি বলিয়াছেন—

কোথা লোক, কোথা রাজা, কোথা ভয় কার।
তুমি নিত্য আছ, আমি নিত্য সে তোমার।

আবার—

চিরদিন
জ্ঞান যেন থাকে মুক্ত, শৃঙ্খলবিহীন।
ভক্তি যেন ভয়ে নাহি হয় পদানত
পৃথিবীর কারো কাছে। শুভ চেষ্টা যত
কোনো বাধা নাহি মানে কোনো শক্তি হতে।
আত্মা যেন দিবারাত্রি অবারিত স্রোতে
সকল উদ্যম লয়ে ধায় তোমা পানে
সর্ব বন্ধ টুটি।

[আবার এই সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করিতে হইবে। এখন আমরা

সহস্রের ভ্রূকুটির নিচে
কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে সহস্রের পিছে
চলিয়াছি প্রভুত্বের তর্জনী-সংকেতে
কটাক্ষে কাঁপিয়া, লইয়াছি শিরে পেতে
সহস্রশাসনশাস্ত্র।

ইহা আর চলিবে-না ; তখন

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জনা।

এত বাধা দেখিয়া ভয় স্বাভাবিক। কিন্তু ভরসা এই যে—

আছ তুমি অন্তর্যামী এ লজ্জিত দেশে।

এই পরম ঐক্যের কথঞ্চিৎ অনুভূতি হইলেই বলা সহজ হইবে—

কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্ত সৌম্যমুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।

তখন বলিতে পারিব—

"হে অক্ষরপুরুষ, পুরাতন ভারতবর্ষে তোমা হইতে যখন পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল, তখন আমাদের সরলহৃদয় পিতামহগণ ব্রহ্মের অভয় ব্রহ্মের আনন্দ যে কি, তাহা জানিয়াছিলেন। তাঁহারা একের বলে বলী, একের তেজে তেজস্বী, একের গৌরবে মহীয়ান হইয়াছিলেন। পতিত ভারতবর্ষের জন্য পুনর্বার সেই প্রজ্ঞালোকিত নির্মল নির্ভয় জ্যোতির্ময় দিন তোমার নিকটে প্রার্থনা করি। পৃথিবীতলে আর একবার তোমার সিংহাসনের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দাও। আমরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ-যন্ত্রতন্ত্র-বাণিজ্যব্যবসায়ের দ্বারা নহে, আমরা সুকঠিন সুনির্মল সন্তোষবলিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে চাহি। আমরা রাজত্ব চাই না, প্রভুত্ব চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, প্রত্যহ একবার

ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে তোমার মহাসভাতলে একাকী দণ্ডায়মান হইবার অধিকার চাই। তাহা হইলে আর আমাদের অপমান নাই, অধীনতা নাই, দারিদ্র্য নাই। —"প্রাচীন ভারতের একঃ", ধর্ম

তখন বলিতে পারা যাইবে—

সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি
হে ভারত, সর্বদুঃখে রহ তুমি জাগি
সবল নির্মল চিত্ত ;

কারণ

তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোক
হয়তো লুকায়ে আছে পূর্বসিন্ধুতীরে।

এখানে এমন একটা আভাস আছে যে, ভারতের যে জাগরণ তাহা শুধু তাহাকেই তৃপ্ত করিবে না— তাহা নিখিলপ্লাবী, হয়তো সমগ্র মানবের পক্ষে তাহা আবশ্যক। তখন নির্ভয়ে বলিতে পারা যাইবে

তুমি থেকো সাজি
চন্দনচর্চিত স্নাত নির্মল ব্রাহ্মণ,
উচ্চশির ঊর্ধ্বে তুলি গাহিয়ো বন্দন—
"এসো শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা,
নিশাচর পিশাচের রক্তদীপশিখা
করিয়া লজ্জিত। তব বিশাল সন্তোষ
বিশ্বলোক-ঈশ্বরের রত্নরাজকোষ।
তব ধৈর্য দৈববীর্য ; নম্রতা তোমার
সমুচ্চ মুকুটশ্রেষ্ঠ, তাঁরি পুরস্কার।"

নিম্নের কবিতাটিতে কবি সংক্ষেপে এবং সম্যগ্‌ভাবে ভারতের সেই আদর্শস্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন।

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,

যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

এই পরম ঐক্যকে ভারতবর্ষ একদিন লাভ করিয়াছিল এবং লাভ করিয়া তাহা দর্শনশাস্ত্রের সুদুর্গম শিখরে রাখিয়া দেয় নাই, তাহা জীবনের বস্তু করিয়া তুলিয়া তাহাকে সমাজে রাষ্ট্রে সভ্যতায় ইতিহাসে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

"ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তিনির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই।...

"ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে।

"এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি; তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।...

"একেকে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই একেকে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা— নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।" —"ভারতবর্ষের ইতিহাস", স্বদেশ

২

এই পরম ঐক্যকে বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করা এক কথা, জীবনের দ্বারা উপলব্ধি ভিন্ন ব্যাপার। বুদ্ধি আমাদের জীবনের উপরতলার মালিক ; কিন্তু নীচের তলার যে গুপ্ত কক্ষগুলিতে আদিম যুগের গুপ্তধন সঞ্চিত, সেই সংস্কারপ্রধান নিভৃত কক্ষগুলির চাবি বুদ্ধির হাতে নাই। যখন বুদ্ধি মানুষের অস্তিত্বের বল্গা ধারণ করে নাই, তখন যে আবেগে মানুষ চালিত হইত আজ তাহা গত— আজ তাহারা নতমস্তকে দিন যাপন করিতেছে? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের জটিল জীবন-ব্যাপারের প্রধান অভিনেতা বুদ্ধি নয়— যতই তাহা আবশ্যক হউক, সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে, তাহার অবশ্যম্ভবতা যতই একান্ত হউক মানুষের পূর্ণ অস্তিত্বের প্রকাশ বুদ্ধিতে নয়।

বুদ্ধির দ্বারা যাহা আয়ত্ত হয় জীবনের চরম মুহূর্তে তাহা কোনো কাজেই আসে না— সে যেন অনেকটা কর্ণের অস্ত্রশিক্ষা, শেষ মুহূর্তে কোনো কাজেই লাগিল না।

এতক্ষণ ভারতীয় আদর্শের যে কথা বলিলাম তাহা কবির বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত ; কাজে তাহা লাগিয়াছে, ভারতবর্ষকে বুঝিতে সাহায্য করিয়াছে, কবির জীবনের পথ তাহা নির্দেশ করিয়াছে, কিন্তু জীবন-গঠনের উপাদান হইয়া উঠিতে পারে নাই। কবি এই স্থানেই নিরস্ত হইলে ইহার মূল্য এমন কি আর হইত। কিন্তু যাহাকে বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে জীবনের দ্বারা সাধনাও করিয়াছেন— কবির সমগ্র জীবনের সহিত একাত্ম হইয়া উঠিয়া তাহা আর নির্গুণ আদর্শমাত্রে, পর্যবসিত নাই— রক্তে মাংসে নূতন যুগের সমীরণে সমীরিত হইয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

এই পরম ঐক্য যিনি জীবনের দ্বারা লাভ করিয়াছেন তাঁহার নিকট দেশে কালে, জীবনে মৃত্যুতে, কোনো ভেদ থাকিতে পারে না— দুঃখ অহরহঃ খণ্ডতার দ্বারা তাঁহার অমিশ্র আনন্দে ছেদ ঘটাইতে পারে না— তিনি আব্রহ্মস্তম্ব একসূত্রে গ্রথিত দেখেন এবং নিজেকেও সেই মহামাল্যে সমন্বিত দেখিয়া বিস্মিত ও নিশ্চিন্ত হন।

তখন নগরের কর্মবন্যাই কি আর হেমন্তের শ্রান্তিই কি। দিব্যচক্ষে সর্বত্র প্রতিভাত হইতে থাকে—

তখন সহসা হেরি মুদিয়া নয়ন
মহা জনারণ্য মাঝে অনন্ত নির্জন
তোমার আসনখানি—

তখন

জনশূন্য ক্ষেত্রমাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে...
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।

যেমন সেই বিশ্ব-আত্মা বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া বিরাজমান, তেমনি আমার এই ব্যক্তিগত আত্মাও আর ক্ষুদ্র নাই—দেশকালের গণ্ডি উত্তীর্ণ হইযা বিশ্বময় হইয়া গিয়াছে—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে ;

তাহা তৃণে তৃণে সঞ্চারিত, পল্লবে পুষ্পে বিকশিত, বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্রদোলায় দোদুল্যমান।

সেই অনন্ত প্রাণ আমাকে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে

সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।

কখনো বা বিস্ময়ে

দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
এ কী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার।

কি বিস্ময়—

প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।

একদিকে যেমন সমস্ত দেশ সেই একের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট, তেমনি সমগ্র কাল, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সীমাবিরহিত হইয়া সেই একের দ্বারা বিধৃত। তাহা যদি হয় তবে আর কেমন করিয়া মৃত্যুর বিচ্ছেদ থাকিতে পারে? "মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর।" আজ তাহার ভয়ে বিদায় লইতে চক্ষু ছল ছল করিতেছে কিন্তু যে সত্তা জন্মের পূর্ব হইতেই জীবনকে এমন প্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল—

মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।

যেটুকু বিচ্ছেদ সেটুকু কি রকম, না—

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

ভীতির কারণ ছিল বটে, কারণ এই শক্তিসংকুল আনন্দবিরহিত বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মকতা অনুভব না করিলে, ইহাকে ঐক্যহীন খণ্ডতার দ্বারা ক্ষুব্ধ করিয়া দেখিলে, ইহার মত নির্মম আর কি আছে।

জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে
এ আশ্চর্য সংসারের মহানিকেতনে
সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর।

কিন্তু যখনই প্রভাতে নয়ন মেলিলাম

তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার
নিমেষেই মনে হল মাতৃবক্ষ সম।

এখন প্রশ্ন, এই যে "রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি" যাহার সম্বন্ধে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়

এক হতে দুই
কেমনে যে হতে পারে জানি না কিছুই।

সেই বিচিত্র, অজ্ঞেয়, মহা ভয়ংকর কি করিয়া আমাদিগকে তৃপ্তি দিতে পারে?

মানুষের মন রূপের জন্য ক্ষুধিত, আর রূপের লক্ষণ, সীমা। এই যে অসীম সত্তা তাহা কেমন করিয়া এই রূপ-আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করে?

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতিক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারিভিতে।

আবার

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চার ক্ষেত্র,— সেথা শুভ্রভাস ;
দিন নাই রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই গন্ধ নাই, নাই নাই বাণী।

তিনি অসীমও বটেন, সসীমও বটেন, তিনি সীমার মধ্যে অসীম। এই বাণীই রবীন্দ্রনাথের সকল বাণীর মূলে— সমগ্র কাব্যসাহিত্যের মধ্য দিয়া ইহাই তাঁহার বক্তব্য। ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের আভাস, বৃহতের অন্তর্গত করিয়া সমস্ত খণ্ডতাকে দেখা ইহাই ভারতের লক্ষ্য—কবিও নিজের জীবনে ইহা উপলব্ধি করিয়া সাহিত্যে ইহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি আকাশ— নির্গুণ, "শুভ্রভাস" চৈতন্য মাত্র— বর্ণ-গন্ধ-বাণী-হীন, ইন্দ্রিয়ের অতীত অরূপ। ভক্তির ক্ষেত্রে তিনি নীড়— গুণময়, বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দে অপরূপ। রবীন্দ্রনাথ যেখানে তাত্ত্বিক সেখানে এই সত্তা 'আকাশ' মাত্র ; যেখানে তিনি কবি সেখানে ইহা 'নীড়' ; আর যেখানে তিনি তাত্ত্বিক-কবি সেখানে "একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।" উপনিষদে প্রধানতঃ এই সত্তাকে 'আকাশ' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, বৈষ্ণব কবিগণ ইহাকে 'নীড়' বলিয়া ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই দ্বিবিধ কল্পনাই আছে ; কারণ তিনি শিশুকাল হইতেই যুগপৎ কবিত্ব ও উপনিষদ্ এই দুই পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই মধ্যেই বর্ধিত হইয়াছেন ; এবং এই দুইয়ের সমন্বয় তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছে ইহাতেই তাঁহার বিশেষত্ব। কোনো রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাঁহার সাহিত্যে কি গদ্য কি পদ্য সর্বত্রই এই মূল বাণী নানা ফলে ফুলে পুষ্পে পল্লবে বিকশিত হইয়াছে।

হে অনন্ত, যেথা তুমি ধারণা-অতীত,...

চিত্তবাতায়ন মম

সে অগম্য অচিন্ত্যের পানে রাত্রিদিন

রাখিব উন্মুক্ত করি, হে অন্তবিহীন।

এই অনন্তের প্রতি তাঁহার জীবনের একটি বাতায়ন চিরদিনই উন্মুক্ত।

৩

যিনি এই সত্যকে বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছেন, জীবনের দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার সাধনা আর কি রকম হইতে পারে? তাঁহার সাধনা সমগ্র জীবনের পূর্ণতার সাধনা। কেবল মনের দ্বারা জ্ঞানের সাধনা নহে, কেবল হৃদয়ের দ্বারা ভক্তির সাধনা নহে, কেবল ইচ্ছার দ্বারা কর্মের সাধনা নহে; তাহা কামিনীকাঞ্চন-বর্জনের বৈরাগীর সাধনা নহে। তাহা পরিপূর্ণ-অস্তিত্বের দ্বারা অখণ্ড সত্যের সাধনা—এক কথায় তাহা কবির সাধনা।

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়

লভিব মুক্তির স্বাদ।...

প্রদীপের মতো

সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়

জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়

তোমার মন্দির-মাঝে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার

রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।

যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে

তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

প্রাকৃতিক জগতে আমরা দেখি, এই পৃথিবীর উপরই কত-না গ্রহ-জ্যোতিষ্কের আকর্ষণ-বিকর্ষণ-প্রত্যাকর্ষণ কাজ করিতেছে; এই সব আকর্ষণজাল যদি দৃষ্টিগম্য হইত তবে ঠিক একটি জটিল শক্তিজালের মতো দেখাইত। এই

জটিল এবং বিশাল শক্তিজাল দ্বারা পৃথিবী বিধৃত, তবু তো তাহার গতি অবাধ, তাহার মুক্তির লেশমাত্র অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না, বরঞ্চ এই শক্তিজালের সামঞ্জস্যেই তাহার মুক্তির মন্ত্র।

যাহা প্রাকৃতিক জগতে দেখি, আত্মিক জগতেও তাহারই অনুবর্তন। বৃহৎ সংসারের মধ্যে বিচিত্র সম্বন্ধের দ্বারা, দাবির দ্বারা আমরা বিধৃত; কিন্তু তাহাতে প্রকৃতপক্ষে মুক্তির লেশমাত্র বাধা ঘটে না।

আর যে বৈরাগী সংসারকে ত্যাগ করিয়া এই বিচিত্র সম্পর্কজালের মোহ কাটাইয়া সংসারাতীত ব্রহ্মকে পাইতে চলিল সে তো ওই মধ্যরাত্রের পতনশীল উল্কাখণ্ডটি। তাহার মুহূর্তের জ্যোতির্জ্বালা ও চলিষ্ণুতা চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়া বাহবা আকর্ষণ করে, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ভস্মমুষ্টিতে পরিণত হইয়া অন্ধকার বিস্মৃতির মধ্যে তলাইয়া যায়।

ব্রহ্ম সংসারকে অতিক্রম করিয়া আর কোথাও বসিয়া আছেন এমন নহে; তিনি সংসারকে অধিকার করিয়া আছেন, কাজেই সংসারে থাকিয়াই তাঁহার সাধনা চলিতে পারে। এ সেই সীমার মাঝে অসীমের কথা – সংসার সসীম কিন্তু অসীম যিনি, তিনি সেখানেও আছেন।

কেবল যে সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মের সাধনা চলিতে পারে তাহা নয়, সংসারই তাঁহার সাধনা, শ্রেষ্ঠ সাধনার ক্ষেত্র।

"আমরা বিশ্বের অন্য সর্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণভাবে জ্ঞানে জানিতে পারি। জল-স্থল-আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদান-প্রদান চলে না— তাহাদের সহিত আমাদের মঙ্গলকর্মের সম্বন্ধ নাই। আমরা জ্ঞানে প্রেমে কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতমরূপে জানিয়া তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি।...এই মানবাত্মার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের পরিতৃপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়।...এই জন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্ম দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই।.. এই জন্য মানব-সংসারের মধ্যেই, প্রতিদিনের ছোটবড় সমস্ত কর্মের মধ্যেই, ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা

আংশিক— কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা— সেই উপাসনা-দ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।" —"ধর্মপ্রচার", ধর্ম

সেই জন্য সংসারকে কবি ভয় করেন না

বিচিত্র ভাষায়

তোমার সংসার মোরে কাঁদায় হাসায় ;
তব নরনারী সবে দিগ্বিদিকে মোরে
টেনে নিয়ে যায় কত বেদনার ডোরে,
বাসনার টানে।

কবি আপনার সব দ্বার খোলা রাখেন, তাহা দিয়া সংসারের যত ছায়ালোক যত ভুলভ্রান্তি দুঃখশোক ভালোমন্দ গীতগন্ধ প্রবেশ করে।

সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্য বার এসেছিনু নামি।
দ্বার রুধি জপিতিস যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম?

এ সেই কথা

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।

যে সব মুহূর্ত আমরা সংসারের কাজেকর্মে ব্যয় করি হঠাৎ একসময়ে সেইগুলি তুলিয়া দেখিতে পাই—

তোমার স্বাক্ষর-আঁকা সেই ক্ষণগুলি

তখন বলিতে হয়

হে নাথ, অবজ্ঞা করি যাও নাই ফিরে
আমার সে ধূলাস্তূপ খেলাঘর দেখে,
খেলা-মাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে
যে চরণধ্বনি— আজি শুনি তাই বাজে
জগৎ-সংগীত সাথে চন্দ্রসূর্য-মাঝে।

তোমাকে হৃদয়ের স্থান দিবার জন্য কাহাকেও হৃদয় হইতে বহিষ্কার করিতে হয় না, বরঞ্চ

যত করে দান
তোমারে হৃদয় মন, তত হয় স্থান
সবারে লইতে প্রাণে।

বন্ধুদের সহিত হাস্যপরিহাসে অর্ধরাত্রি কাটাইয়া কবি যেই মহা আকাশের তলে দাঁড়াইলেন, অমনি বুঝিতে পারিলেন—

খেলিতেছিলাম মোরা অকুণ্ঠিত মনে
তব স্তব্ধ-প্রাসাদের অনন্ত প্রাঙ্গণে।

সংসারের প্রতি প্রেমকে অবজ্ঞা করিবার প্রয়োজন নাই—সেই প্রেমের স্বাভাবিক পরিণাম ভক্তিতে। বীজকে অবজ্ঞা করিলে বৃক্ষকেই অবজ্ঞা করা হয়—কবির সাধনার সহজ পরিণামে মোহ মুক্তিতে এবং প্রেম ভক্তিতে সফল হইয়া উঠে।

কবি এই তীর্থে আসিয়াছেন,

স্নানে পানে
অপরাহ্ন হয়ে এল গল্পে হাসি গানে;

তবু তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তীর্থদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হন না। কেবল একবার বিদায়ের পূর্বে তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে,

তার পর
নবতীর্থে যেতে হবে, হে বসুধেশ্বর।

এই আপাত-আলস্যে তীর্থদেব রুষ্ট হন না, কারণ

হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন।

আর যদি তাঁহাকে পূজা করিতে ভুলিয়াই যাই, তাহাতেই বা কি—

তব পূজা না মানিলে দণ্ড দিবে তারে
যমদূত লয়ে যাবে নরকের দ্বারে—
ভক্তিহীনে এই বলি যে দেখায় ভয়
তোমার নিন্দুক সে যে, ভক্ত কভু নয়!

তিনি তো পূজা চাহেন না,
তুমি চাও তাই পূজা সে চাহে পূজিতে ;
তিনি তো ধরা দিতে চাহেন না,
আপনারে জানাইতে নাই তব ত্বরা।

তবু ভক্ত তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চায়। মর্ত্যবাসীদের তিনি এমন ঐশ্বর্য দিয়াছেন, যাহা প্রথমে মর্ত্যের সকল আশা মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়— তখন তাহা আপন ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে ভগবানের প্রতি ধাবিত হইতে থাকে। নৈবেদ্যকে কেবল পূর্ণ দেশাত্মবোধের কাব্য বলিলে ছোট করা হয়— ইহাতে পরিপূর্ণ মানবসত্তাব সর্বাঙ্গীণ উদ্বোধন ; তাহার মধ্যে দেশ আছে, রাষ্ট্র আছে, সমাজ আছে, বিশ্ব আছে, বিশ্বনাথ আছেন ; মানবসত্তা যখন জাগে, তখন পরিপূর্ণভাবেই জাগে, কোনো অংশবিশেষ জাগে না ; এবং একবার তাহা জাগিলে প্রত্যেকটি অঙ্গ আপনার ন্যায্য স্থান লাভ করিয়া সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতাব প্রকাশ করে। কবি পরিপূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহাব দৃষ্টি একদেশদর্শী না হইয়া সমগ্রদৃষ্টি লাভ করিয়াছে।

যে পূর্ণদৃষ্টি তিনি আইডিয়া রূপে লাভ করিয়াছেন তাহা কেবল জীবনে স্বীকার না করিয়া কর্মেও প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশে অধিকাংশ আইডিয়া কর্মে পরিণত হইবার পূর্বেই খোল-করতালে উত্তাল হইয়া অশ্রুধারায় নির্বাণলাভ করিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়।[১]

আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ
তবে দুঃখের কিছুই নাই, এবার
দেখাও সত্যের মূর্তি কঠিন নির্মল।

এবার

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।...
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

[১] "নৈবেদ্যের সময় হইতে, অর্থাৎ ১৩০৮ সালে বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতার ভার গ্রহণের সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক জীবনের আরম্ভ।" —অজিতকুমার।

স্বাদেশিক জীবন বলিলে তাহার মূল ভাবটিকে খাটো করা হয়—ইহা তাঁহার কর্মজীবনের সূত্রপাত। আবার এই সময় বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়—১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ। ভারতবর্ষের মূল ভাবটি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনার আবশ্যক—তপোবনের সাধনা সংসারবিমুখতা নয়—সম্পূর্ণভাবে সংসারের সম্মুখীন হইবারই সাধনা। জীবনের অন্য তিন আশ্রমের প্রকৃত ভিত্তিপাত এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে।

এই আশ্রমটি কবির জীবনের তাপমান যন্ত্রের মতো; উত্তরকালে কবির জীবনে যে সব পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যে সমস্ত নবভাবের সমাবেশ হইয়াছে, এই প্রতিষ্ঠানও সেই অনুসারে উত্তরোত্তর পরিণত হইয়াছে। কবির ভাব কেবল বাষ্পাকারে না থাকিয়া বাস্তবে যে মূর্তিলাভ করিল তাহার বীজ এই নৈবেদ্যের আন্তরিকতার মধ্যেই নিহিত ছিল।

নৈবেদ্য পড়িবার সময় মনে রাখা উচিত, প্রকৃতপক্ষে এইখানে কবির জীবনদেবতা-পর্বের সমাপ্তি ও বিশ্বদেবতা-পর্বের সূত্রপাত। ইহাতে ভাবের ও প্রকাশের যে সহজ সরল ও সতেজ ভাব আছে তাহা কবির অন্যান্য গ্রন্থে বিরল। এত স্পষ্টভাবে, এত সাদাসিধাভাবে এমন খোলাখুলিভাবে তিনি নিজেকে আর কোথাও প্রকাশ করেন নাই। প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়া দেখিলে ইহাই নৈবেদ্যের বিশেষত্ব।

এই লেখকের লেখা

রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী-লিখিত রবীন্দ্রকাব্য-আলোচনা কয়েক খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথম খণ্ডে লেখক সন্ধ্যাসংগীত হইতে নৈবেদ্য পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে শিশু হইতে বলাকা পর্যন্ত কাব্যের আলোচনা করিয়াছেন; ভবিষ্যতে গ্রন্থান্তরে বলাকার পরবর্তী কাব্যসমূহের আলোচনা করিবেন। রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝরে তিনি রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও প্রথম-যৌবনের কবিতার আলোচনা করিয়াছেন।

"প্রথম-বয়সে রবীন্দ্রনাথের জীবনে এবং কাব্যজীবনে যতরকম প্রভাব পড়িয়াছে এবং যাহা কিছু প্রেরণা জোগাইয়াছে তাহার চমৎকার বিশ্লেষণ। অনুমানের উপর নির্ভর নহে, সমস্ত তথ্যই লেখক কবির নানা স্থানের স্বীকার হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রামাণ্য করিয়া তুলিয়াছেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে কবির কাব্যনির্ঝর কোন্ পথে প্রবাহিত হইয়া ক্রমশঃ প্রকাণ্ডতর হইতেছে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। লেখক স্বয়ং রবীন্দ্রশিষ্য, রবীন্দ্র-কাব্য ও নাট্যসাহিত্য বহুদিন হইতেই তাঁহার গবেষণার বিষয়। তাঁহার ভাষা ও ভঙ্গী চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ।"

—যুগান্তর

"সমালোচনা, বিশেষতঃ কাব্যের সমালোচনা, যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হোক, তৃপ্তি দিতে পারে না আমাদের, যদি তাতে না লাগে সমালোচকের আপন মনের স্পর্শ। প্রমথবাবুর আলোচনায় এই আপন মনের স্পর্শটি পাই। গতানুগতিক ভাবে নানা কবিতার ছত্র উদ্ধার এবং তার সরলার্থ করে তিনি কর্তব্য শেষ করেন না। তাঁর তীক্ষ্ণচেতন মনে আলোচ্য কাব্য বা কবিতা কি স্বপ্ন, স্মৃতি বা ভাবনা জাগিয়েছে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি সে কথা বলেন। তাঁর মতামত প্রখর এবং স্পষ্ট। বিচারপ্রবণ, অনুভূতিশীল একটি স্বাধীন চিত্তের পরিচয় তাতে পাওয়া যায়। এই ব্যক্তিসত্তার প্রকাশই তাঁর সমালোচনায় প্রাণসঞ্চার করে।

"রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন বর্ণনায় এবং বাল্যরচনায় কবির নিজ বৈশিষ্ট্য ও পরবর্তী রবীন্দ্র-ভাবধারার পূর্বাভাস, আর শেলি, ওআর্ডসওআর্থ, কীটস, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও বিহারীলালের ভাবচ্ছায়া প্রদর্শনে প্রমথবাবু একাধারে রসবোধ এবং বিশ্লেষণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বহু চিত্রে সুশোভিত, উপহারোপযোগী সংস্করণ। মূল্য তিন টাকা

জেনারেল প্রিন্টার্স, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

এই লেখকের লেখা

অকুন্তলা

"বাঙালী পাঠকের কাছে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। বিশুপ্র না বি স্বেচ্ছায় বার্নার্ড শ-পন্থী নাট্যকার অথবা ব্যঙ্গকৌতুকের পসারী হিসাবেই প্রধানতঃ প্রখ্যাত বা কুখ্যাত আছেন। তাঁহার কবি-পরিচয় হয়ত অনেকেরই অজ্ঞাত। লোক যাহার খবর রাখে না, তাহা লোকপ্রিয় না হইতে পারে, কিন্তু প্রমথনাথ সেই শ্রেণীর কবি যাহারা স্বতন্ত্র এবং সেইজন্য লোকোত্তর। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগের কবিদের মধ্যে তিনি যে স্থান দখল করিয়াছেন তাহা স্বল্প হইতে পারে, কিন্তু তাহা তাঁহার নিজস্ব। তাঁহার স্বকীয়তার গৌরবে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার পূর্বতন কবিতা ভাবপ্রবণ, কল্পনা-বিলাসিতার ও ভাষার বাক্কার্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু **'অকুন্তলা' সম্পূর্ণ নূতন ধরনের রচনা, যাহার সগোত্র বাংলা কাব্য-সাহিত্যে নাই বলিলেও চলে।** ভাষায় ভাবে ও ভঙ্গীতে তিনি অলৌকিক সৌন্দর্য-বিহ্বলতার চিরন্তন পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, যাহা স্থূল যাহা অসুকুমার, যাহা অতীন্দ্রিয় তাহার মধ্যে নয়, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা বিচিত্র তাহার মধ্যে কাব্য রসের সন্ধান পাইয়াছেন। তাই তাঁর স্বচ্ছ ও সচ্ছন্দ ভাষার অলঙ্কার নাই, ভাবে আবেগের আবিলতা নাই, ভঙ্গীতে সচেতন বলিষ্ঠতার অভাব নাই।"

—**শ্রীসুশীলকুমার দে, যুগান্তর**

"অকুন্তলা কাব্যে কয়েকটি প্রণয়-কাহিনী, কয়েকটি নবভাবে ব্যাখ্যাত পুরাণ-কথা, সবশেষে বিরাট পুরুষ নেপোলিয়ন সম্বন্ধে দীর্ঘ একটি কবিতা আছে। প্রথম তিনটি কবিতার স্থান-কাল পাত্র-পাত্রী ঘটনা আধুনিক, ব্যঞ্জনা ও রস চিরকালীন। স্থান কাল পাত্র এদিকের বলিয়াই যেন স্থায়ী মধুর রসের অনুষঙ্গে সঞ্চারী ভাব হিসাবে হাস্য বা কৌতুকের সঞ্চার মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই। এইভাবে মাধুর্যের সঙ্গে কৌতুকের সমাবেশ শুধু যে বৈচিত্র্য আসিয়াছে তাহা নয়, ছায়াসম্পাতে আলোর নতুন উজ্জ্বল বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

"বাঙলার পুরাতন কবিদের মধ্যে বিদ্যাপতির সহিত প্রমথনাথের অনেকটা মিল আছে, তেমনি উপমার প্রাচুর্য, তেমনি শব্দের ছন্দ, তেমনি বিচিত্র বর্ণচ্ছটা, তেমনি রসোজ্জ্বল মনস্বিতা এই মনের প্রবৃত্তি যেখানে প্রাধান্য পাইয়াছে, শ্লেষ ও বিদ্রূপ আসিয়া মিলিয়াছে, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখি।..."

—**দেশ**

উপহারোপযোগী শোভন সংস্করণ। আড়াই টাকা

"বাংলা গ্রন্থের এরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

জেনারেল প্রিন্টার্স, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা